মন নিয়ে খেলা

[illegible]

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা ১২

মনটাই যেন দাবার ছক,
বিশ্বের নর-নারী তার ঘুঁটি।
খেলা শুরু হয়েছে সৃষ্টির আদিতে,
চলবে অনাদি অনন্তকাল ধরে —
কবে শেষ হবে কেউ জানে না।

এই লেখকের লেখা—

যখন পুলিস ছিলাম (৩য় মুদ্রণ)

যখন নায়ক ছিলাম (২য় মুদ্রণ)

সাজানো বাগান

মহুয়া মিলন

ছাগল রাজা (কিশোর উপন্যাস, যন্ত্রস্থ

পরমারাধ্য গুরুদেব

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের

পুণ্য শ্রীকরকমলে

আমার ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

সেবকাধম

—ধীরাজ ভট্টাচার্য

লিত-স্মৃতি'

২, হরিণ গাটুজ্যে স্ট্রীট

লিকাতা ২৫

৬.১.৫৯

॥ এক ॥

রজীর অধ্যাপক নীলাম্বর বাগচির হঠাৎ হার্টফেল করে মরার খবর য়া মাত্রই পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছুটি হয়ে গেল। ইউনিভারসিটি ক বেরিয়েই তাপস বললে, এখন এই অফুরন্ত নিরস দুপুর টা কাটাই কি করে বলতো সমীদ?

সমীদ কিছু বলবার আগেই তাপসই আবার শুরু করলে, আমি কি, চল বালিগঞ্জে ক্ষণিকাদের বাড়ি।

চোখে-মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল সমীদের, বললে, না না কী বে সবাই! আশপাশের পথচারীদের সচকিত করে চেঁচিয়ে স বললে তাপস, নাঃ, ইউ আর হোপলেস সমীদ! এই অভ্যুগ্র ক-স্বাধীনতার যুগে তুই নিচের তলাতেই রয়ে গেলি। বিংশ র ভিতের উপর মনুমেণ্টের মত আকাশচুম্বি অট্টালিকার ছাতে দেখতে পেতিস পৃথিবীর রঙ চেহারা একদম বদলে গেছে। কিছু ভাববার তোয়াক্কা না রেখেই মানুষ এগিয়ে চলেছে নিজের থে, অতএব আমরাও যাচ্ছি। চলমান ট্যাক্সিখানাকে হাত-থামিয়ে সমীদকে একরকম টেনে নিয়ে উঠে পড়ল তাপস। রজাটা বন্ধ করে ড্রাইভারকে বললে, ল্যান্সডাউন রোড।

রে রাস্তায় দৃষ্টি মেলে সমীদ গম্ভীর হয়ে বসে আছে দেখে ললে, আচ্ছা এতে দোষটা পেলি কোথায় তুই? ক্ষণিকা র ক্লাস-মেট, তাছাড়া স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়নের জয়েণ্ট সেক্রেটারি। প্তাখানেক কলেজে আসে না—দু'দুটো মিটিং-এ অ্যাবসেণ্ট; বিপদ-আপদ নয়তো অসুখবিসুখ একটা হয়েছে নিশ্চয়, য় খোঁজ নিতে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

দের স্বভাব-গম্ভীর মুখে ঈষৎ হাসির আভাষ দেখা দিল। সে

বললে, তোর ঐ অকাট্য যুক্তিটাকে অনুসরণ করে পোস্ট-গ্রাজু
ক্লাসের সব ছেলেগুলো যদি আজ ল্যান্সডাউন রোডে ক্ষণিকাদের
গিয়ে হাজির হয়, তখন ?

উৎসাহে সোজা হয়ে বসে তাপস বললে, কখনই না ; বেশির
ছেলেই তোর মত একতলা দু'তলা নয়তো বড়জোর তিন-চার তলায়
গেছে, তাদের বাদই দিলাম। আমার মত ছাতে উঠে বাইরে দৃষ্টি
করেছে যারা, তাদের কেউ যদি আসে—মোটেই অবাক হব না।

তাপস চৌধুরী ও সমীদ রায় দু'জনেই অবস্থাপন্ন ঘরের ছে
সুন্দর স্বাস্থ্যবান। সমবয়সী হলেও দৈহিক গঠনের জন্য সমী
দু'এক বছরের বড় বলে মনে হবে। সমীদ স্বল্পবাক গম্ভীর প্রকৃ
তাপস ঠিক তার বিপরীত। সমীদ নিস্তরঙ্গ কালো দীঘি, তাপস
খরস্রোতা নদী। এই দু'টি বিরুদ্ধস্বভাব ছেলের মধ্যে নিবিড় বন্ধু
করে জন্মালো তার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে।

আশুতোষ কলেজ থেকে আই-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান
করে প্রেসিডেন্সিতে থার্ড ইয়ারে ভর্তি হয়ে তাপস শুনলে
থেকে সমীদ রায় বলে একটি ছেলে ম্যাট্রিক ও আই-
স্থান অধিকার করে রেকর্ড মার্ক পেয়ে পাটনা ইউনিভারসিটি
ভেঙে চুরমার করে দিয়ে, ওদেরই ক্লাসে ভর্তি হয়েছে।

খবরটা শুনে তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উলটে তাপস কয়েকটি
সহপাঠীকে বললে, পাটনা ইউনিভারসিটির সঙ্গে ক্যালকাটার
য়ে কতখানি এইবার বাছাধন সেটা বুঝতে পারবে।

বুঝতে পারলো, তবে বাছাধন নয়—তাপস চৌধুরী ও থার্ড ই
সমস্ত ছেলের দল। দেখতে দেখতে এগিয়ে এল পঁচিশে
মেতে উঠল ছেলের দল, তাপসই পাণ্ডা। কলেজের প্রকাণ্ড
তিল ধারণের স্থান নেই, থৈ থৈ করছে ছেলেমেয়ে ও প্রফে
যথারীতি সভা শুরু হবার পর, হঠাৎ এক ফাঁকে তাপস উঠে

রলো : আজ এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের পুণ্য জন্মতিথিতে আমি থার্ড ইয়ারের ছেলেদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করছি আমাদের পাঠী সমীদ রায়কে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান' সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে।

সমবেত হর্ষধ্বনি ও করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল সভাগৃহ। ের মাঝখানে উঠে দাঁড়াল সমীদ, নিমেষে সভা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বিরল হলেও মাঝে মাঝে দেখা যায় অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি লোক যে কোনও পরিস্থিতিতে যাদের আবির্ভাব যাদুমন্ত্রের সমী ত প্রথমটা মানুষকে অভিভূত করে দেয়। নিস্তব্ধ সভার অগণিত প্রকৃ ৌতূহলী চোখের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হয়ে সমীদ ধীর পদক্ষেপে এস পস দাঁড়াল সভামঞ্চের সামনে। মঞ্চের উপর রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ দীর্ঘ বন্ধু প্রতিকৃতি ঠিক মাঝখানে রাখা, তারই চারপাশে বসে আছেন অধ্যাপকমণ্ডলী।

অধ্যাপকদের যথারীতি নমস্কার করে মঞ্চের পাশে দাঁড়াল সমীদ। র ওঠবার অনুরোধ জানালে কয়েকটি ছাত্র, আর দুটি ছেলে র রাখা মাইকটা এনে সামনে ফিট করতে গেল। হাত দিয়ে তাদের িবৃত্ত করে গম্ভীর উদাত্ত স্বরে বলতে শুরু করলো সমীদ— সভাপতি, অধ্যাপকমণ্ডলী আর আমার ছোট-বড় ভাইবোনেরা। অ দেবতাকে পূজা করে, অন্ধ ভক্তি আর বিশ্বাসই সে পূজার মূল ার ত কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে বসে, কেন এই দেবতাকে তুমি পূজা কর? ন তুমি এঁর সম্বন্ধে, বুঝিয়ে দাও, তাহলেই হয় মুশকিল। আজ মুশকিলে পড়েছি আমি। ছেলেবেলা থেকেই আমি রবীন্দ্রনাথের পূজারী, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার দান শতমুখে বলেও শেষ করা া, আমার চেয়ে শত গুণে গুণী জ্ঞানী বহু লোকই এ সম্বন্ধে গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, শুনে মনে হয়েছে কিছুই বলা হল না, অনেক বাকী। কী বাকী, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেই বিপদ।

আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছি বলেই একথা যদি মনে করেন যে, জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে তা থেকে চোখা চোখা বুলি আউড়ে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করছি, তাহলে আমার উপর মস্ত অবিচার করা হবে। বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে আমার যে কথাটা মনে হয়েছে, সেইটেই আজ ভয়ে ভয়ে আপনাদের কাছে বলতে চাই। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের কারও দানই কম নয়। অগণিত মানুষের জ্ঞান-পিপাসা মেটাতে এঁরা পাহাড়ের দুর্গম চূড়া থেকে টেনে আনলেন বাংলা ভাষার মন্দাকিনী-ধারা সমতলে; অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে এসে হঠাৎ গতিরোধ হয়ে গেল তার। চারপাশে উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা—মাঝখানে দীর্ঘ দীঘি বা লেকের মত বিরাট নিম্নভূমি, তারই মধ্যে বন্দী হয়ে দিন দিন স্ফীত হয়ে উঠতে লাগল জলধারা। বাইরে নিচে অগণিত পিপাসু নরনারী চাতকের মত লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দিনের পর দিন। বাংলা ভাষার এমনি এক সঙ্কটময় মুহূর্তে ক্ষণজন্মা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। গানে কবিতায় গল্পে প্রবন্ধে তিনি দিকে দিকে প্রবাহিত করে দিলেন বাংলা ভাষার অমৃতধারাকে। বাংলা ও বাঙালী ধন্য হল। শুধু বাংলাকে প্লাবিত করে সে প্রবাহ থেমে গেল না, দিকে দিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তা। তুচ্ছ অবজ্ঞাত পরাধীন জাতি, বিশ্বের দরবারে পেল মর্যাদা, পেল বাঙালী বলে গর্ববোধ করবার প্রেরণা। এর বেশি আর কিছু আমার বলবার নেই।

আবার হর্ষধ্বনি ও করতালিতে মুখর হয়ে উঠল নীরব নিস্তব্ধ সভা। সবার আগে তাপস ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো সমীদকে দুই বাহুবেষ্টনে। সেই থেকে বন্ধুত্ব।

লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে বাঁয়ে টার্ণ নিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চললো এলগিন রোড ধরে দক্ষিণ মুখো।

সামনে ঝুঁকে শ্যেন পাখীর মত চারদিক দেখতে দেখতে চলেছে তাপস, সমীদ এককোণে নির্লিপ্তভাবে বসে—দু'জনের মনে একই চিন্তা। হঠাৎ তাপস সোজা হয়ে বসে চীৎকার করে বললে—এই রোখো ট্যাক্সি!

গাড়ি থামতেই চারিদিক দেখে নিয়ে সমীদ বললে, এখানে থামালি কেন? জবাব না দিয়ে ড্রাইভারকে বললে তাপস, ব্যাক করো।

পিছু হটে খানিক এসে তাপসের নির্দেশমত গাড়ি থামলো বাঁ দিকের ফুটপাত ঘেঁষে। সামনে একটা লোহার গেট, ভেজানো। মাথার উপর আইভিলতার সঙ্গে কতকগুলো আগাছা বুনো লতা ভিড় করে তালগোল পাকিয়ে আছে, আর তারই কয়েকটি ফ্যাঁকড়া সামনে ঝুঁকে সাপের ফণার মত দোল খাচ্ছে। ডান দিকের দেওয়ালে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকালে নজরে পড়ে একখণ্ড সাদা পাথর, লতাপাতায় সবটাই প্রায় ঢাকা, তবু পড়া যায়,—চক্রবর্তী। নীচে,—অ্যাট-ল।

তাপসের পিঠ চাপড়ে সমীদ বললে, তোর দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করছি তাপস। জবাব না দিয়ে ঈষৎ হেসে সমীদকে আসতে ইশারা করে গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল তাপস।

সামনে লাল কাঁকর বিছানো পথ আর দু'পাশে ফুলের বাগান অথবা সবুজ ঘাসের গালচে বিছানো টেনিস লন্ কিছুই নেই, আছে হাত কুড়ি লম্বা ও দেড় হাত চওড়া সিমেণ্ট উঠে যাওয়া এবড়োখেবড়ো খোয়া বার করা পথ। ডাইনে প্রকাণ্ড একটা গোয়ালঘর, দু-তিনটে গরু বাছুর বাঁধা। বাঁয়ে ছোট্ট জমিটায় ফসলের ক্ষেত। ধানি লঙ্কা বেগুন গাছ থেকে শুরু করে, ফুলকফি পর্যন্ত ফলানোর চেষ্টা চলেছে সেখানে।

প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বিষম খেয়ে থেমে যাওয়ার মত দুই বন্ধু থমকে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাইলো। দু'জনের চোখে একই জিজ্ঞাসা—ব্যারিস্টার চক্রবর্তীর 'বার'-এ এত নামডাক, অথচ?

বাড়িটার অবস্থা আরও শোচনীয়—বহুদিনের বাড়ি, সংস্কার অভাবে জরাজীর্ণ, কয়েক জায়গায় মোটা বালির কাজ উঠে গেছে, ভিতরের ইঁটগুলো যেন দাঁত বের করে ভেংচি কাটছে।

সামনেই বাইরের ঘর, আসবাবপত্র কিছুই নেই। এক পাশে স্তূপাকারে রাখা শুকনো কাটা খড়, তার পাশে একখানা বঁটি কাত করে রাখা। অন্য পাশে ছেঁড়া একটা মাদুরে শুয়ে আধা-বয়সী একটা হিন্দুস্থানী চাকব নাক ডাকিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর ধড়্মড় করে উঠে বসে হাঁ করে তাপসের দিকে চেয়ে রইল লোকটা।

তাপস—এটা ব্যারিস্টার চক্রবর্তী সাহেবের বাড়ি ?

চাকর—জী হাঁ।

তাপস—দিদিমণি বাড়িমে হ্যায় ?

চাকর—জী হাঁ।

তাপস—বুলা দেও উনকো।

চাকর—জী হাঁ।

কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ায় বিরক্তি এবং ছুটি ষণ্ডামার্কা অপরিচিত ছেলেকে দেখে ভয় ও সন্দেহ, এই সব কটা অভিব্যক্তি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠল জী হাঁ'র মুখে। ঐ ভাবে চাইতে চাইতে ভিতরে চলে গেল চাকরটা। তাপস এসে বাইরে সমীদের কাছে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি বললে—সব ঠিক আছে, এই বাড়ি, কিন্তু আমি ভাবছি—। ভাববার আর সময় পেল না তাপস, বাইরের দরজার একখানা কপাট ভেজিয়ে, চওড়া লাল পাড় সাড়ি পরে, দাঁড়াল এসে এক বিরাট নারীমূর্তি। যেমনি মোটা, তেমনি কালো। অবাক বিস্ময়ে ছু'জনে সেই দিকে চেয়ে রইল। ভিতর থেকে পুরুষালি কণ্ঠ ভেসে এল—রামভজন!

—জী হাঁ। বলে বুক ফুলিয়ে ঘরের বাইরে ছোট সিঁড়িটার শেষ ধাপে এসে দাঁড়াল রামভজন।

—বাবুদের জিগ্যেস কর রামভজন, আমার মেয়েকে ওরা কি-র জন্য ডাকছে ?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমতা আমতা করে তাপস বললে, আমরা, মানে একসঙ্গে কলেজে পড়ি কিনা—তাই।

—ওদের বলে দে রামভজন, আমার মেয়ে জীবনে ইস্কুল-কলেজের ছায়াও মাড়ায়নি। ও সব চালাকি এখানে চলবে না, ইস্কুল-কলেজে পড়লে মেয়েদের কিছু থাকে নাকি ?

তবুও সংশয় ঘোচাতে ভয়ে ভয়ে তাপস জিজ্ঞাসা করে, এটা তো ব্যারিস্টার চক্রবর্তীর বাড়ি ?

এবার আর রামভজনের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না—সরাসরি উত্তর আসে আরও চড়া গলায়—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি ? পরক্ষণেই গলা নেমে আসে খাদে : আ মোলো যা, বাইরে ঐ পাথরে লেখা দেখেই ঢুকেছে। তাহলে শুনেই যাও, বাড়ি চক্কোত্তি সাহেবের —আজ পাঁচ বছর হল তিনি মারা গেছেন, আর তাঁর স্ত্রী বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বাড়িটা আমাদের কাছে বিক্রি করে, মধুপুরে গিয়ে বাস করছেন। কতদিন কত্তাকে বলিছি, শাবল দিয়ে ও ছাই পাথরটা তুলে ফেলে দাও আপদ চুকে যাক, তা আজ দেব কাল দেব করে—। হঠাৎ থেমে আবার গলা সপ্তমে ওঠে : আ মোলো যা, কারা তার ঠিক নেই আমি হাউমাউ করে সাত-সতেরো বলতে গেলাম কেন ?—রামভজন, ওদের ভালোয় ভালোয় যেতে বলে দে নইলে আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকবো।

ডাকবার দরকার হল না - দেখা গেল আশপাশের বাড়ির জানালায় বারান্দায় কৌতূহলী নিষ্কর্মা মেয়ের দল ইতিমধ্যেই মজা দেখতে দাঁড়িয়ে গেছে। লজ্জায় অপমানে কান মুখ লাল করে তাপস ও সমীদ দ্রুত পা চালিয়ে গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল। মিটার ডাউন করে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সমীদ বললে, ভাগ্যিস ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিইনি।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে সমীদ তাপসকে ডাকলে—আয়।

কথাটা তাপসের কানে গেল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। ট্যাক্সিটায় হেলান দিয়ে বাড়িটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে তাপস দাঁড়িয়ে রইল দেখে সমীদ বললে, বাব্বা এ-যুগে, বিশেষ করে এই সব পাড়ায় এখনও এ-সব ফ্যামিলির অস্তিত্ব আছে নিজের চোখে না দেখে গেলে বিশ্বাস করতেই পারতাম না!

একই ভাবে ঐ দিকে চেয়ে তাপসও বললে, আমি বাজি রেখে বলতে পারি, বাড়ির কর্তা হয় দোকানদার, নয়তো চাল চিনি গুড় বা পাটের আড়ৎদার। গেট দিয়ে ঢুকে অমন সুন্দর লন্ টার অবস্থা দেখেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

—আর বোঝাবুঝিতে কাজ নেই ভাই, এখন উঠে পড় বাড়ি যাই।

গাড়িতে উঠে সশব্দে দরজা বন্ধ করে তাপস বললে, বাড়ি যাই মানে? এর একটা হেস্তনেস্ত না করে যাওয়া হবে না।

—তাহলে তুমি একাই করো, আমি এর মধ্যে নেই।

—নেই মানে? এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় নাকি?—ড্রাইভার, সিধা চলো, আস্তে!

মন্থর গমনে আবার দক্ষিণ মুখো চলতে লাগলো ট্যাক্সি।

হতাশভাবে পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসলো সমীদ।

॥ দুই ॥

ল্যান্সডাউন রোড শেষ হয়ে হাজরা রোডে পড়ল ট্যাক্সি। সমীদ বললে, ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে বাঁ দিকে রাখো। গাড়ি থামলে তাপসের দিকে চেয়ে বললে, তুই ঠিক জানিস তাপস, ক্ষণিকাদের বাড়ি ল্যান্সডাউন রোডে? বালিগঞ্জ প্লেস, একডালিয়া কিংবা সাদার্ণ এভিনিউ-এ নয়?

তাপস মাথা নেড়ে জানালে—না।

—ক্ষণিকা দেবীর বাবার পুরো নাম জানিস?

—না।

—তাহলে? এটা এক রকম স্থির নিশ্চয় যে এই ল্যান্সডাউন রোডে একটির বেশি ব্যারিস্টার চক্কোত্তি নেই—তিনি তো ভূতপূর্ব এখন তাহলে উপায়?

তাপস চুপ করে থাকে। সমীদ জিজ্ঞাসা করে,—ল্যান্সডাউন রোডেই যে ওদের বাড়ি এবং বাবা ব্যারিস্টারি করেন এ খবর তুই জানলি কেমন করে?

তাপস—আমাদের সহপাঠী রমেনকে তুই চিনিস তো! দুর সম্পর্কে ক্ষণিকার কি রকম ভাই হয়, সেই একদিন বলছিল ক্ষণিকার জন্মতিথিতে ল্যান্সডাউন রোডে ব্যারিস্টার চক্রবর্তীর বাড়িতে নেমন্তন্ন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সমীদ বললে, বলতে পারিস ক্ষণিকার মা বেঁচে আছেন কিনা?

অদ্ভুত প্রশ্ন, অবাক হয়ে তাকাল তাপস সমীদের দিকে।

এক রকম নিজের মনেই বলতে লাগল সমীদ—কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম যেন, কে একজন ব্যারিস্টার চক্রবর্তী

স্ত্রী মিনতি দেবীর স্মৃতিরক্ষার জন্য ক্যানসার হাসপাতালে পঁচিশ হাজার টাকা দান—

কথা শেষ করতে পারল না সমীদ, 'ইউরেকা' বলে চীৎকার করে উঠল তাপস !—পেয়েছি ! পেয়েছি !!

—কি পেয়েছিস ? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে সমীদ।

—নাম্।

—কার নাম ? ব্যারিস্টার চক্রবর্তীর ?

—না, বাড়ির।

—বাড়ির নাম ? হেঁয়ালি ছেড়ে স্পষ্ট করে বলবি ?

—'মিনতি কুটীর' ওদের বাড়ির নাম।

—তুই জানলি কি করে ?

—তাহলে মন দিয়ে শোন মাই ডিয়ার ওয়াটসন্ ! একদিন ছুটির পর ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামছিল—আমি ঠিক পিছনে, হঠাৎ দেখলাম সিঁড়ির মাঝখানে একখানা খামের চিঠি পড়ে আছে—ডেকে দিতে গিয়ে দেখি—ক্ষণিকার নাম লেখা, আর তারি নিচে লেখা, বেশ মনে পড়ছে -'মিনতি-কুটীর'। অন্ধকারে এতক্ষণ আমি ঐ নামটাই তো হাতড়াচ্ছিলাম, তুই বলাতে মনে পড়ে গেল। চালাও ট্যাক্সি ! আবার চলতে লাগল ট্যাক্সি ধীর মন্থর গমনে।

তাপস বললে, আমি বাঁদিকের বাড়িগুলো দেখতে দেখতে যাই, তুই দেখ ডানদিকের গুলো।

তাই হল। একটু এগিয়েই সমীদ বললে, থামাও গাড়ি।

ডান হাতে ছোট্ট ছবির মত বাড়ি, গেটের ডান দিকে লেখা 'মিনতি কুটীর'। সামনে চওড়া লাল সুরকির পথ, দু'পাশে ফুলের বাগান, আর ডানদিকে ছোট্ট সবুজ ঘাসের গালচে বিছানো লন।

দোতলা বাড়ি, সামনে গাড়ি-বারান্দা। চওড়া মার্বেল পাথরের কয়েকটা ধাপ সিঁড়ি উঠেই বাইরের দরজা ! বন্ধ দরজার ডান পাশে

কলিং বেল-এর বোতাম, তারই কাছে দেওয়ালে একখণ্ড চৌকো কাঠের ফলকে লেখা : মিঃ পি. চক্রবর্তী। নিচে ছোট হরফে লেখা, বার-অ্যাট-ল।

তাপস কলিং বেল টেপার মিনিটখানেক পরেই একটা আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে একটা ছিটের হাফ-সার্ট গায়ে দরজা খুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

তাপস বললে, ক্ষণিকা দেবীকে খবর দাও, বল যে কলেজ থেকে তাপস আর সমীদবাবু দেখা করতে এসেছেন।

ছেলেটি দু'জনকে বেশ করে দেখে নিয়ে বললে, দিদির অসুখ, নিচে নামেন না তো।

সমীদের দিকে একবার দেখে নিয়ে তাপস বললে, ওঃ আচ্ছা তাহলে তাঁকে বোলো আমরা খবর নিতে এসেছিলাম।

—আচ্ছা, বলে দরজা বন্ধ করে ছেলেটি ভিতরে চলে গেল।

বেশ একটু নিরুৎসাহ হয়ে দু'জনে আবার গেট-মুখো হাঁটতে শুরু করল। এতখানি উৎসাহের এরকম অবাঞ্ছিত পরিণতি দু'জনের কেউ আশা করতে পারেনি। গেটের কাছ বরাবর পৌঁছেই পিছনে আওয়াজ শুনে সমীদ ও তাপস ফিরে তাকিয়ে দেখলো, সেই ছেলেটি হন্তদন্তহয়ে ছুটে আসছে। কাছে এসে বললে, দিদি আপনাদের ওপরে ডাকছেন।

তাপস সমীদের দিকে চাইল। সমীদ বললে, অসুখের মধ্যে ওঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না, তুমি বল গিয়ে আমরা আর একদিন আসবো।

—এমনিতেই দিদি আমায় বকছে, আপনারা না গেলে আরও বকুনি খেতে হবে। ছেলেটির গলায় মিনতি জড়ানো, অগত্যা দু'জনে সঙ্গে চললো। যেতে যেতে তাপস জিজ্ঞাসা করলো, তোমার নাম কি ভাই?

— সুনীল রায়।

—রায়? তবে যে বলছ—উনি তোমার দিদি।

—আজ্ঞে, বাড়ি আমার খুলনা জেলায় সাতক্ষীরা সাব-ডিভিসনে, এখন পাকিস্তানে পড়েছে। দিদিদের বাড়িও আমাদের গ্রামে এখানে থেকে চাকরির চেষ্টা করছি তাই।

—বুঝেছি। আচ্ছা স্নুনীল, বাড়িতে আর কে কে আছে?

—আজ্ঞে, কাকাবাবু মানে ব্যারিস্টার সাহেব আর দিদিমণি, আর তো কেউ নেই।

দোতলায় সিঁড়ির কাছে একখানা সাদার উপর ছাপার সাড়ি-ব্লাউজ পরে, মাথায় একঝাঁকা রুক্ষ চুলের বোঝা নিয়ে, হাসি মুখে ক্ষণিকা ওদের অভ্যর্থনা জানালো, আজ আমার কী সৌভাগ্য! দেখা না করে চলে যাচ্ছিলেন যে বড়? আস্নুন।

অস্নুখ? তা সে যে অস্নুখই হোক, খানিকটা মনের শান্তি নষ্ট করা ছাড়া ক্ষণিকার অপরূপ দেহ লাবণ্যের এতটুকুও ম্লান করতে পারেনি। বাঁ দিকের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তাপস বললে, স্নুনীলের কাছে শুনলাম আপনার অস্নুখ।

—অস্নুখ না ছাই। ইনফ্লুয়েঞ্জা, একটা রাবিশ অস্নুখ, খেতে শুতে পড়তে কিছুই ভাল লাগে না। বস্নুন।

সাদা মার্বেল পাথরের মেঝেয় কার্পেট বিছানো, তার উপর সোফা সেট। দেওয়ালের এক পাশে একটা আলমারি তাতে বাছা বাছা বাংলা ইংরেজী বই। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ, বার্ণার্ড শ', বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের ছবি। পূব দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা ডিভান—তার উপর খোলা একখানা ইংরেজী নভেল। একটু ঝুঁকে সমীদ দেখলো বইখানি ইভ্লিন ওয়াগের 'ডিক্লাইন এণ্ড ফল'।

ক্ষণিকা হেসে বললে, পাঠ্যপুস্তক দূরের কথা, কোনও সিরিয়স বই পড়তেও ভাল লাগে না—তাই বেছে বেছে ঐ হালকা রসের বইটা পড়ছিলাম—পড়েছেন বইটা?

তাপস মাথা নাড়ল। সমীদ বললে, আমি পড়েছি, স্ট্যাণ্ডার্ডের দিক দিয়ে তুলনা হয় না বইটার।

এতক্ষণ বাদে খেয়াল হল ক্ষণিকার, বললে, ঐ দেখুন আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি, এখন আপনারা কোথেকে এলেন, ক্লাস ছিল না?

অধ্যাপক বাগচির মৃত্যু-সংবাদ তাপসই জানিয়ে দিলে। শুনে বিষণ্ণ মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষণিকা বললে, অধ্যাপনা ছাড়াও মানুষ হিসেবে এরকম লোক সচরাচর চোখে পড়ে না।

বাইরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে একাগ্রমনে এদের কথাবার্তা শুনছিল সুনীল। ক্ষণিকা ডাকলো, সুনীল শোন।

কাছে আসতেই হেসে ফেলে তাপসকে বললে, সুনীল এসে আপনাদের খবর কি বলে জানিয়েছে জানেন? আমায় ডেকে বললে, দিদি কলেজ থেকে তাপসবাবু আর মজীদবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

হাল্কা হাসিতে ফেটে পড়লো সবাই। সুনীল লজ্জায় এতটুকু হয়ে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে দেখে ক্ষণিকা বললে, বা রে চললে কোথায়? আমার বন্ধুদের চায়ের ব্যবস্থা করতে হবে না? আর সেই সঙ্গে গরম মুড়ি কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ কুচি—।

উৎসাহে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুনীলের। কাছে এসে ক্ষণিকার কানে কানে কি একটা বলতেই, ক্ষণিকা খুসী হয়ে ওর পিঠ চাপড়ে বললে, অল রাইট! কিন্তু এখন ভাজবে কি?

—ভাজবে না মানে? তোমার নাম করলে এখুনি ঘুম থেকে উঠে ভাজতে বসবে। মাসে মাসে তোমার কাছ থেকে কম টাকাটা পায় শিবু? কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না তাপস, জিজ্ঞাসা করে—এই গরম ও পরম লোভনীয় দ্রব্যটি কী, জানতে পারি ক্ষণিকা দেবী?

—নিশ্চয়ই [illegible]রেন, গরম গরম বেগুনি, পটলি, কুমড়ি—শেষের নাম দুটো সুনীলের দেওয়া।

আবার হাসির ঢেউ ওঠে ঘরে—ছুটে নিচে নেমে যায় সুনীল। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে লাফিয়ে চলে ক্ষণিকা - মুগ্ধ বিস্ময়ে চুপ করে শোনে তাপস ও সমীদ। মনে মনে এম-এ ক্লাসের স্বল্পবাক গম্ভীর প্রকৃতির মেয়েটির সঙ্গে এই ক্ষণিকার তুলনা করতে গিয়ে যুক্তির খেই হারিয়ে ফেলে।

কবে ক্ষণিকার জন্মতিথিতে ওরই এক বান্ধবী রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে মাঝ পথে ভুলে গিয়ে, অতুল-প্রসাদের কয়েকটি লাইন গোঁজামিল দেবার চেষ্টায় ধরা পড়ে লজ্জায় সবার অলক্ষ্যে না খেয়েই বাড়ি পালিয়ে যায়; কবে স্কুলে 'সাজাহান' অভিনয়ে ক্ষণিকা ঔরঙ্গজেবের ভূমিকা নিয়ে দারার মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞায় সই করে জিহন আলিকে দেবার সময় হাতের আংটিতে আটকে দাড়িটাও দিয়ে ফেলে ছুটে স্টেজ থেকে পালিয়ে যায়; এই সব অপ্রয়োজনীয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হালকা হাসির কথার চলতে থাকে।

এরই মাঝে একটু থেমে ক্ষণিকা বলে, মনে মনে ভাবছেন তো আচ্ছা প্রগল্‌ভা মেয়ের পাল্লায় পড়েছি, না? কিন্তু আমার দোষ নেই —ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের এ একটা মারাত্মক সিমটম, খালি বকতে ইচ্ছে করে। বাবা যতক্ষণ বাড়ি থাকেন সময়টা কেটে যায়, মুশকিল হয় উনি কোর্টে চলে গেলে। আজ আপনাদের পেয়ে বেঁচে গেছি।

একটা ট্রেতে তিনটে বড় চিনে মাটির প্লেটে করে মুড়ি, বেগুনি ও আর সব আনুসঙ্গিক খাদ্যাদি নিয়ে সুনীল এসে সামনের গোল টেবিলটার ওপর রেখে দেয়। সেগুলোর ওপর লোলুপ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ক্ষণিকা বলে, আমি বোধ হয় স্বার্থপরের মত আপনাদের মত না নিয়েই এগুলো আনতে দিয়ে অন্যায় করিছি; কথায় বলে, ভিন্ন রুচিহি লোকা।

বাধা দিয়ে তাপস এক গাল মুড়ি মুখে পুরে [illegible] খেতে বলে, মোটেই অন্যায় করেননি। সত্যিকথা বলতে কি, এগুলো দেখেই আমার জিবে জল এসে গেছে।

আমারও, বলে সমীদও প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ক্ষণিকা, সুনীলের দিকে চেয়ে বলে, তুমি এগুলো বয়ে আনতে গেলে কেন সুনীল? জানকীকে ডাকলে না কেন?

সকাল থেকে কিচ্ছু না-খেয়ে শুয়ে আছে—বলছে গায়ে মাথায় অসহ্য বেদনা, তাই ডাকিনি। ওকেও বোধহয় তোমার ছোঁয়াচ লাগল দিদি।

—বেশ করেছ। বাবা আসুন, ডাক্তারবাবুকে একবার দেখিয়ে ওষুধ এনে দিতে হবে। তোমাকে কিন্তু আরও খানিকটা খাটিয়ে নেব ভাই সুনীল। ছুটে পিসীমার কাছ থেকে খানিকটা খাঁটি সরষের তেল এনে আমাদের প্লেটে ছড়িয়ে দাও—আর একটা এক্সট্রা প্লেট নিয়ে এস।

—পিসীমা? খেতে খেতে প্রশ্ন করে তাপস।

—হ্যাঁ, আমার নিজের বলতে পিসী মাসি কেউ কোথাও নেই। ইনি একজন অনাথা বিধবা, চমৎকার রান্না করেন; এ বাড়ির রান্না ভাঁড়ার সব ওঁর হাতে। আমরা সবাই ওঁকে পিসীমা বলে ডাকি।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করে ক্ষণিকা, বাবা বলেন, মা, পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে যারা চাকরি করতে আসে, আত্ম-সম্মানটা তারা বাড়িতে রেখে আসে না ওটাও সঙ্গে নিয়ে আসে। প্রতিপদে চাকর মনীব সম্বন্ধের কথা মনে করিয়ে দিয়ে যদি তুমি আঘাতে আঘাতে তাকে জর্জরিত করে তোল, ফল তার কোনদিনই ভাল হয় না। ওদের ভুলে যেতে দাও যে ওরা চাকর। ওরাও এ পরিবারের একজন, ওদেরও কর্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে, এটা যেদিন

বুঝিয়ে দিতে পারবে, দেখবে তোমার মঙ্গলের জন্যে ওরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

তেলের কাপটা টেবিলের একপাশে রেখে বাড়তি প্লেটখানা ক্ষণিকার সামনে বাড়িযে ধরে সুনীল বলে, আর প্লেট দিয়ে কি হবে দিদি ?

—হবে আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু! বলে নিজের প্লেট থেকে মুড়ি বেগুনি অর্ধেক ঢেলে দেয় খালি প্লেটটায়। তারপর তেলের কাপ থেকে ছোট্ট চামচেটায় করে একটু একটু তেল সব প্লেটগুলোর উপর ছড়িয়ে দিয়ে বলে, গরম মুড়ি বেগুনির নাম শুনলেই যে তোমার জিবের জলে নদী নালা বয়ে যায়, সে কথা এঁরা না জানলেও আমি তো জানি! সুতরাং দেরি না করে বাইরে বারান্দায় বসে তাড়াতাড়ি এগুলোর সদ্ব্যবহার করে আমাদের জন্যে চা করে আন—ঠিক যেমনটি আমি শিখিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, আর দেখ! পিসীমাকে বলো, এক কাপ চায়ে একটু আদার রস দিয়ে জানকীকে পাঠিয়ে দিতে।

অদ্ভুত মেয়ে। শুধু পড়াশুনায় নয়, সব দিকে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি। এর কাছে কথা বলার প্রয়োজন হয় না, সামনে এসে দাঁড়ালেই অন্তরের গহনতম প্রদেশও স্বচ্ছসলিলা যমুনার মত স্পষ্ট দেখতে পায়। শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে সমীদের মন ভারী হয়ে ওঠে।

তাপস ভাবছিল শিক্ষিতা সুন্দরী সব মেয়েরা যেদিন ক্ষণিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দাঁড়াবে, বাঙালীর সামাজিক, সাংসারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সেদিন বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা দেবে।

তিনজনেই চুপচাপ। শুধু টাটকা মুড়ির একঘেয়ে মচর মচর আওয়াজ ছাড়া আর কিছু কানে আসে না। খেতে খেতে মুখ তুলে ক্ষণিকার দিকে চেয়ে সমীদ বলে, ক্ষণিকা দেবী, একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে আপনার। আপনার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের কাছে এটা আমরা আশাই করতে পারিনি।

•বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় ক্ষণিকা।

কিছু বুঝতে না পেরে শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে তাপসও তাকায় সমীদের দিকে। সমীদের গম্ভীর মুখখানিতে ঈষৎ হাসির চোরা ঢেউ খেলে যায়, চকিতে তাপসের দিকে চেয়ে নিয়ে বলে—আমরা কি করে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করলাম, কি করেই বা খুঁজে পেতে এই দুপুর বেলা আপনার বাড়িতে এলাম, এটা তো একবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করলেন না ?

রীতিমত লজ্জা পায় ক্ষণিকা, বলে, সত্যিই আমার ভুল হয়ে গেছে, কথাটা একবারও আমার মনে হয়নি। বলুন না সত্যি কি করে আমার—

বাধা দিয়ে কপট রাগে জ্বলে উঠে তাপস বলে, আসল কথাটা কি জানেন ক্ষণিকা দেবী ! আপনার সামনে আমাকে অপদস্থ করে ও খানিকটা আনন্দ পেতে চায়।

গড়গড় করে এক নিঃশ্বাসে বলে যায় তাপস—বাড়ি চিনে আসার হাস্যকর ইতিহাস।

বক্তব্য শেষ করতে পারে না—মাঝ পথেই ক্ষণিকা ও সমীদের উচ্চ হাসির রোলে গা ভাসিয়ে দিয়ে তিন জনেই লুটিয়ে পড়ে সোফার উপর।

বাইরে সিঁড়ির কাছে জুতোর আওয়াজ শোনা যায়, চকিতে হাসি থামিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ক্ষণিকা। পরক্ষণেই সাহেবী পোশাক পরা একটি সৌম্যদর্শন প্রৌঢ়কে এক রকম টানতে টানতে ঘরে নিয়ে এসে বলে, আমার বাবা ! আর এঁরা দু'জন আমার সহপাঠী তাপস চৌধুরী ও সমীদ রায়—ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির দু'টি উজ্জ্বল কোহিনূর !

ব্যারিস্টার পঙ্কজ চক্রবর্তীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেঁটে গোলগাল গড়ন, মাথার সামনে চুল উঠে টাক পড়ে গেছে, দাড়ি গোঁপ পরিষ্কার করে কামানো—গোল মাংসল মুখখানিতে সব সময় হাসি

লেগে আছে। লোমশ ঘন ভুরুর নিচে চোখ হু'টো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রচ্ছন্ন কৌতুকে উজ্জ্বল।

নমস্কার-বিনিময়ের পালা শেষ করে চক্রবর্তী সাহেব বললেন, কণা-মা তুমি এঁদের সঙ্গে গল্প কর, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে নিচের মক্কেল হু'টিকে বিদায় করে তোমাদের আনন্দ মজলিশে যোগ দিচ্ছি।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে যেতে না যেতেই ক্ষণিকা আদেশের ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে বললে—ওকি! কোর্টের ধড়াচূড়ো না ছেড়েই যাচ্ছ যে বড়? শোবার ঘরে তোমার পায়জামা স্লিপার ও পাঞ্জাবি রেডি করা আছে।

অপরাধীর মত থমকে দাঁড়িয়ে লজ্জা পাওয়ার ভান করে একবার ফিরে তাকান চক্রবর্তী সাহেব, তারপর সোজা পশ্চিম দিকে সরু করিডর ধরে শেষ প্রান্তে বাঁ দিকের ঘরটায় ঢুকে পড়েন।

ট্রেতে করে তিন পেয়ালা চা নিয়ে এল সুনীল—হাত থেকে ট্রেটা নিতে নিতে ক্ষণিকা বললে, আরও হু'পেয়ালা চা নিচে বাবার ঘরে পাঠিয়ে দাও, আর পিসীমাকে বল বাবার মুশুম্বির রসটাও ঐ সঙ্গে নিচে পাঠিয়ে দিতে।

চা খেতে খেতে তাপস বললে, আচ্ছা ক্ষণিকা দেবী সংসারের এই সব খুঁটিনাটি বিলিব্যবস্থা করতেই দেখছি আপনার দিন কেটে যায়, পড়েন কখন?

—রাত্রে, যখন সবদিক নিশ্চুপ নিস্তব্ধ হয় তখন।

খালি পেয়ালাটা ট্রের উপর নাবিয়ে রেখে সমীদ জিজ্ঞাসা করে, আপনার মা কতদিন মারা গেছেন ক্ষণিকা দেবী?

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। হঠাৎ যেন একটু কেঁপে ওঠে ক্ষণিকা, তারপর অর্ধ সমাপ্ত পেয়ালাটা টেবিলে রেখে বাইরের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে চুপ করে থাকে। তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাপস তাকায় সমীদের দিকে।

অনুতপ্ত কণ্ঠে সমীদ বলে, প্রশ্নটায় আপনি এতখানি ব্যথা পাবেন জানলে—। বাধা দিয়ে ক্ষণিকা বলে, ব্যথা নয় সমীদবাবু! ঐ নিষ্ঠুর প্রশ্নটাকে এড়িয়ে চলবার জন্যেই রাতদিন সংসারের কাজে আর পড়াশুনোয় নিজেকে ডুবিয়ে রাখি, তা ছাড়া আপনারা জানেন না—

বলতে গিয়ে মাঝ পথে থেমে মুখ নিচু করে কি যেন ভেবে নেয় ক্ষণিকা, তারপর হাসি মুখ তুলে ওদের দিকে চেয়ে সহজভাবে বলে, আপনারা জানেন না, এবং অন্য কেউও জানে না—বাইরের জগতের কাছে আমার মা মারা গেলেও, আমি আর বাবা মাকে বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছি।

হেঁয়ালির মত কথা কিছু বুঝতে না পেরে দু'জনে ফ্যালফ্যাল করে ক্ষণিকার দিকে চেয়ে থাকে।

ক্ষণিকা বলে, বিশ্বাস করতে পারছেন না? আসুন আমার সঙ্গে।

ঘর থেকে বেরিয়ে উত্তরের বারান্দা দিয়ে খানিকটা এসে তিন তলার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে ক্ষণিকা।

রহস্যময়ী এই মেয়েটা না জানি আবার কোন্ নতুন রহস্যের মাঝখানে টেনে নিয়ে যাবে। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তাপস ও সমীদ নিঃশব্দে একটার পর একটা সিঁড়ির বাধা অতিক্রম করে ক্ষণিকার পিছনে চলতে শুরু করে।

॥ তিন ॥

উপরে উঠেই বাঁ দিকে পুবের ধার ঘেঁষে একখানা ঘর। দরজা বন্ধ, বাইরে থেকে শিকল দেওয়া, ক্ষণিকা দরজা খুলে পায়ের শ্লিপার বাইরে রেখে ভিতরে ঢুকে যায়। ওর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দু'জনে জুতো খুলে খালি পায়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের ভিতর থেকে জানলা খোলার আওয়াজ পাওয়া যায়, একটু পরে ক্ষণিকার মৃদু কণ্ঠ ভেসে আসে—আসুন।

ভিতরে ঢুকতে গিয়ে স্তব্ধ বিস্ময়ে দু'জনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ধূপের গন্ধের সঙ্গে টাটকা সুগন্ধি ফুলের সুবাস হাত ধরাধরি করে এসে সর্বাঙ্গ লেপটে ধরে মন-প্রাণ আচ্ছন্ন অভিভূত করে তোলে। সে ঘোর কিছুটা কাটলে দেখা যায়—দেওয়ালে কোনো ছবি নেই, ঘরে আসবাব পত্রও কিছু নেই, শুধু মার্বেলের মেঝের মাঝখানে দামী একখানা কারু-কার্য করা পালঙ্ক, তাতে ধবধবে বিছানা, দু'পাশে দু'টি তাকিয়া। উপরে নেটের মশারিটা সযত্নে ভাঁজ করে তুলে রাখা, আর মাথার উঁচু বালিশটায় হেলান দিয়ে বসে আছে চোখে-মুখে স্বাগত আহ্বানের হাসি মাখিয়ে মোহময়ী ক্ষণিকা! একটু পরেই ভুল ভেঙে যায়, দেখে, খালি মেঝেতে বসে মাথাটা বিছানার ধারে কাত করে রেখে ক্ষণিকা বসে আছে—নিস্পন্দ পাথরের মত। অস্পষ্ট গুঞ্জনের মত কানে আসে—আমার মায়ের ছবি।

ছবি? অজ্ঞাতে এক-পা দু-পা করে কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় দু'জনে। সত্যিই ছবি, জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে এতখানি সাদৃশ্য কদাচিৎ চোখে পড়ে।

সুন্দরী মেয়েদের দু'টি বিভাগে ভাগ করা চলে। এক, চোখ ঝলসানো চমক লাগানো রূপ; যাদের দেখলেই সারা দেহে শিহরণ

জাগে অজান্তে বুঝি বা প্রথম রিপুটাও ঘুম ভেঙে লোভাতুর চোখ মেলে চেয়ে থাকে। দ্বিতীয়, যাদের অপরূপ দেহলাবণ্য অভিভূত করে স্থান কাল এমন কি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়; মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু অপলক চেয়ে থাকতে হয়, ইচ্ছে করেও চোখ ফেরান যায় না। মানুষের কামনা-বাসনার অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে এরা শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মনটাকে আচ্ছন্ন করে তোলে।

ক্ষণিকার মাকেও নিঃসন্দেহে এই পর্যায়ে ফেলা যায়। সমীদ ও তাপস অভিভূতের মত ক্ষণিকার পাশে মেঝের উপর চুপ করে বসে পড়ে।

ঘরের মধ্যে থমথমে নিস্তব্ধতা, কথা কইতে সাহস হয় না। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটে, তারপর ক্ষণিকাই আপন মনে বলে, আজ তিন বছর হল মা মারা গেছেন।

কথা কইবার সুযোগ পেয়ে বেঁচে যায় ওরা। সমীদ বলে, কি হয়েছিল?

—ক্যানসার! গোড়ায় ডাক্তার রোগ ধরতে পারেননি, যখন ধরা পড়ল, টু লেট! ওষুধ নেই, এবং এ রোগ সারে না জেনেও বাবা জলের মত টাকা খরচ করেছিলেন—এমন কি, শেষের দিকে মাকে নিয়ে বিলেত যাবার ব্যবস্থাও করে ফেলেছিলেন, কিন্তু তা হল না।

অবাক হয়ে দু'জনেই এক সঙ্গে বলে, কেন?

—মা-ই বাধা দিলেন। বললেন, আমি জানি ইয়োরোপেও আজ পর্যন্ত এ রোগের ওষুধ আবিষ্কার হয়নি, মিছিমিছি শেষ ক'টা দিন কেন আমায় নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবে, তার চেয়ে আমার ফুরিয়ে আসা বাকি দিনগুলো তুমি আমার কাছে কাছে থাক।

গলা ভারী হয়ে আসে ক্ষণিকার। একটু সামলে নিয়ে সে আবার বলে, মা বললেন, প্রথম জীবনে যখন তোমায় বড্ড কাছে পেতে ইচ্ছে হত, তখন তুমি দীর্ঘ দিন কাটিয়ে দিলে বিলেতে—ফিরে এসে পসার

জমাতে রাতদিন মেতে রইলে মক্কেল আর মকদ্দমা নিয়ে। আজ পর্যন্ত একান্তভাবে কোনও দিন তোমাকে পাইনি।

কি মনে হল, মুখ তুলে ছবিটার দিকে চেয়ে দেখলে তাপস। ক্ষণিকার মায়ের চোখ দু'টি যেন রুদ্ধ অভিমানে ছল ছল করছে। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিয়ে সে বললে, তারপর ?

—তারপর ? মায়ের মৃত্যুর দিন পনেরো আগে থেকে বাবা কোর্টে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। বাড়ি থেকেও বার হতেন না। রাতদিন মায়ের কাছে বসে গল্প করতেন।

হাসি গল্প দিয়ে শুরু করে রূপকথার ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যার মত ক্ষণিকা ওদের থমথমে ব্যথার রাজ্যে এনে ছেড়ে দিলে। হালকা প্রসঙ্গে আনতে চেষ্টা করে সমীদ বলে, আচ্ছা ক্ষণিকা দেবী, আপনার বাবা, সুনীল এরা আপনাকে কণা বলে ডাকে অথচ আপনার নাম ক্ষণিকা।

আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে হাসি মুখে ফিরে তাকায় ক্ষণিকা। তারপর বলে, আমার দু'টো নাম। একটা আমার মায়ের দেওয়া আর অন্যটি বাবার। এই দেখুন ঘুরে ফিরে খালি আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছি, নিশ্চয় আপনাদের খুব বোরিং লাগছে।

দু'জনে সমস্বরে প্রতিবাদ করে—মোটেই না। আপনি বলুন। ক্ষণিকা বলে, আমার একটা মস্ত দোষ হচ্ছে এই যে, বাবা-মার প্রসঙ্গে কথা কইতে পেলে থামতে ভুলে যাই। অনেকের কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে, কিন্তু বিশ্বাস করুন—

বাধা দিয়ে তাপস বলে, আপনিও বিশ্বাস করুন—শুনতে আমাদের অসম্ভব ভাল লাগছে। শুনবেন আমার কথা—ছেলেবেলায় মাকে ভাল করে চেনবার আগেই তাঁকে হারিয়েছি আমি, বিমাতার কাছে মানুষ হয়েছি, কিন্তু থাক সে কথা। আর সমীদের হয়ে আমি

এইটুকু বলতে পারি যে, সংসারে ওর মা ছাড়া আর কেউ নেই ; মাকে ও খুব ভালবাসে ঠিক আপনার মতই।

মনে মনে খুসী হয় ক্ষণিকা। বলে, বাবা মার কাছে শুনিছি, আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম একরত্তি ছোট্ট একটা মাংসর টুকরো। তা দেখে মা বাবাকে বলেছিলেন, ওর নাম রাখ কণিকা। বাবা প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, চিরকালই কি ও ছোট একরত্তি থাকবে? ওর নাম আমি রাখলাম, ক্ষণিকা। নাম নিয়ে দু'জনে প্রায়ই ঝগড়া হত। বড় হয়ে সব শুনে আমি নিলাম বাবার দেওয়া নাম, আর বাবা মাকে সুখী করতে ডাকতেন কণা-মা বলে। এই হল আমার নামের ছোট্ট ইতিহাস।

—আর মাকে বাঁচিয়ে রাখার ইতিহাস? আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে সমীদ। নিমেষে আবার মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে ক্ষণিকার। মুখ ফিরিয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে বলে, আর একদিন শুনবেন, আপনাদের দেরি হয়ে যাবে।

হোক দেরি—আপনি বলুন, প্লিজ। তাপসের সমর্থনে নীরবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে সমীদ।

—মরবার দু'দিন আগে থেকে কথা বন্ধ হয়ে যায় মায়ের। বিছানার দু'পাশে দু'খানি হাত ধরে বসে থাকতাম আমি আর বাবা। মায়ের চোখের ভাষা বাবা পরিষ্কার বুঝতে পারতেন, তাই চোখে চোখ পড়লেই অনর্গল বলে যেতেন নতুন বিয়ের পর ছল-ছুতো করে কলেজ থেকে পালিয়ে আসার কথা, বিলেতে গিয়ে রোজ একখানি করে প্রেমপত্র লেখার কথা। কবে ল্যাণ্ডলেডির পালিতা কন্যা ম্যড্ চিঠি-পত্র দেবার অছিলায় বাবার ঘরে এসে প্রেম নিবেদন করেছিল সেই সব কথা। বাবা তাকে মায়ের একখানা ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, এই আমার স্ত্রী, একে ছাড়া আর কোনও মেয়েকে চেষ্টা করেও আমি চিন্তা করতে পারিনা ম্যড্!—আচ্ছা তুমিই বলতো খুব খারাপ দেখতে

কি ? লজ্জায় অপমানে রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ম্যাড্। আর কখনও পারতপক্ষে বাবার সামনে আসত না। এই সব বার বার বলা পুরোনো কথা। দেখতাম, শুনতে শুনতে আনন্দে গর্বে মায়ের রক্তহীন পাণ্ডুর মুখখানা খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কথা কইতে পারতেন না, শুধু হাত তু'টো জোরে চেপে ধরে রাখতেন। যেন বলতে চাইতেন—আমি যাব না, কার সাধ্য আমাকে এদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়! তু'ফোঁটা জল চোখের কোণে চিকচিক করে উঠতো। আমি কেঁদে ফেলতাম। বাবা হাসি মুখে মাকে বোঝাতেন—আমি বিলেত ফেরত হলেও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করি মিনু। পৃথিবীর সব দেশের কাব্যে সাহিত্যে শুধু চোখ বোলালেই দেখা যায়, সত্যিকার প্রেম ভালবাসা অবিনশ্বর। সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত তাই বড় বড় মনীষীরা এরই জয়গানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে অমরত্বলাভ করেছেন। তোমার আমার এই যে প্রেম ভালবাসা একি তু'দিনেই মুছে যাবে মনে কর ? কখনই না, আমরা বেঁচে থাকবো চিরকাল। তু'দিন আগে-পিছে ছাড়াছাড়ি হওয়ায় কী আসে যায়।

বেশ অনুভব করতাম মায়ের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হয়ে আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়তো। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পরিশ্রান্ত চোখ তু'টো বুঁজে চুপ করে আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকতেন মা, শুধু তু'ফোঁটা জল চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে মাথার বালিশটায় মিশে যেতো।

কাছে-পিঠে কোন দেবালয় থেকে সন্ধ্যা আরতির ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে। আশপাশের কয়েকটি মধ্যবিত্তের বাড়ি থেকে শঙ্খধ্বনিও শোনা যায়। আবছা আঁধারে ঘরের মধ্যে শুধু তিনটি প্রাণী নিশ্চল পাথরের মত চুপ করে বসে থাকে। মনে মনে বুঝি বা তারা একই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে—মৃত্যুর পর ইহজগতের সঙ্গে সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে যায় কিনা ?

তুরাগত অস্পষ্ট কান্নার মত ক্ষণিকার কণ্ঠ ভেসে আসে—জীবনে

সঙ্গী বন্ধু বলতে মা বাবাকেই জানতাম। মায়ের মৃত্যুর পর তিন-চার দিন বিছানা থেকেই উঠিনি। বাবা এসে অনেক বুঝিয়ে একটু দুধ, ফল খাইয়ে যেতেন। সব চেয়ে আশ্চর্য হয়ে যেতাম বাবার ব্যবহারে। মা মারা যাবার পরদিন থেকেই নিয়মমত খেয়ে-দেয়ে পোশাক পরে কোর্টে বেরুতে লাগলেন বাবা। দেখে-শুনে শুধু অভিমান নয় রাগও হল বাবার ওপর, ভাবলাম দুনিয়ায় সবই কি মিথ্যে! জন্মান্তরবাদ, প্রেম, ভালবাসা, এ সবই কি ধোঁকা দেওয়া স্তোকবাক্য! যারা বেঁচে রইল, কী সম্বল করে বাকি দিনগুলো কাটাবে তারা? বাবার উপর যদি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি, আমিই বা তাহলে বাঁচবো কি নিয়ে? খেতে পারিনা, ঘুমুতে পারিনা, পড়তে ভাল লাগেনা, এমন একজন সঙ্গী নেই যার সঙ্গে কথা বলে কিছুটা সময় কাটিয়ে দিতে পারি। কেমন পাগলের মত হয়ে গেলাম। বেশ বুঝতে পারলাম আর কিছুদিন এইভাবে চললে আমি উন্মাদ হয়ে যাব।

একদিন দুপুরে দেখি আমার ঘরের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সুনীল। বললাম, কিছু বলবে সুনীল?

বেশ একটু কিন্তু-কিন্তু হয়ে সুনীল বললে, ক'দিন ধরে একটা কথা তোমায় বলব-বলব মনে করছি দিদি, কিন্তু সাহস করে বলতে পারিনি।

অবাক হয়েই বললাম, কী কথা?

—বাবুর কথা!

রেগেই বললাম, বাবার কী এমন কথা যা তুমি সাহস করে আমায় বলতে পার না? প্রথমটা নার্ভাস হয়ে গেল সুনীল, তারপর একটু সামলে নিয়ে বললে, বাবু রাত্রে ঘুমোন না— সারারাত কার সঙ্গে কথা বলেন।

বিশ্বাস করতে পারি না, বলি, তুমি কি করে জানলে?

—রোজ রাতে সব আলো নিবানো হয়েছে কিনা দেখে আমি শুতে যাই—তিনচার দিন আগে বাবুর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখি, ঘরে আলো জ্বলছে আর বাবু কার সঙ্গে কথা কইছেন।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, আচ্ছা তুমি যাও, আমি দেখছি কি ব্যাপার।

সন্ধ্যার পর থেকেই মাথা ধরার অছিলায় ঘরের আলো নিবিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকি। আবোল-তাবোল চিন্তা এসে মনটাকে বিষাক্ত বিদ্রোহী করে তুলতে চায়। কোর্ট থেকে ফিরে জামা কাপড় ছাড়তে উপরে এসে বাবা বাইরে থেকে কয়েকবার ডাকলেন; ইচ্ছে-করেই সাড়া না দিয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। ক্রমে রাত্রি বাড়ে, আমিও বিছানায় ছটফট করতে থাকি। এরই মধ্যে কখন বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ধড়মড় করে জেগে উঠে শুনি নিচের বড় দেওয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং করে এগারটা বাজছে। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখি ঘরে আলো জ্বলছে। দরজায় কান পেতে কথাবার্তা কিছুই শুনতে পেলাম না। ঘুরে দক্ষিণের বারান্দায় জানালার সামনে এসে দাঁড়ালাম। খোলা খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে ঘরের সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

দেখলাম, মায়ের ড্রেসিং টেবিলটার সামনে ছোট টুলটার ওপর বসে বাবা নিশব্দে কাঁদছেন। কাঁদতে বাবাকে কোনদিন দেখিনি, মায়ের মৃত্যুর দিনও না। বেশ অবাক হয়ে গেলাম। একটু পরেই দেখি বাবার হাতে রয়েছে মায়ের ছোট্ট ফটোখানা—যেখানা বিলেতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে ছবিখানা চোখের সামনে ধরলেন বাবা, তারপর বললেন, মিনতি, মরবার আগে কথা দিয়ে গিয়েছিলে তুমি, যখনই ডাকব আসবে। আজ দেরি করছ কেন? সারাদিন কাজকর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখি, কিন্তু রাত যে আমার কিছুতেই কাটতে চায় না।

আমি অবাক হয়ে শুধু ভাবতে থাকি, উচ্চশিক্ষিত বিলেত ফেরত বাবা আমার, এ কি অন্ধ কুসংস্কার আঁকড়ে পড়ে আছেন? কিন্তু চমকে উঠলাম বাবার পরের কথায়।

—এসেছ? আঃ বাঁচলুম!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ঘরের মধ্যে খুঁজে বেড়াই কিছুই দেখতে পাই না, শুধু শুনতে পাই বাবার অফুরন্ত কথার পাঁচালি।

—জানো মিনু আজ একটা ভারী মজার মামলা এসেছিল, স্ত্রী খোরপোষের দাবীতে নালিশ করেছে। স্বামীর অবস্থা ভাল, তিনি চান আইনের ফাঁকে স্ত্রীকে ফাঁকি দিতে। তুমি একদিন বলেছিলে মনে আছে? জেনেশুনে শুধু টাকার লোভে অন্যায়ের সমর্থন কোন দিন কোরো না, ছেড়ে দিয়ে এলাম কেসটা।

বাবা যেন দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশের খাতা খুলে বসেছেন।

—আজ কণা-মার পিসী শুক্তটা খুব ভাল রেঁধেছিলেন, ঠিক তুমি যেমনটি বলে দিয়েছিলে। তুমি তো জান মাছের ঝোল তোমার মত কেউ রাঁধতে পারে না, পারবেও না—হ্যাঁ হ্যাঁ পেট ভরেই খেয়েছি, না খেলে খাটবো কি করে? শুধু মুশকিল হয়েছে কণা-মাকে নিয়ে, না আছে কোনো সঙ্গী-সাথী, না আছে সান্ত্বনা দেবার কেউ। আমিও সারা দিন থাকি কোর্টে, ওর জন্যেই মনটা সব সময় চঞ্চল হয়ে থাকে।

হঠাৎ যেন দেখলাম, হয়তো বা আমার চোখের ভুল—ড্রেসিং মিরারটার ভিতরে বাবার দিকে হাসি মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মা! সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা অস্ফুট চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

জ্ঞান হতে দেখি শুয়ে আছি বাবার খাটে, কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন বাবা। পিসীমা এক কাপ গরম হরলিক্স হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কাপটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে বাবা বললেন, যান আপনি শুতে যান, রাত অনেক হয়েছে। পিসীমা ও চাকর-বাকর

সবাই চলে গেলে, কাপটা মুখের কাছে ধরে বাবা বললেন, ভালই করেছ কণা-মা, শুধু বিশ্বাস কোরো, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাসই হল ইহলোক-পরলোকের যোগসূত্র।

এই হল আমাদের মাকে বাঁচিয়ে রাখার ইতিহাস। অবসাদে মাথাটা খাটের উপর এলিয়ে দিয়ে চুপ করলো ক্ষণিকা।

বাইরে আরতির শঙ্খ ও ঘণ্টা ধ্বনি অনেকক্ষণ থেমে গেছে, রাত যে কত হয়েছে কারুরই খেয়াল নেই, অন্ধকার ঘরে শুধু দেখা যায় দূরাগত এক টুকরো ইলেক্ট্রিকের আলো ঘন গাছপালার আবরণ ভেদ করে পুবের জানলা দিয়ে ক্ষণিকার মায়ের ছবিটার ওপর ঠিকরে পড়ে যেন বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সীমা রেখায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে।

॥ চার ॥

তাপসকে ওদের ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে নামিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে সমীদ যখন শ্যামবাজার চৌমাথায় পৌঁছল তখন রাত দশটা বেজে গেছে। মোড় থেকে সামান্য একটু এগিয়ে বড় রাস্তার ওপরই ওর বাসা। রাস্তার দু'ধারে দোকানপাট প্রায় বন্ধ। দু'টো দোকানের মাঝখান দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। বাঁ দিকে সমীদদের ফ্ল্যাটের দরজা, ডান দিক দিয়ে সিঁড়ি ঘুরে উপরে উঠে গেছে তিন-তলায়—সেখানে অন্য ভাড়াটে।

দরজা একটু ঠেলতেই খুলে গেল। একটু অবাক হয়ে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে সমীদ। এত রাতে দরজা কোনও দিনই খোলা থাকে না—হয়তো বুড়ো চাকর ভিখন নিচে-কাছে কোথাও আড্ডা জমিয়েছে দেশওয়ালি ভাইদের সঙ্গে। বারান্দা দিয়ে কয়েক পা এগিয়েই উত্তর দিকে সমীদের পড়বার ঘর। ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে কয়েক টুকরো আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। সমীদ বাড়িতে না থাকলে ও ঘরটা তালাবন্ধ থাকে। এমনিতে এক মা রমা দেবী ছাড়া বড় একটা ঢোকে না কেউ ঘরে, সমীদ পছন্দও করে না। আস্তে দরজা ঠেলে ভিতরে উঁকি দিয়েই বজ্রাহতের মত হয়ে গেল সমীদ।

পাখাটা ফুল ফোর্সে খুলে দিয়ে, টেবিলের ওপরকার রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে, মোটা একখানা ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আঙুল দিয়ে বন্ধ করে, সেটাকে কোলের ওপর রেখে সমীদের পড়বার চেয়ারটায় গা এলিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে একটি সুন্দরী তরুণী।

দুর্যোগের দিনে সমুদ্রতটের এলোমেলো ব্রেকারের মত একটার পর একটা বিস্ময়ের ঢেউ। একটা সামলে উঠবার আগেই আর একটা।

অদ্ভুত মেয়ে ক্ষণিকার কথাই সারা দেহমন আচ্ছন্ন করে আছে, তার উপর –। সমীদের মনে হল মেয়েটির বয়স খুব বেশি যদি হয় আঠারো, নিটোল স্বাস্থ্য, নাক চোখ মুখ যেটুকু দেখা যাচ্ছে নিখুঁত সুন্দর। গায়ের রঙ ক্ষণিকার মত না হলেও বেশ ফর্সা বলা চলে। ঘুমন্ত এ রকম একটি শ্লথ-বসনা সুন্দরী মেয়ের এতখানি নিকট সান্নিধ্যে এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা স্বভাব-লাজুক সমীদের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। লজ্জায় লাল হয়ে চোরের মত সন্তর্পণে দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সমীদ। বারান্দার পশ্চিমে শেষ ঘরটায় রমা দেবী থাকেন। আস্তে আস্তে বন্ধ দরজার সামনে এসে চাপা গলায় সমীদ ডাকলে—মা! মা!!

বোধহয় ঘুমিয়ে ছিলেন রমা দেবী। ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে সামনে সমীদকে দেখে বললেন, কি রে খোকা! এত রাত অবধি ছিলি কোথায়? কলেজ থেকে বাড়িও এলি না, একটা খবর পর্যন্ত দিলি না, ব্যাপার কি?

—সব পরে বলবো তোমায়।

একটু ইতস্ততঃ করে বলে, আমার পড়ার ঘরে চেয়ারে বসে একটি মেয়ে ঘুমুচ্ছে—

বেশ সহজভাবে রমা দেবীও বলেন, ও আমাদের সুমিতা, চিনতে পারিস্‌নি?

হাঁ করে ঘাড় নেড়ে সমীদ জানায়, না।

—আর চিনবিই বা কী করে, এই এতটুকু দেখেছিস ওকে।

বৃষ্টি থেমে গেলেও মেঘ কাটে না। জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে সমীদ।

রমা দেবী বলেন, কাশীতে আমার গঙ্গাজল অন্নপূর্ণাকে মনে পড়ে তোর?

না পড়বার কথা নয়। উৎসাহ ভরে সমীদ বলে, নন্দীমাসি?

হেসে ফেলেন রমা দেবী। বলেন, হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সুমিতা তোর সেই নন্দীমাসির ছোট মেয়ে, কলকাতা থেকে বি. এ. পরীক্ষা দিতে চায়। 'গঙ্গাজল' লিখেছেঃ ওখানে পড়াশুনার সুবিধা হচ্ছে না, এখানে কোনও ভাল বোর্ডিং-এ ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। সঙ্গে এসেছিলেন সুমিতার ছোট মামা। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর অনেকক্ষণ তোর জন্যে অপেক্ষা করলেন, এদিকে বিকেল পাঁচটার গাড়িতে তাঁকে পাটনায় যেতেই হবে। কি করি, আমি বলে দিলাম বোর্ডিং-এর কোনও দরকার নেই—আমি তো একাই থাকি, স্বচ্ছন্দে আমার কাছে থাকবে সুমি; তা ছাড়া পরীক্ষার ব্যাপারে খোকাও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে। কি বলিস্?

উৎসাহ বিশেষ না থাকলেও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় সমীদ্।

নন্দীমাসির ইতিহাস খুব ছোট্ট হলেও এখানে বলা দরকার। রমা দেবীর পিত্রালয় বেনারসে। ছোট বেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর বড় ভাই অম্বুজ রায় এক রকম মানুষ করে বিয়ে দেন রমা দেবীর। বেনারসের নাম করা উকিল, পসার-প্রতিপত্তি পয়সা কোনটারই অভাব ছিল না তাঁর। সেই একমাত্র সহোদরা রমাকে মোটামুটি লেখা পড়া শিখিয়ে ভাল ঘরে বরে বিয়ে দিতে অম্বুজবাবু কার্পণ্য করেননি। রূপের খ্যাতির সঙ্গে রমা দেবীর বুদ্ধির খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। বিয়ের পর যখনই পিত্রালয়ে আসতেন, আশপাশের প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়েরা প্রায় সব সময় ঘিরে থাকতো রমা দেবীকে। কয়েকজনের সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্বও জমে ওঠে। পিত্রালয় থেকে চলে কালে গেলেও পাটনা থেকে নিয়মিত পত্রালাপ করতেন কয়েকজনের সঙ্গে। গ্রীষ্মের অবকাশে বা পূজার ছুটিতে মায়ের সঙ্গে বেনারসে এসে সব চেয়ে মুশকিলে পড়তো সমীদ। বাড়ি সব সময় মায়ের অন্তরঙ্গ 'গঙ্গাজল', 'চোখের কাজল' প্রভৃতি বান্ধবীতে থাকত সরগরম। তার উপর নিত্য নতুন মেয়ের ভিড়—বাড়িতে তিষ্ঠানই সমীদের পক্ষে

কষ্টকর হয়ে পড়তো। ছেলেবেলা থেকেই একটু লাজুক গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে, সেই জন্যেই মেয়েদের সান্নিধ্য যথাসম্ভব পরিহার করে চলতো সমীদ। ফলে সারাটা দিন হয় ছাতের ওপর বই নিয়ে, নয়তো গঙ্গার ঘাটে বসে অথবা পায়চারি করে সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরতো। একদিন বাড়ি ফিরতেই বাইরের ঘরে সমীদের সঙ্গে রমা দেবীর দেখা। এমনিতে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরের ঘরে বড় একটা আসতেন না রমা দেবী, কিন্তু সেদিন সমীদের বাড়ি ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখেই হয়তো—। সমীদ কিছু বলবার আগেই রমা দেবী বললেন, যা তো খোকা, চট্ করে তোর মাসিমার খবরটা নিয়ে আয়তো, কাল শরীর ভাল নেই বলে সকাল সকাল চলে গেল, অথচ আজ সারাদিন কাটলো দেখা নেই—ব্যাপার কি, কিছুই বুঝতে পারছি না!

সমীদ—কোন্ মাসিমা, মা?

রমা দেবী—আমার 'গঙ্গাজল', তোর অন্নপূর্ণা মাসিমা।

সমীদ—মুশকিলে ফেললে মা, আমার অসংখ্য মাসিমা, সবার নামও আমার জানা নেই, কি করে বুঝবো কার খবর নিতে বলছো?

রমা দেবী—ঐ যে বড় রাস্তা পেরিয়ে বাঁ হাতের প্রথম গলিটায় ঢুকেই বাড়িটা, বাইরে নেম প্লেটে লেখা আছে: মিঃ অজয়কুমার নন্দী, এম. এ, বি. এল., বুঝেছিস?

—বুঝেছি, নন্দীমাসি! বলেই বড় রাস্তা মুখো পা চালিয়ে দেয় সমীদ।

পরদিন দুপুরের মহিলা মজলিশে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়েছিল—নন্দীমাসি।

এরই মধ্যে কখন চুপি সাড়ে ঘুম থেকে উঠে রমা দেবীর পাশে দাঁড়িয়েছে সুমিতা, সমীদ জানতে পারেনি। চমক ভাঙল রমা দেবীর কথায়—তোর সমীদ দা।

লজ্জানত মুখে সামনে এসে নিচু হয়ে প্রণাম করে রমা দেবীর

পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় সুস্মিতা। কথা যোগায় না সমীদের, আমতা-আমতা করে বলে—সেই এতটুকুন দেখেছিলাম বেনারসে, তাই ঠিক চিনতে পারিনি। বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে, জোরে পা চালিয়ে দেয় পড়ার ঘরের দিকে।

রমা দেবী বলেন, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় খোকা! রাত দশটা বেজে গেছে।

না ফিরেই চলতে চলতে জবাব দেয় সমীদ, আমি এক বন্ধুর বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি মা, আমার জন্যে বসে থেক না, তোমরা খেয়ে নাও।

পড়ার ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে ঝুপ করে চেয়ারটায় বসে ঘামতে থাকে সমীদ। এ রকম ঘটনাবহুল দিন তার জীবনে আর কোনও দিন আসেনি।

তিন তলার ছোট্ট ঘরটিতে আলো নিবিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়ে তাপস। ঘুম আসে না—আসে ক্ষণিকা, নানা রূপ ধরে ; নানা ভাবে এসে তাপসের তরুণ মনে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রাত বাড়ে, পাড়া নিশুতি হয়ে আসে, তাপস উঠে সামনের ছাদে অস্থির ভাবে পায়চারি শুরু করে।

পুবের নির্মেঘ আকাশে তারার ফুলঝুরি—তারই মধ্যে একটি যেন বেশী উজ্জ্বল। অপলক সেই দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে তাপস—ভাবে, ক্ষণিকা হয়তো এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ছে, নয়তো—। আর ভাবতে পারে না, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে আলোর সুইসটা টিপে ধরে। টেবিলের উপর একপাশে রাতের খাবার ঢাকা রয়েছে—মাইনে করা উড়ে ঠাকুরের দৈনন্দিন রুটিন বাঁধা কর্তব্য। পাশে রাখা কাঁচের গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে জলটা শেষ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে তাপস।

শৈশবে হারিয়ে ফেলা মায়ের চেহারা মনে করবার চেষ্টা করে তাপস—পারে না, সব ঝাপসা অস্পষ্ট বিস্মৃতির কুয়াশায় ঢাকা। মনে পড়ে মায়ের একখানা ছবি বাবার ঘরে ছিল, বিমাতা সুনলিনীর এ বাড়িতে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সেটা আর দেখা যেত না। তাপসের রাগ হয় বিমাতার উপর—ভাবে, কী দরকার ছিল ঐ সামান্য ছবিটা সরিয়ে ফেলবার? ইহলোকে সব দেনা-পাওনা শোধ করে যে চিরদিনের মত বিদায় নিয়ে গেছে, কী ক্ষতি হত তার ঐ ক্ষুদ্র স্মৃতিচিহ্ন-টুকু ঘরে থাকলে? পরক্ষণেই চমকে ওঠে—ক্ষণিকার মায়ের ছবিটার কথা মনে পড়ে যায়।

অভিমান হয় বাবা বিনোদ চৌধুরীর উপর। তিনি একটু শক্ত হলে হয়তো আজও ছবিটা থাকতো। পরক্ষণেই ভুল ভেঙে যায় তাপসের, সমবেদনায় নিরুপায় বাবার উপর মনটা ভারী হয়ে ওঠে।...

তাপসের বাবা বিনোদবাবুকে বিলডিং কনট্রাক্টের কাজে বেশির-ভাগ সময় বাইরে কাটাতে হত। বাড়িতে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক ছিল না দাসদাসী ছাড়া। এ অবস্থায় চার বছরের মা-হারা ছেলে তাপসকে নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েন তিনি। অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত বয়স্থা মেয়ে সুনলিনীকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। সুনলিনী এ সংসারে এসেই তাপসকে বুকে তুলে নিলেন, বিনোদবাবুও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দ্বিগুণ উদ্যমে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। দু'তিন বছর বেশ শান্তিতে কেটেছিল, অশান্তির সূত্রপাত হলো সুনলিনীর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে। আরও একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হবার পর তাপস রীতিমত বিমাতার চক্ষুশূল হয়ে পড়ল। অনাদর অবহেলা, তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপারে গালাগালি ছাড়াও বিনোদবাবুর কাছে তাপসের নামে লাগানি, ভাঙানিও শুরু হয়ে গেল। সব বুঝেও অসহায় বিনোদবাবু চুপ করে থাকতেন। মাতৃহীন কিশোর ছেলেকে নিষ্ঠুর হাতে শাসন করে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করতে তাঁর বিবেকে বাধতো।

এর জন্য যথেষ্ট গঞ্জনাও সহ্য করতে হত তাঁকে, কিন্তু নিরুপায়। অনেক চিন্তা করে শেষে তাপসকে তিনি শান্তিনিকেতনে রেখে আসাই সব চেয়ে নিরাপদ বলে মনে করলেন।

সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এই হল তাপসের বাল্যজীবনের ছোট্ট ইতিহাস। দীর্ঘ পনেরো বছরেও এই ধারার কোনও পরিবর্তন হল না। আজও নিজের বাড়িতে তাপস অবাঞ্ছিত অতিথির মত। একমাত্র বাবা ছাড়া এ বাড়িতে তার অবস্থিতি যে আর কারও কাম্য নয়, এটাও অনেক দিন আগে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। জীবনের বিক্ষিপ্ত এলোমেলো ঘটনার গ্রন্থিগুলো জোড়া দিয়ে এগিয়ে চলে তাপস। বেশী দূর যেতে পারে না—সামনেই পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে হাস্যমুখী ক্ষণিকা!

॥ পাঁচ ॥

প্রেম অন্ধ, কিন্তু গতিবেগ তার দুর্বার ; হাওয়ার আগে চলে। তাপস সমীদ ও ক্ষণিকাকে দেখলেই কথাটা অস্বীকার করবার কোন ফাঁকই খুঁজে পাওয়া যায় না।

ক্ষণিকাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হবার পর তিনমাস কেটে গেছে—এরই মধ্যে আপনি থেকে তুমি হয়েছে। প্রায়ই ক্ষণিকাদের বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ ছাড়াও—রোজ ক্লাসে একসঙ্গে বসা, ছুটির পর কোনও দিন সিনেমা, কোনও দিন রেস্তরাঁ, কোনও দিন গড়ের মাঠ বা লেক, এ সব এই তিনটি প্রাণীর নিত্যকার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। ক্লাসে সহপাঠী ছেলেমেয়ের দল ঈর্ষাবিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে, কুৎসা রটায়, ঠাট্টা করে—ওরা ভ্রূক্ষেপ করে না।

সেদিন কলেজের ছুটির পর রাস্তায় বেরিয়েই ক্ষণিকা বললে, আজ আর সিনেমা রেস্তরাঁ নয়, চল সোজা আউটরাম ঘাটে।

তিনজনে ধর্মতলার ট্রামে উঠে বসল। এসপ্লানেড থেকে কার্জন পার্কের মধ্যে দিয়ে সোজা হেঁটে চলল আউটরাম ঘাটে। তখনও সন্ধ্যার দেরি আছে। তিনজনে উপরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে, খালি একখানা বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল।

পিছনে ক্যানটিনে লোকজন কেউ নেই, শুধু কাউণ্টারে হেলান দিয়ে একটি বয় গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঝিমুচ্ছে। তাপস চীৎকার করে ডাকে—বয়! চমকে উঠে তাড়াতাড়ি সামনে এসে সেলাম করে দাঁড়ায় বয়'টা। তাপস বলে, কি খাবার পাওয়া যাবে তোমার ক্যানটিনে?

জবাব আসে হিন্দীতে : আভি তো খালি চা কেক্ অওর বিস্কুট মিলেগা। অসহিষ্ণু হয়ে তাপস বলে, বোর্ড মে তো লিখা হ্যায়—চপ কাটলেট কারি কোর্মা।

বাধা দিয়ে বয় বলে, সব কুছ মিলেগা হুজুর, লেকিন থোড়া দেরি হোগা।

—কেওঁ—কেওঁ?

—ক্যানটিন-কা টাইম আভিতক হুয়া নেহি—এক ঘণ্টা বাদ বাবুর্চি আয়েগা।

অগত্যা চা কেক আর বিস্কুট আসে। খেতে খেতে ক্ষণিকা বলে, একটুতেই অধৈর্য হয়ে পড় তাপস! ঘণ্টাখানেক বাদে দিব্যি গরম গরম চপ কাটলেট খাওয়া যেত।

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে কাপটা নামিয়ে তাপস বলে, ঐ যে কথায় বলে না—লড়াই কবে? কাল? আমি যাব পরশু। খিদেয় পেট চোঁচোঁ করছে, আর তুমি কিনা অনায়াসে বলে দিলে—এক ঘণ্টা ধৈর্য ধর।

দুষ্টুমি-ভরা নিঃশব্দ হাসিতে সারা দেহ কেঁপে ওঠে ক্ষণিকার। চা খেতে খেতে মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তাপস।

গঙ্গার বুকে গেরিমাটি-গোলা জলের সমারোহ—ঢেউ নেই, টান নেই, পরিপূর্ণ জোয়ার দু'কূল ছাপিয়ে শান্তশিষ্ট ছেলেটির মত কার পথ-নির্দেশের অপেক্ষায় যেন চুপটি করে আছে। অপর তীরে, শিবপুরের কলকারখানার চিমনির আড়ালে—নিস্তেজ বিদায়ী সূর্য লুকোচুরি খেলছে। গঙ্গার বুকে তার বিরাট প্রতিচ্ছবি দু'কূল ছুঁয়ে লজ্জানত নববধূর মত ঝিরঝিরে হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

চায়ের কাপ হাতে অপলক মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সমীদ। একটু খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারেনা ক্ষণিকা। বলে, ও রকম বাহ্যজ্ঞান শূন্য না হয়ে চা'টা খেতে খেতেও ঐ পরম ও রমণীয় দৃশ্যটি দেখা চলতো—আমরা কেউ অস্বীকার করতাম না যে, একটা দুর্দান্ত কবি-প্রতিভা তোমার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

ঠাণ্ডা চায়ে দু'তিনটে চুমুক দিয়ে, কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দেয় সমীদ: একটু ভুল করলে ক্ষণিকা! (সুন্দরকে ভাল লাগাটা

আমারই শুধু একচেটে নয়, এ গুণটা সবার মধ্যেই অল্পবিস্তর রয়েছে। কার কতখানি ভাল লাগল, কথার মালা গেঁথে যাঁরা সামনে তুলে ধরেন, তাঁরাই কবি আখ্যা পান। সে তুরাশা আমার নেই। নিজের ভাল লাগে তাতেই আমি খুসী।)

তাপস ও ক্ষণিকা চুপ করে থাকে।

সমীদ নিজের খেয়ালেই বলে চলে : এই সূর্যদেবকেই ধর। ভাল-লাগা দূরে থাক—চাইলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু এখন চেয়ে দেখ সে তেজ নেই, অহঙ্কারের জ্বালা নেই। বাড়িঘর গাছপালার আড়ালে আত্মগোপন করে লজ্জায় মিটমিট করে চাইছেন। আমাদের চোখের দিকে অপলক চেয়ে থাকার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। তুর্দণ্ড প্রতাপ সূর্যদেবের এই পরাজিত করুণ রূপটি আমাকে মুগ্ধ করে। কবিগুরুর একটি লাইনের মানে এতদিন বুঝতে পারিনি, আজ সেটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে—

ক্ষণিকা তন্ময় হয়ে বলে—কোন্ লাইনটা সমীদ ?

—"নিবে আসা দিবসের দগ্ধ রাঙা আলো।"

নিস্তব্ধ জেটিতে তিনজনে চুপ করে বসে থাকে। তাপস ভাবে : স্বল্পবাক শান্ত গম্ভীর সমীদের প্রাণে হঠাৎ কাব্য সমুদ্রের এতখানি উচ্ছ্বাস এল কোথা থেকে ? উৎস কি তার শুধু ঐ 'দগ্ধ রাঙা আলো', না অন্য কিছু ?

ক্ষণিকা ভাবে মূর্তিমান তুটি গদ্য-পদ্যের মাঝে এই রকম যোগসূত্র হয়ে যদি সারাটা জীবন কেটে যায়, মন্দ কি !

কথা বলে না কেউ। সময় কেটে যায়। আসন্নসন্ধ্যার ধোঁয়াটে-রঙের পাতলা আস্তরণ ওড়নার মত ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। না-আলো না-অন্ধকার—শুধু পশ্চিমের আকাশে খানিকটা লালের আভাস তখনও লেগে আছে।

উঠে দাঁড়িয়ে খপ্ করে ক্ষণিকার হাত তু'টো ধরে সামনা-সামনি

দাঁড় করিয়ে, কোনও রকম ভূমিকা না করেই সমীদ বলে, ক্ষণিকা, প্রেম, ভালবাসা এ কথাগুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস কর তুমি? প্রথমটা হকচকিয়ে যায় ক্ষণিকা, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে হাল্কা ভাবেই বলে, আজ তোমার হল কি সমীদ? শান্ত সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠলো, ব্যাপার কি?

এতবড় একটা বিস্ময়ের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না তাপস। উত্থানশক্তি রহিত হয়ে নির্বাক বিস্তারিত চোখ মেলে শুধু চেয়েই থাকে।

সমীদ বলে, আমার মাকে দেখনি, বয়েস হয়ে গেলেও এখনও দেখলে বোঝা যায় যৌবনে মা আমার অসামান্যা রূপসী ছিলেন। শুধু রূপই ছিল না মায়ের—বিদ্যা-বুদ্ধি আচার-ব্যবহার সব দিক দিয়েই মা ছিলেন একাধারে আইডিয়াল বাঙালী জায়া-জননী-গৃহিণী। আমার এই মাকে সারাজীবন সইতে হয়েছিল বাবার লাঞ্ছনা গঞ্জনা অবহেলা। জ্ঞান হবার পর থেকে অনেক ভেবেও এর কোনও যুক্তি খুঁজে পেতাম না। অথচ মামারবাড়িতে শুনতাম, মা বাবার লভ-ম্যারেজ হয়েছিল। বাবা বেনারস ইউনিভারসিটিতে পড়তেন। কি একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাবা মাকে দেখে বিয়ে করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। আরও কয়েক বার বিয়ের আগে ওঁদের দেখা হয়েছিল। বিয়ের কথা উঠতেই বড় মামা আপত্তি তুলেছিলেন। মা সেদিন সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে মামাকে বলেছিলেন, ঐ ছেলেকেই বিয়ে করবেন তিনি। বাবার অবস্থা ভাল ছিল না। বি. এ. পাস করে অনেক চেষ্টা করেও ভাল চাকরি না পেয়ে, পাটনায় একটি বন্ধুর সঙ্গে অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ শুরু করে কয়েক বছরের মধ্যেই প্রচুর পয়সা রোজগার করেন। জ্ঞান হবার পর দেখতাম, পয়সাই বাবার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান আরাধ্য। বেশিরভাগ দিন বাড়িও আসতেন না। মদ জুয়া থেকে শুরু করে—সব কটা কদভ্যাসের কাছেই যেন দাসখত লিখে দিয়েছিলেন বাবা।

মন আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। আমার লক্ষ্মীরূপিণী মাকে একবার ভালবেসে কেউ যে বিপথে যেতে পারে, এ-কথা মন মানতে চাইত না। ভাবতাম, ভালবাসা বলে সত্যি কিছু নেই—ওটা যৌবনের ক্ষণিক বিলাস বিভ্রম। মেয়েদের সান্নিধ্য যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতাম। কিন্তু আপনার মা বাবাকে দেখে, আর আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার পর মনে হচ্ছে আমার বিশ্বাসের মধ্যে কোথাও যেন একটা মস্ত বড় ফাঁক রয়ে গেছে।

পরিপূর্ণ গঙ্গায় ভাটার টান শুরু হয়ে গেলেও সমীদের বাঁধ-ভাঙা নদীতে প্রথম জোয়ার। আস্তে আস্তে হাত তু'খানা ছাড়িয়ে নিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে ক্ষণিকা বলে, চলো ফেরা যাক রাত হয়ে গেছে।

নিঃশব্দে তিনজনে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। রাস্তা পার হয়ে পুব-মুখে হাঁটতে গিয়ে, সামনে একখানা খালি ট্যাক্সি পেয়ে তিনজনেই নিঃশব্দে উঠে বসে। ক্ষণিকা বলে, ল্যান্সডাউন রোড।

লনের মধ্যেকার লাল কাঁকর বিছানো পথটায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন চক্রবর্তী সাহেব। ট্যাক্সি থামতেই সামনে এসে দাঁড়ালেন। ব্যস্তভাবে ক্ষণিকা বলল, কি হয়েছে বাবা?

—ব্যস্ত হবার কিছু হয়নি কণা-মা, বিকেলে দেশ থেকে তোমার কাকা কাকিমা তাঁদের ছেলেপিলে নিয়ে এসে হাজির। সামনে চূড়ামণি যোগ, ডুব দিয়ে পুণ্যসঞ্চয় করে দিনকতক থেকে যাবেন।

বাড়িতে এমন কেউ নেই যে আদর অভ্যর্থনা করে, তাই তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম।

সমীদ ও তাপসের দিকে চেয়ে নীরবে শুধু হাত তুলে বিদায় নিয়ে ক্ষণিকা ভেতরে চলে যায়।

চক্রবর্তী সাহেব বলেন, তোমরা নামবে না?

তাপস বলে, আজ থাক, আর একদিন আসবো।

ট্যাক্সি ঘুরে চলে ভবানীপুর মুখো। বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াতেই

তাপস দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিল, সমীদ বললে, উঁহুঁ চল্ তোর সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে।

অন্ধকারে গাড়ির ভিতরে ভাল দেখা যায় না, তবুও একবার সমীদের মুখের দিকে চেয়ে আর কোনও প্রতিবাদ না করে হেলান দিয়ে বসলো তাপস।

সমীদ ড্রাইভারকে বললো, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল।

স্মৃতিসৌধের উত্তর দিককার চওড়া আলোকোজ্জ্বল রাস্তায় ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই দু'জনে নেমে পড়ল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাপসের একখানা হাত ধরে এক রকম টানতে টানতে নিয়ে চলল সমীদ উত্তর দিকে অন্ধকার মাঠের মধ্যে। মনে মনে অবাক হলেও মুখে প্রতিবাদ করল না তাপস।

বেশ খানিকটা এসে অন্ধকার মাঠের মধ্যে ঘাসের ওপর ঝুপ করে বসে পড়ল সমীদ। তারপর হাত ধরে টেনে তাপসকে পাশে বসিয়ে কোন রকম ভূমিকা না করেই বললে, আমি ক্ষণিকাকে ভালবেসেছি, আর কয়েক বছর ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তোকে যদি কিছু চিনে থাকি, তাহলে তুইও ভালবেসেছিস ওকে।

দম নেবার জন্যে একটুখানি থামল সমীদ। চারপাশের জনবিরল পথে শুধু অস্পষ্ট ট্রামের আওয়াজ আর মোটরের হর্ন ছাড়া আর কিছুই কানে আসে না।

সমীদ বললে, একটি মেয়েকে দু'জনে ভালবেসে, বৈধভাবে তাকে পাওয়ার নজির সভ্য জগতের ইতিহাসে আছে বলে আমার জানা নেই, কাজেই পরাজয়ের মালা একজনকে পরতেই হবে।

ভয়ে ভয়ে অস্ফুটস্বরে তাপস বললে, কি বলতে চাইছিস তুই?

উর্ধ্বে মেঘশূন্য আকাশের গায়ে জোনাকির মত মিটমিটে তারাগুলোর দিকে চেয়ে সমীদ বললে, দু'জনেই আমরা প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবো ওর সামনে—বরমাল্য যার গলায় পড়ে—

তারপর একটু থেমে আবার বললে, বরমাল্য যদি তোর গলায় পড়ে, ব্যঁথা পাব নিশ্চয়ই, কিন্তু তা সামলে নেবার মত মনের বল আমার আছে। তার জন্যে তোর আমার বন্ধুত্বে ছেদ পড়বে না কোনও দিন। এই কথাটাই আজ বলতে চাইছি তোকে।

চুপচাপ ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ে তাপস। বুকের মধ্যে ঝড় বইছে—বাইরে আসবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বিস্তীর্ণ মাঠে এক ফোঁটা হাওয়া নেই। সমস্ত প্রকৃতি যেন আড়ি পেতে ওদের গোপন কথা শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

সমীদ বললে, মুখ-চোরা লাজুক সমীদকে এ রকম একটা ডেলিকেট সাবজেক্ট নিয়ে এভাবে কথা কইতে দেখে তুই বেশ অবাক হয়ে গেছিস, না? হবারই কথা। জীবনে এর আগে এরকম একটা সঙ্কটময় অবস্থায় আমি কখনো পড়িনি। আজ ক্ষণিকাকে হারালে যে ব্যথা পাব, তোর বন্ধুত্ব হারালেও তার চেয়ে কম ব্যথা পাব না।

জড় পাথরের মত ঐ ভাবে শুয়েই তাপস ধীরে ধীরে বলে, আর যদি বরমাল্য তোর গলাতেই পড়ে? তাহলে তা সামলে নেবার মত মনের জোর আমার আছে কিনা ভেবে দেখেছিস কি? প্রকৃতি আমার স্বভাবতই চঞ্চল, একটুতেই অধৈর্য হয়ে পড়ি। অন্তরে বিষের জ্বালা চেপে রেখে মুখে হাসি নিয়ে বন্ধুত্ব বজায় রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তাও তোর অজানা নেই।—তাহলে?

—তাহলে? সমীদের মনেও ঐ একই প্রশ্ন মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় —তাহলে?

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পথও জনবিরল হয়ে আসে। হঠাৎ জবাব খুঁজে পায় সমীদ। উৎসাহে সোজা হয়ে বসে বলে, ক্ষণিকাদের বাড়ি যেদিন প্রথম গিয়েছিলাম, যাবার আগে আমাকে টণ্ট্ করে কি বলেছিলি মনে আছে?

জবাব না দিয়ে কৌতূহলে উঠে বসে তাপস।

সমীদ বলে যায়ঃ বিংশ শতাব্দীর ভিতের ওপর মনুমেণ্টের মত আকাশচুম্বী অট্টালিকার ছাতে উঠিছিস তুই, আর আমি রয়ে গেছি নিচের তলায়।—মনে পড়ে?

বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে তাপস।

সমীদ—আমার সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব হওয়ার ঘটনাটাও আমি ভুলিনি তাপস। সেদিন অত বড় পরাজয়কে যে ছেলে হাসিমুখে বরণ করে আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলতে পারে, তার মনোবলের অভাব আমি অন্ততঃ বিশ্বাস করি না।

উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে তাপসের দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সমীদ বলে, উঠে দাঁড়া।

বিনা প্রতিবাদে উঠে দাঁড়ায় তাপস।

সমীদের প্রসারিত হাতখানা দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরে তাপস বলে, ইউ আর রাইট! জীবনের সব ক'টা পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে আজ চরম পরীক্ষায় পিছনে পড়ে থাকব?—নো, নেভার।

তাপসকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বুকে চেপে ধরে প্রতিধ্বনির মত সমীদ বলে, নেভার!

॥ ছয় ॥

তাপসকে বাড়িতে নামিয়ে শ্যামবাজারে ফিরতে সেদিন বেশ একটু রাত্তির হয়ে গেল সমীদের। ওপরে উঠে দোর ঠেলতে বা কড়া নাড়তে হল না, সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়েই দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুমিতা।

একটু বিস্মিত হয়েই সমীদ বলল, তুমি?

—কি আর করবো, ভিখনের ইনফ্লুয়েঞ্জা, মাসিমার মঙ্গলবারের উপোস, অগত্যা আমাকেই দারোয়ানি করতে হচ্ছে। আজকাল আপনার ফিরতে এত দেরি হয় কেন সমীদ দা?

জবাব না দিয়ে সটান ঢুকে পড়ে সমীদ নিজের ঘরে। বাইরে আবছা আঁধারে বুঝি বা উত্তরের আশায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সুমিতা, তারপর আস্তে আস্তে শোবার ঘরের দিকে চলে যায়।

গুম হয়ে চেয়ারটায় বসে আজকের বিশ্রী ব্যাপারটা মনে মনে আলোচনা করে সমীদ। চীনের পাঁচিলের মত সুদৃঢ় সংযমের বাঁধ, আজ কি করে এক নিমিষে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল—অনেক রকম যুক্তি দিয়েও তার কোনও উত্তর খুঁজে পায় না সমীদ। ছিঃ ছিঃ, ক্ষণিকা হয়তো এতক্ষণ ওর বালক-সুলভ পাগলামিতে মনে মনে হেসেই খুন হচ্ছে। আর তাপস? তাপসই বা কি মনে করলো—স্বল্পবাক সংযমী সমীদের স্বার্থপরের মত এতখানি নির্লজ্জপনায়। এই কথাই ভাবে সে।

-- খোকা!

চমকে চেয়ে দেখে সমীদ রমা দেবী ঘরের মধ্যে খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। চেয়ার থেকে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে সমীদ বলে, সারাদিন উপোস করে আছ, তুমি এখনও ঘুমোওনি মা?

—না। আস্তে আস্তে সামনের খালি চেয়ারটায় বসে পড়েন রমা দেবী। উপবাস-ক্লিষ্ট জিজ্ঞাসু চোখ তু'টো ছেলের মুখের ওপর নিবদ্ধ রেখে কি যেন একটা তুরূহ প্রশ্নের জবাব খুঁজে বেড়ান।

সে দৃষ্টি সইতে পারে না সমীদ। এক নজর চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জড়সড় হয়ে পরিত্যক্ত চেয়ারটায় ঝুপ করে বসে পড়ে—টেবিলের ওপর থেকে একটা বই টেনে নিয়ে, এলোমেলো পাতা ওলটাতে থাকে।

অদূরে টিপয়-এর ওপর রাতের খাবার ঢাকা। সেই দিকে চেয়ে রমা দেবী বলেন, রাত বারোটা বাজে এখনও খাবার ছুঁসনি, আজকাল ফিরতে তোর প্রায় রাত হয় আর বেশিরভাগ দিনই খাসনে—ব্যাপার কি খোকা?

কথা বলে না—অপরাধীর মত ঘাড় গুঁজে চুপ করে থাকে সমীদ।

রমা দেবীই বলে যানঃ অনেক দিন ধরে কথাটা তোকে বলব বলব মনে করি, কিন্তু তোর ভাবভঙ্গী দেখে বলতে সাহস পাইনে, খোকা!

মায়ের গলায় ব্যথার সুর সহ্য করতে পারে না সমীদ। বলে, কি কথা মা?

—সুমিতার কথা!

একরকম নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় সমীদের, সুমিতার কী কথা?

রমা দেবী ছেলের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ালে টাঙানো সমীদের ছেলে বয়সের ছবিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলতে থাকেন, তখন তুই খুব ছোট, বছর দশ-এগারো বয়েস হবে—সুমিতার জন্ম হল। দিন পনেরো বাদে দেখতে গেলাম। কাঁথায় জড়ানো একরত্তি ফুটফুটে মেয়েটাকে আমার কোলে দিয়ে 'গঙ্গাজল' বললে, এর জন্মের আগে রাতদিন বাবা বিশ্বনাথকে ডেকে কি বলতাম জানো 'গঙ্গাজল'?

বুঝতে পেরেও অজ্ঞতার ভান করে বললাম, কি ভাই ?

—এবার যেন আমার মেয়েই হয়। স্পষ্ট দেখতে পেলাম আনন্দে উত্তেজনায় গঙ্গাজল থরথর করে কাঁপছে। ওর না বলা বাকি কথাগুলোর জবাব সেদিন আমিই দিয়েছিলাম, আজও স্পষ্ট মনে আছে।

বুকের ভেতরটা কি এক অব্যক্ত ব্যথায় টনটন করে ওঠে, চুপ করে থাকে সমীদ।

একটু চুপ করে থেকে রমা দেবী বলেন, বলেছিলাম, আমাদের প্রীতির বাঁধন কোনও দিন যাতে আলগা হয়ে না যায় তাই সমীদের সঙ্গে সুমিতার গাঁঠছড়ার গেরোটা আজ থেকেই বেঁধে দিলাম 'গঙ্গাজল'। সুমিতা নামটা তোর সঙ্গে মিল করে আমিই রেখেছিলাম খোকা।

আর চুপ করে থাকতে পারে না সমীদ, আর্তকণ্ঠে বলে, এতদিন কথাটা কেন তুমি আমাকে বলনি মা ? তুমি কি জাননা, তোমাকে সুখী করতে, তোমার কথা রাখতে, সব কিছুই আমি হাসিমুখে করতে পারি, কিন্তু আজ—

—আজ কি খোকা ? জীবনে কখনও কিছু আমার কাছ থেকে লুকোসনি, আজ কার জন্যে এ লুকোচুরি, আমায় সব খুলে বল বাবা ? সেই ট্যাক্সি করে বাড়ি চিনে যাওয়া থেকে আজ বিকেলের ঘটনা পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে গড়গড় করে বলে যায় সমীদ। ক্ষণিকার মায়ের কথা, তাপসের কথা—সব।

শুনে বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে রমা দেবী বলেন, এই রকম একটা কিছু অনুমান করেছিলাম, কিন্তু এতটা ভাবিনি। দোষ আমারই খোকা। ভেবেছিলাম, একটা অজানা অচেনা মেয়েকে শুধু আদেশের জোরে তোর ঘাড়ে চাপিয়ে না দিয়ে পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনে নেবার সুযোগ করে দিলে, হয়তো ভবিষ্যতে তোদের সত্যিকার মনের মিল হবে, আর হোতোও। শুধু আমার একটু দেরি হয়ে গেছে, নইলে সুমিতার মত মেয়েকে পছন্দর মেলায় কোনদিনই কি [illegible]

দাঁড়াতে হবে না, এ বিশ্বাস আমার এখনও আছে। আমি শুধু ভাবছি 'গঙ্গাজল'কে মুখ দেখাব কি করে!

রমা দেবী চুপ করলেন। ঘরের মধ্যে শুধু একটা থমথমে নিস্তব্ধতা।

মাতা-পুত্রের মাঝখানে এরই মধ্যে যেন একটা বিরাট ব্যবধানের গর্ত হাঁ করে দাঁড়িয়ে গেছে। ইলেক্ট্রিকের কটকটে আলো সহ্য করতে পারে না সমীদ, উঠে সুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে দক্ষিণের জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। পাতলা মেঘে ঢাকা ভোরের আকাশে নিস্তেজ তারাগুলো তখনও জোনাকির মত মিটমিট করছে।

পড়ার ঘরে টেবিলের ওপর সেক্সপিয়রের ওথেলো খুলে বৃথাই মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করে তাপস। ঘরে ঢুকলেন বিমাতা সুনলিনী দেবী। এমনিতে বড় একটা এ ঘরের ছায়াও মাড়ান না, আজ সকালেই এ শুভাগমনের অর্থ খুঁজে পায় না তাপস। মনে মনে বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়লেও কোনও কথা না বলে বইটার ওপর ঝুঁকে পড়ে পড়বার ভান করে।

টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে সশব্দে একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন সুনলিনী দেবী। এলোমেলো ময়লা বিছানাটার দিকে চেয়ে বললেন, ঘরের যা অবস্থা হয়েছে, আঁস্তাকুড়ও হার মেনে যায়, থাকো কি করে এ ঘরে?

উত্তর দিতে গেলে ঝগড়া করতে হয়, বলতে হয়, কোনও দিন কি চোখ মেলে দেখেছেন—ঝি চাকর কি করল না করল?

প্রবৃত্তি হয় না। চুপ করে থাকে তাপস।

সুনলিনী দেবী বলেন, একজামিনের আর দেরি কত?

সংসারের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি ঝগড়াঝাটি এই সব নিয়েই রাতদিন জড়িয়ে থাকতে ভালবাসেন সুনলিনী দেবী, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর

ব্যাপারে মাথা ঘামাতে ভুলেও কেউ দেখেনি কোনোদিন। বেশ একটু বিস্মিত হয়েই তাকায় তাপস মায়ের দিকে, বললে, মাস দেড়েক।

—হুঁ, শরীরটার ওপর একটু যত্ন নাও, শুনতে পাই, শুধু শুনতে পাই কেন দেখতেও পাই, প্রায়ই রাত্রে বাইরে থেকে ছাই-পাঁশ খেয়ে আসো, এসব অনিয়মে কখনও শরীর থাকে?

প্রস্তাবনাই চলেছে, নাটক এখনও শুরু হয়নি। আর কিছু বুঝতে না পারলেও এটা বেশ বুঝতে পারে তাপস।

কথার খেই ধরে একরকম নিজের মনেই বলে যান সুনলিনী দেবী—তাছাড়া এই রাত করে বাড়ি ফেরা, একবার মজ্জাগত হয়ে গেলে আর রক্ষে নেই, দাদা ঠিকই বলেছিলেন—

এবার বেশ একটু ভীত হয়ে পড়ে তাপস। এর মধ্যে দাদার আবির্ভাবের কি গূঢ় কারণ লুকিয়ে থাকতে পারে অনেক ভেবেও কূল পায় না।

একটু চুপ করে থেকে কূলের দিশা সুনলিনী দেবীই দিলেন। বললেন, বি.এ. পাস করার পরই দাদা বলেছিলেন, সু তুই মত কর, তোর বড় ছেলের সঙ্গে ননীর বিয়েটা দিয়ে ফেলি, আজকালকার ছেলে বেশি দেরি করলে পস্তাবি। তা কত্তা একেবারে ধনুক ভাঙা পণ করে বসলেন, এম. এ. পাস না করলে ওর বিয়ের কথা কেউ মুখে এনো না।

এতক্ষণে আকাশ পরিষ্কার হল।

ননীবালা সুনলিনী দেবীর দাদার ছোটশালীর মেয়ে, ছেলেবেলায় মা হারা। বাবা আবার বিয়ে করে নতুন সংসার পেতেছেন। সেই থেকে সুনলিনী দেবীর দাদার কাছেই মানুষ। বয়স ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পড়েছে—মোটামুটি চলনসই চেহারা, ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ে সরস্বতীর পায়ে গড় করে মেসোমশায়ের হেঁসেলের ভার নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। এ বাড়িতেও অনেকবার ননীবালাকে দেখেছে

তাপস, কিন্তু বিয়ে? হাসি পেল তাপসের। উদ্দেশ্যহীনের মত বইটার পাতা উলটে চললো তাপস।

দোর গোড়া থেকে বহুদিনের পুরোনো সরকার হরিরাম ডাকল, খোকাবাবু! সুনলিনী দেবী তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টেনে দিয়ে বেশ একটু জড়সড় হয়ে বসলেন।

তাপস বললে, কিছু বলবেন আমায় হরিদা?

—হ্যাঁ, বাবু একবার আপনাকে ডাকছেন শোবার ঘরে।

বেশ একটু অবাক হয়ে তাপস বললে, বাবা? তাঁর তো গেল হপ্তায় পাটনা যাবার কথা। কবে ফিরলেন?

জবাবটা দিলেন সুনলিনী দেবীঃ বাড়ির কোনও খোঁজখবর তো রাখ না, ওঁর বুক-ধড়ফড়ানিটা আবার বেড়েছে, আজ সাত দিন শুধু শুয়ে আছেন।

লজ্জায় অপমানে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল তাপসের। বাবার এত বড় অসুখ আর সে খবরটা পর্যন্ত নেয়নি? চেয়ারটা সরিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে তেতলার সিঁড়িগুলো একরকম লাফিয়ে পার হয়ে দোতলার বারান্দার শেষ প্রান্তে পশ্চিমের বড় ঘরটায় ঢুকে পড়লো তাপস।

পশ্চিমের জানালার গা ঘেঁষে দামী পালঙের উঁচু গদিটার ওপর দু'তিনটে বালিশে হেলান দিয়ে সর্বাঙ্গে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে চোখ বুজে বসেছিলেন তাপসের বাবা বিনোদবাবু। সারা মুখটায় অনিদ্রা ও ক্লান্তির ছাপ। পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ মেলে চেয়ে তাপসকে দেখে ইশারায় কাছে ডাকলেন বিনোদবাবু। অপরাধীর মত পালঙের এক পাশে বসে পড়ল তাপস। শীর্ণ হাতখানা চাদরের ভিতর থেকে বার করে তাপসের মাথায় বুলোতে বুলোতে বললেন বিনোদবাবু, দু'তিন দিন থেকে খুঁজছি—কখন আসিস, কখন বেরিয়ে যাস জানতেই পারি না।

লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে আসে তাপসের। চেহারায় ও কথা বলার ধরনে মোটেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে এবারের অসুখটা বেশ সিরিয়াস। বাবার শীর্ণ হাতখানা দু'হাতে চেপে ভগ্নকণ্ঠে বলে তাপস, আমি জানতাম তুমি পাটনায় চলে গেছ। এতটা বাড়াবাড়ি হয়েছে জানলে—

কথা শেষ করতে পারে না তাপস—বাবার হাতখানা আরও জোরে চেপে ধরে বুকের মাঝখানে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজে চুপ করে থাকেন বিনোদবাবু। একটু পরে আস্তে আস্তে বলেন, সবই জানি রে, আমার অসুখের খবরটাও তোকে দেওয়ার দরকার মনে করে না এ বাড়ির কেউ, তাও জানি। শোন্, কয়েকটা দরকারি কথা তোকে বলে যাই, আর হয়তো সময় পাব কিনা কে জানে!

বাধা দেয় তাপস। বলে, কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে বাবা, এখন থাক না, পরে এক সময় শুনবো'খন।

মাথা নেড়ে আপত্তি জানান বিনোদবাবু। বলেন, পারের ভরযায় আর থাকতে সাহস হয় না, শোন্—বলে চকিতে ক্লান্ত চোখ দু'টো ঘরের চারদিকে বুলিয়ে নিয়ে বলেন, বাইরে লোকে জানে আমি প্রচুর টাকার মালিক, অন্ততঃ তিন চার লাখ টাকা ব্যাঙ্কে মজুদ আছে। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, ছিল টাকা, কিন্তু—

বুকের ভিতরটা কি রকম করে ওঠে, যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে ইশারায় তাপসকে পাশে ছোট টেবিলটায় রাখা ওষুধের শিশিটা দেখিয়ে দেন বিনোদবাবু।

তাড়াতাড়ি উঠে শিশি থেকে এক দাগ ওষুধ গ্লাসে ঢেলে খাইয়ে দেয় তাপস। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজে একটু জিরিয়ে নেন বিনোদবাবু। কাছে বসে আস্তে আস্তে বুকটায় হাত বুলিয়ে দেয় তাপস।

নিস্তব্ধতা বিরাজ করে ঘরে। ভাল লাগে না তাপসের। আজ স্পষ্ট বুঝতে পারে এই বিরাট সংসারে কতখানি অসহায়, একা তার

বাবা! ! কথা কইবার প্রসঙ্গ খুঁজে পায় না। একবার ভাবে, ক্ষণিকার কথা সব খুলে বলি বাবাকে। লজ্জা এসে বাধা দেয়। সকালে মায়ের কথাগুলো নতুন করে ঘুরে-ফিরে মনের চারপাশে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে তোলে। মরিয়া হয়ে বলে তাপস, আজ সকালে মা বলছিলেন, একজামিনের পরে আপনি নাকি বলেছেন ননীবালার সঙ্গে—

উত্তেজিত ভাবে গায়ের চাদরটা সরিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসে বিনোদবাবু বলেন, না, কখনই তা হতে পারে না। আজ দু'বছর ধরে আমায় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাচ্ছে ভাই বোনে। আসল মতলবটা হল সব টাকা-কড়ি বিষয়-আসয় নিজেদের হাতের মুঠোয় রাখা—বুঝিনে আমি? দ্বিতীয় বার বিয়ে করে যে ভুল করিছি—আমার জীবনের ওপর দিয়েই তার শোধবোধ হয়ে যাক। তোমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগতে দেবো না আমি।

এতখানি উত্তেজিত হতে কোনও দিন দেখেনি বিনোদবাবুকে রীতিমত ভয় পেয়ে তাপস বলে, চুপ কর বাবা—এ সব তুচ্ছ কথা নিয়ে এতটা উত্তেজিত হলে আরও কষ্ট পাবে।

কোনও ফল হল না। তেমনি উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বিনোদ-বাবু বলে চললেন: শোন, আমার রায় স্ট্রাটের দোতলা বাড়িটা আর ব্যাঙ্কে ফিকস্‌ড ডিপোজিট ত্রিশ হাজার টাকা, তাছাড়া তোমার মায়ের গহনা,—সেও প্রায় হাজার দশেক টাকা হবে—ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট ভল্টে আছে। এইগুলো তোর নামে উইল করে দিয়েছি।

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে ক্লান্তি ও অবসাদে হাঁপাতে লাগলেন বিনোদবাবু। তাপস তাড়াতাড়ি ধরে বিছানায় শুইয়ে চাদরটা দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল। একটু চুপ করে ধাক্কাটা সামলে নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বললেন বিনোদবাবু—এই বসত-বাড়ি, চেতলার এক বিঘের ওপর বস্তিটা আর আমার লাইফ ইনসিওরের পঞ্চাশ হাজার

টাকা দিয়েছি তোমার মাকে। আরও বেশি কিছু তোমাকে দিয়ে যেতে পারতাম—কিন্তু আমি যে খাল কেটে কুমীর এনেছি। তোমার মায়ের তাগাদায় অস্থির হয়ে কাঠের ব্যবসা করতে তাঁর গুণধর ভাইকে প্রায় দেড়লাখ টাকা দিয়েছি।

তাপস বললে, ওসব ভেবে মিছে মনটাকে অস্থির করো না তুমি। আমায় নগদ না দিলেও ক্ষতি হত না বাবা। এম.এ-টা পাস করে একটা প্রফেসারি করলেও আমার চলে যাবে। মৃদু হেসে বিনোদবাবু বললেন, আজকার পৃথিবীতে টাকাটাই সব, শুধু বিদ্যের ঝুলি ঘাড়ে নিয়ে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ালে কেউ ফিরেও চাইবে না ; কথাটা পরে বুঝতে পারবে। হ্যাঁ শোন, রায় স্ট্রীটের ভাড়াটেদের সঙ্গে আজ দু'বছর ধরে মামলা করে অনেক কষ্টে বাড়ি মেরামত করব বলে উঠিয়েছি। টুকটাক কাজ শেষ হতে এখনও মাসখানেক লাগবে। আমার অবর্তমানে একদিনও এ বাড়িতে থেকো না—থাকতে পারবেও না। রায় স্ট্রীটের বাড়িটা নিচের তলাটা ভাড়া দিয়ে ওপরটায় তুমি থাকবে। আর বিয়ে ? ও বংশের মেয়ে কখনও ঘরে এনো না। সারা জীবন যাকে নিয়ে কাটাতে হবে, নিজে দেখে-শুনে তাকে বিয়ে করবে।

বাস্তব জীবনে দু'একটা নাটকীয় মুহূর্ত এমন অপ্রত্যাশিতভাবে গজিয়ে ওঠে, যা সত্যিকার নাটকেও অনেক সময় দেখা যায় না। ঠিক এমনি একটি দুর্লভ মুহূর্তের প্যারাসুট বেয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়লেন সুনলিনী দেবী। ক্রোধে বিস্ফারিত আরক্তিম চোখ দুটো দিয়ে পিতা পুত্রের ওপর অগ্নিবর্ষণ করে শুরু করলেন, এ সবই আমার জানা—এর মধ্যে নতুন কিছুই নেই, শুধু উইলের কথাটা ছাড়া। তা উইল তাহলে হয়ে গেছে! যাক বাঁচা গেল। দাদা ঠিকই বলেছিল, সু, সতীনের ছেলের ওপর তোকে দিচ্ছি—একটু সাবধানে থাকিস, হয়তো ঐ একদিন কালসাপ হয়ে তোকে ছোবলাবে! আর এক মিনিটও এ শত্রুপুরীতে আমি থাকবো না—এখনই দাদার কাছে চলে যাব।

যেমন আকস্মিক নাটকীয় প্রবেশ—তেমনি অন্তর্ধান।

চোখ মুখ সারা দেহ আবার উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে বিনোদ-বাবুর। উঠে বসবার চেষ্টা করেন। জোর করে চেপে ধরে তাপস শুধু বলে, তোমার পায়ে পড়ি বাবা!

আবার নিস্তেজ হয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়েন বিনোদবাবু। দু'ফোঁটা জল চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে আসে। তাপস রুমাল দিয়ে মুছে দেয়। অর্ধ-স্বগতের মত বিনোদবাবু বলেন, আর একটা কথা।

মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাপস বলে, কি বাবা?

—হরিরামকে উইলে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছি। ওর জীবনের ফুরিয়ে আসা বাকি দিনগুলো সহজে কাটবে বলে। আমি মারা গেলে এ বাড়িতে ওরও থাকা মুশকিল হবে। পারো তো তোমার সঙ্গে ওকেও নিয়ে যেও।

—তাই হবে বাবা! আর কথা বলতে পারে না। অনেক-অনেক দিন বাদে বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে অসহায় অবোধ শিশুর মত নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে তাপস।

নিচে থেকে সুনলিনী দেবীর চেঁচিয়ে কান্নার আওয়াজের সঙ্গে মোটরের হর্ণ ভেসে আসে।

॥ সাত ॥

চক্রবর্তী সাহেব বললেন, হুঁ, সবই তো শুনলাম কণা-মা! কিন্তু এ সব ব্যাপারে বেস্ট্ জাজ হচ্ছেন মেয়েরা, অর্থাৎ মেয়ের মা। মনো-রাজ্যের এই সব জটিল মামলায় বাইরে থেকে রায় দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় নির্দোষই শাস্তি ভোগ করে।

ছেলেবেলা থেকেই বাবার কাছে সব কিছু খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে অভ্যস্ত ক্ষণিকা। লুকিয়ে রাখার মত এমন কোনও ঘটনা আজও ঘটেনি ওর জীবনে, যা বাবার কাছে অকপটে বলতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ এসে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সমীদ আর তাপসের ব্যাপারটাও আজ আর ওদের তিনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল না।

কথা হচ্ছিল ক্ষণিকার পড়বার ঘরে। একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে উঠে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন চক্রবর্তী সাহেব। চেয়ারে বসে হাতলের ওপর রাখা হাতের ওপর মাথাটা কাত করে চোখে মুখে রাজ্যের চিন্তা নিয়ে বসেছিল ক্ষণিকা।

ক্ষণিকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কি একটা যেন ভাবলেন চক্রবর্তী সাহেব। তারপর জেরার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা কণা-মা, তাপস সমীদ এরা দু'জনে একসঙ্গেই তোমার পাণি-প্রার্থনা করেছে, না আলাদা আলাদা?

সোজা হয়ে বসল ক্ষণিকা, বিষণ্ণ মুখে ম্লান হাসির একটা আভাসও যেন দেখা গেল। বললে, আলাদা আলাদা। সমীদকে তো জান বাবা। ও একটু কবিভাবাপন্ন, ভাবুক প্রকৃতির ছেলে। গত রবিবার দিন বাবার অসুখের জন্যে তাপস আসতে পারেনি, সন্ধ্যে বেলা এই ঘরটায় বসে আছি আমি আর সমীদ। আসন্ন পরীক্ষার কথা নিয়েই আলোচনা চলছিলো, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে দেখে উঠে

আলোর সুইচটা টিপতে যাবো হঠাৎ হাতটা ধরে বাধা দিল সমীদ। বললে, ক্ষণিকা কটকটে আলোতে প্রেম নিবেদন করতে আমার রুচিতে বাধে—সে দিক দিয়ে অন্ধকার থ্রাইস ওয়েলকাম। চুপচাপ আবার বসে পড়লাম। হাতটা সমীদের হাতের মধ্যেই রইল। বললে, সেদিন আউটরাম ঘাটে উচ্ছ্বাসের যে প্রাবল্য দেখেছিলে, সে প্রাবল্য আজ খানিকটা নিবে গেলেও, উচ্ছ্বাসটা মনের গহনে ঝড়ের মত তোলপাড় করছে। সেদিন শুধু ভূমিকায় যে আভাসটুকু দিতে চেয়েছিলাম—আজ সেটা স্পষ্ট সোজা করে বলতে চাই। কবির ভাষাতেই বলি—

আজকে আমি রিক্ত হলাম
তোমায় সঁপে সবখানি।
হৃদয় বাঁশির ফুটোর ফাঁকে
ফুরিয়ে ফুঁকে সব গানই ॥

কী জবাব দেব। চুপ করে রইলাম। সমীদ বললে, চট করে কিছু স্থির করা তোমার পক্ষে কষ্টকর তা জানি। প্রার্থী আমরা দু'জন, নিজের কথা বাদ দিয়ে তাপসের সম্বন্ধে এটুকু তোমায় জোর করে বলতে পারি, তার ভালবাসাতেও খাদ নেই। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে তোমাকে বলা দরকার, তোমাকে না পাওয়ার ব্যথা যত বড় হয়েই বুকে বাজুক না কেন, তা হাসি মুখে সহ্য করে আমাদের বন্ধুত্বের বাঁধন অটুট রাখতে পারবো, এ আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংও হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে।

চক্রবর্তী সাহেব বললেন, আর তাপস?

—কাল দুপুরে হঠাৎ এসে হাজির। রুক্ষ চুল—একমুখ দাড়ি গোঁপ—রাত জেগে চোখে কালি পড়ে গেছে। এসেই কোনও রকম ভূমিকা না করেই বললে, আমার বাবার খুব অসুখ, এবার বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। মা রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। রাত দিন

'বাবার কাছেই থাকতে হয়। এখন একটু ঘুমুচ্ছেন দেখে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম। আর কবে আসতে পারবো কে জানে।. তাই—

বললাম—-আমায় কিছু বলবে তাপস ?

কথা না বলে মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল তাপস, দু'তিন মিনিট। হঠাৎ মুখ তুলে এক নিঃশ্বাসে বলে গেল: আমি তোমায় ভালবাসি ক্ষণিকা, আমায় যদি গ্রহণযোগ্য মনে হয় তোমার, ধন্য হয়ে যাব—আমার এই ছন্নছাড়া অশান্ত জীবনে আবার হয়তো নতুন করে প্রভাত সূর্যের উদয় হবে। আচ্ছা আমি চলি।

জানলার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলেন চক্রবর্তী সাহেব। একজন প্রবীণ জজের মৃত্যু উপলক্ষে হাইকোর্ট বন্ধ। সে দিক দিয়ে কোনও তাড়া নেই। চিন্তিতভাবে ক্ষণিকার সামনের চেয়ারটায় বসে বললেন, আমি বুঝতে পারছি কণা-মা, তোমার ডিফিকাল্টিটা কোথায় ? কিন্তু আকাশ-পাতাল ভেবেও এর কোন সহজ মীমাংসার পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

ক্ষণিকা বলে, স্বভাব ওদের পরস্পরবিরোধী, আবার মিলও এত বেশী, যে এক এক সময় ভেবেও অবাক হয়ে যাই। মনে হয় দূর হোক ছাই, বিয়েই করবো না ; একটা জীবন আমরা বন্ধু হয়েই কাটিয়ে দেব। ওদের দু'জনকে আলাদা করে আমি ভাবতেই পারিনে বাবা।

চক্রবর্তী সাহেব—কিন্তু তাতো হবার নয় মা। পৌরাণিক যুগে একটা মস্ত সুবিধা ছিল। মনস্তত্ত্বের এই সব জটিল সমস্যায় আইন আদালত বা মানুষের দরবারে ধন্না দেবার দরকার হোতো না। সোজা চলে যাও পাহাড়ের দুর্গম গুহায় নয়তো গহন বনে। ইয়া জটাজুট-ধারী মুনি ঋষির দল বসে আছে। ভক্তি ভরে প্রণাম করে সোজা তোমার বক্তব্য পেশ করে দাও—ব্যস, আর দেখতে হবে না—চোথ

বুজে' কিছুক্ষণ ধ্যান করে বিধান দিয়ে দেবেন—তু'জনকেই তুমি স্বচ্ছন্দে পতিত্বে বরণ করে মনের সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে পার। কিন্তু এটা বিংশ শতাব্দী ; পুরোদস্তুর মেক বিলিভের যুগ। ভিতরে ছাই পাঁশ যাই থাক না কেন, মলাটটা রাখতে হবে ঝকঝকে তকতকে। শুধু বাইরের খোলসটারই দাম। বড় কঠিন মা, এ যুগে সব দিক বজায় রেখে সামনে এগিয়ে চলা।

বেলা এগারটা বাজে। পিসীমা এসে একবার নাওয়া-খাওয়ার তাগাদা দিয়ে গেছেন। যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকার মাথায় একখানি হাত রেখে বললেন চক্রবর্তী সাহেব, আর বিয়ে না করে জীবন কাটিয়ে দেবার কথাটা বলছিলে একটু আগে কণা-মা! ওটা নেহাত ছেলেমানুষের কথা। আমি চিরকাল বেঁচে থাকবো না। তখন অবস্থাটা একবার কল্পনা করে দেখ তো মা! সুন্দরী শিক্ষিতা অভিভাবকশূন্যা মেয়ে, তার উপর পয়সা কড়ি যদি থাকে! চারদিক থেকে জোঁকের মত ঘিরে ফেলবে তোমায়। তার ভিতর থেকে ভাল-মন্দ বিচার করে পথ চলতে কোনও দিনই পারবে না তুমি। তারপর একদিন দেখবে, দিশেহারা সর্বস্বান্ত হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছ।

ও সব চিন্তা ছেড়ে দাও, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। আজ না হয় তু'দিন বাদে। চলে যেতে গিয়ে দরজার কাছে ফিরে দাঁড়ালেন চক্রবর্তী সাহেব। বললেন, ঠাকুর দেবতায় তোমার বিশ্বাস আছে কণা-মা?

একটু অবাক হয়েই ক্ষণিকা বলে, আছে বাবা!

—লোকে মানত করে ঠাকুরের কাছে ধন্না দেয়, এতে কোনও সুফল হয় বলে মনে হয়?

—হয়। তবে এ সব ব্যাপারে ভক্তি আর বিশ্বাসই বেশি কাজ করে বাবা!

—ঠিক বলেছ মা! তাহলে আমরা মিছে ভেবে মরছি কেন? সোজা পথ তো পড়েই আছে।

দ্বিধা ভরে তাকায় ক্ষণিকা।

চক্রবর্তী সাহেব বলেন, তোমার মা! তাঁর কাছে গিয়ে উপদেশ চাও, পথের দিশা তিনিই তোমায় দেবেন কণা-মা!

খুসীতে ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ক্ষণিকার মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ঠিক বলেছ বাবা! এতক্ষণ কেন যে এই সহজ কথাটা মনে হয়নি, তাই ভাবছি।

ঘরে ঢুকল সুনীল। বললে, তোমার চিঠি দিদি।

পোস্ট আফিসের কোনও ছাপ নেই—চিঠিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে কিছু না বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসু চোখে ক্ষণিকা সুনীলের দিকে তাকাতেই সুনীল বললে, একটা বুড়ো লোক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে চেয়েছিল। বাজার থেকে ফিরে কাছে এসে দাঁড়াতেই তোমার নাম জিজ্ঞাসা করলে, তারপর চিঠিটা আমার হাতে দিল।

খামটা ছিঁড়ে এক নিঃশ্বাসে ছোট্ট চিঠিটা পড়ে বাবার দিকে এগিয়ে দিল ক্ষণিকা। সমীদ লিখছে, ক্ষণিকা! কাল রাত দু'টোর সময় হার্টফেল করে তাপসের বাবা মারা গেছেন। আমি খবর পেলাম আজ সকালে। ওদের পুরোনো কর্মচারী হরিরাম ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। সৎকারের লোকজন ডেকে সব যোগাড় করে শ্মশানে যাচ্ছি। যদি খুব অসুবিধে না হয় কয়েক দিনের জন্যে সুনীলকে এখানে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়। তোমার বাবা কোর্ট থেকে ফিরলে, তাঁকে জিজ্ঞেস করে যা হয় ব্যবস্থা কোরো।

সমীদ—

চক্রবর্তী সাহেব সুনীলকে গাড়ি বার করতে বলে ক্ষণিকাকে বললেন, আমি এখনই একবার কেওড়াতলা শ্মশান থেকে ঘুরে আসছি,

কণা-মা! বিকেলের দিকে তুমি একবার সুনীলকে সঙ্গে করে তাপসের বাড়িতে যেও। অশৌচের ক'দিন সুনীল ওখানে থাকবে।

—শ্মশানে কি আমার যাওয়া দরকার বাবা? ক্ষণিকা বললে।

—না, কণা-মা—তুমি বিকেলে বাড়িতেই যেও।

সুনীল এসে খবর দিল ড্রাইভার গাড়ি বার করে অপেক্ষা করছে। কাপড়চোপড় না বদলেই চক্রবর্তী সাহেব গাড়ি করে বেরিয়ে গেলেন।

শহরের নোংরা আবর্জনা বুকে করে কোনও রকমে নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রেখে ধুকধুকে মিনমিনে গতিতে বয়ে চলেছেন পতিতোদ্ধারিণী আদি বা কালী-গঙ্গা। এপারে কালীঘাট ওপারে চেতলা। এরই পুবের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ভুষুণ্ডী কাকের মত প্রাচীন ও বিখ্যাত কেওড়াতলা শ্মশান। পাঁচিল ঘেরা চত্বরে চিতার আগুন দিনে রাতে সব সময়ই জ্বলে। অনভ্যস্ত নারভাস লোক বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে পারে না, এসে বসে শ্মশান সীমার বাইরে—গঙ্গার ঘাটে, ভাঙা সিঁড়ির ওপর। ঝিরঝিরে হাওয়ায় শরীর মন খানিকটা ঠাণ্ডা হয়। সিঁড়ির উঁচু ধাপে দক্ষিণ দিকের একটা চত্বরে হেলান দিয়ে চুপচাপ পাশাপাশি বসেছিল সমীদ ও তাপস। মুখাগ্নি করে চিতায় আগুন দেবার পর পাড়ার ব্যায়াম সমিতির পাণ্ডা, ওস্তাদ পুড়িয়ে বীরু তাপসের অবস্থা দেখে সমীদকে বলে, মিছি মিছি এখন এখানে থেকে কষ্ট ভোগ করে লাভ নেই, আপনি তাপসদা'কে নিয়ে বরং গঙ্গার ঘাটে হাওয়ায় বসুন। যা করবার আমরাই করবো। তাপস-দা'কে আর একবার দরকার হবে শেষের দিকে—গঙ্গাজল ঢেলে চিতার আগুন নিবিয়ে দেবার সময়।

এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে এত সহজে নিষ্কৃতি পেয়ে দু'জনেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল গঙ্গার ঘাটে এসে। তিন-চারটে ধাপ নিচে, উত্তর

দিকে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে বসে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করছিল বৃদ্ধ হরিরাম ঘোষ। মৃত প্রভুর উদ্দেশে প্রভুভক্ত ভৃত্যের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অদূরে উত্তর দিকে একটা ছায়াঘন গাছের তলায় মাটিতে সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল পুঁতে সর্বাঙ্গে ছাই মেখে, জটা ও দাঁড়ি গোঁপের আড়ালে আত্মগোপন করে, চোখ বুজে গাঁজা খাচ্ছিল এক আধা বয়সী সন্ন্যাসী। চার দিকে উবু হয়ে বসে, রুক্ষ চুল হাড়-ডিগডিগে চার-পাঁচটি লোক কলকেটির ওপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে প্রসাদের আশায় চুপ করে বসে আছে।

চক্রবর্তী সাহেব দাঁড়িয়ে চারদিক চোখ বুলিয়ে চুপচাপ এসে বসে পড়লেন তাপস ও সমীদের পাশে। সাড়া পেয়ে দু'জনেই সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। হাত ইশারায় প্রতিনিবৃত্ত করে চক্রবর্তী সাহেব বললেন, এই একটা জায়গা যেখানে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমাদের তথাকথিত সমাজের রুটীন-বাঁধা নিয়মকানুন ও কনভেন-সনের গণ্ডীর বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়—বোসো তোমরা।

বসে জিজ্ঞাসা করে সমীদ, কোর্ট থেকে কি করে—

বাধা দিয়ে চক্রবর্তী সাহেব বলেন, আজ কোর্টের ছুটি, তোমার চিঠি পেয়ে তাই তো এত শীগগির চলে আসতে পারলাম।

চারদিক নিস্তব্ধ খাঁখাঁ করছে। শুধু গঙ্গার অপর পারের বস্তি থেকে একটা ঘেয়ো কুকুর বেরিয়ে, তীর বেগে চড়ার ওপর দিয়ে হেঁটে এ পারে এসে আর দুটো কুকুরের সঙ্গে ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

চক্রবর্তী সাহেব বললেন, আর কোনও দিন শ্মশানে এসেছ তোমরা?

তাপস সমীদ মাথা নেড়ে জানায়—না।

চক্রবর্তী সাহেব বলেন, আমি এসেছি। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে প্রায়ই সময় পেলে চলে আসি; তবে কণা-মাকে লুকিয়ে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করেন তিনি ঃ উচ্চশিক্ষার অহঙ্কারে দেশ-বিদেশ ঘুরে এসে ভাবতাম— মজ্জাগত কুসংস্কারগুলোর হাত থেকে এবার বোধ হয় রেহাই পেলাম, কিন্তু প্রথম ধাক্কা খেলাম এইখানেই। আমার স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধ ছিল, যেন এই কেওড়াতলাতেই তাঁর সৎকার করা হয়। আগুন দেবার আগে প্রাথমিক কাজগুলো শেষ করে এইখানে এসেই বসেছিলাম, ঠিক তোমরা যেখানটিতে বসেছ। তফাত ছিল শুধু—দিন আর রাতের। রাত বোধ হয় এগারটা হবে, চুপ করে এইখানে বসে আছি, মৌন শান্ত প্রকৃতি, অদ্ভুত ভাল লাগছিল আমার। ভাবছিলাম, দু'দিনের এই হাসি-গান-কোলাহল হঠাৎ এখানে এসে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু সবই কি নিঃশেষে মুছে শেষ হয়ে যায়? না কিছু তার অবশিষ্ট থাকে? যুক্তি আর শিক্ষার দাপটে মন ভয় পেয়ে মাথা তুলতে পারে না, জবাব খুঁজে পাই না। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করি। হঠাৎ যেন শুনতে পাই মহাশূন্য থেকে এক অস্পষ্ট বাণী ঃ আছে আছে আছে।

কি আশ্চর্য এই আছে শোনবার জন্যই মন আমার উন্মুখ ব্যাকুল হয়ে বসেছিল। কি এক অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে, যেন বেঁচে যাই। সংস্কারের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী হয়ে আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

প্রকাণ্ড একটা মাটির কলসী হাতে বীরুর একটি সাকরেদ এসে বলে, তাপসদা আমাদের কাজ শেষ। এইবার চিতায় জল ঢেলে চলে যাবার পালা। আমি জল তুলে আনছি প্রথম তিন কলসী তোমাকেই ঢালতে হবে বীরুদা বললে।

বেলা প্রায় চারটে। তিনজনে উঠে শ্মশানে চিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অতবড় মানুষটার কিছুই অবশিষ্ট নেই—শুধু কতকগুলো ছাই আর তার নিচে খানিকটা নিস্তেজ আগুন।

চক্রবর্তী সাহেব গাড়ি করে শ্মশান থেকে বাড়ি চলে গেলেন। আর সবাই চানটান সেরে তাপসকে শোক বেশ পরিয়ে যখন হেঁটে বাড়ি পৌঁছল, তখন সন্ধ্যে হয় হয়।

তাপস ও সমীদ সবিস্ময়ে দেখল, বাড়িতে যেন দুর্গোৎসবের ধুম লেগে গেছে। চারদিকে লোকজনের চেঁচামেচি হট্টগোল। ব্যাপার কি? কাছে এসে দেখে সুনলিনী দেবীর তিন ভাই সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাপসের বৈমাত্র ভাই দু'টি কাছা গলায় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মহা উৎসাহে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

তাপস ও সমীদ পাশ কাটিয়ে কোন রকমে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে। সুনলিনী দেবীর পেয়ারের ঝি রামুর মা বালতি করে সারা বাড়ি গোবরজল ছিটোয়। ভিতর থেকে অনেক-গুলি নারীকণ্ঠে মড়াকান্না শুরু হয়ে যায়। বোঝা যায় সুনলিনী দেবী এবার একা আসেননি—তিন ভাইয়ের সমস্ত পরিবার এসে জড়ো হয়েছে বাড়িতে।

তাপসের ঘরের সামনে বারান্দায় একখানা চেয়ারে ভয়ে বিবর্ণ মুখে বসে আছে সুনীল। দরজা ভেজান ছিল—সমীদ এগিয়ে দরজা খুলে বিস্ময়ে থ হয়ে গেল। কি যেন এক যাদুমন্ত্রে সমস্ত ঘরটার চেহারাই পালটে গেছে। বহুদিনের অপরিষ্কার এলোমেলো অগোছাল ঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে খুসীতে ঝলমল করছে। ঘরের মাঝখানে পড়ার টেবিলটা সরিয়ে মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে বিছানা পাতা। একপাশে হাতখানেক উঁচু একটা বুক কেসে এম.এ-র পাঠ্য ইংরেজী বইগুলো যত্ন করে সাজান। ঘরের পশ্চিম কোণে একটা স্টোভ, পাশে একটা মাটির মালসা—তার মধ্যে হবিষ্যের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ।

নিচে থেকে সবার কণ্ঠ ছাপিয়ে সুনলিনী দেবীর কান্নার খোলস-ঢাকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এল। খাদে শুরু হয়ে সপ্তমে উঠে কণ্ঠ সেইখান থেকেই বিস্তার শুরু করল। সব কথা স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও এটুকু

বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে, আসন্ন পতি-বিয়োগে দুঃখ-শোকের চেয়ে অনুযোগ ও আক্রোশটাই তাঁর বেশি। যথা: তুমি তো মরে গেলে না—আমাকে একেবারে মেরে গেলে। দুধ-কলা দিয়ে যে কাল সাপ পুষেছিলাম, আজ তারই বিষের জ্বালায় জ্বলে মরছি—একবার দেখে যাও গো। তোমার দেহ চিতায় তোলবার আগেই বাড়িতে ম্লেচ্ছপনা শুরু হয়ে গেছে। হিঁদুর ঘরের বিধবা হয়ে আমি কি করে এ বাড়িতে অন্নজল মুখে তুলবো বলে যাও গো—ও-ও-ও!

কিছুই বুঝতে না পেরে তাপস ও সমীদ পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। ভয়ে পাংশু মুখে এক পা দু'পা করে এগিয়ে আসে সুনীল। খুব কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, দুপুর বেলা দিদি এসে তাপসদা'র ঘর গুছিয়ে দিয়ে গেছে, তাই।

॥ আট ॥

রমা দেবী বললেন, তুই একবার চেষ্টা করে দেখ বাবা! হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে না থেকে তুই নিজে একবার যা।

ম্লান হেসে সমীদ বলে, ফল কিছু হবে না মা। হয়তো উলটে কতকগুলো দেনা দেখিয়ে দেবে। তুমি ব্যথা পাবে বলে বলিনি এতদিন, মিথ্যা আর জোচ্চুরির ওপর ব্যবসা শুরু করেছিলেন বাবা। সঙ্গে যাকে পার্টনার নিয়েছিলেন সেই মহাবীরপ্রসাদ একটা জ্যান্ত শয়তান। প্রলোভন আর নেশায় বাবাকে রাতদিন ডুবিয়ে রেখে তলে তলে সব গ্রাস করবার মতলব করেছিল। বাবা হঠাৎ মারা না গেলে শেষ পর্যন্ত কি হত বলা যায় না, কিন্তু বাবার আকস্মিক মৃত্যুটা আশীর্বাদের মত কাজে লাগালো মহাবীরপ্রসাদ। কলকাতায় চলে আসবার আগে দু'তিন দিন গিয়েছিলাম ওদের আপিসে হিসেবপত্তর দেখতে। দেখব কি, কাগজে কলমে সব ঠিক করে রেখেছে; আমাকে পরিষ্কার দেখিয়ে দিলে—মরবার কয়েক বছর আগে থেকে বাবা প্রচুর টাকা নিয়েছেন ফার্ম থেকে। প্রমাণ দেখতে চাইলাম—বাবার হাতের সই করা এক গাদা রসিদ ছুড়ে ফেলে দিলে, আর শুনিয়ে দিলে হিসেবপত্তর এখনও শেষ হয়নি, হলে হয়তো তারই উলটে পাওনা হবে আমাদের কাছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রমা দেবী বললেন, এসব কথা এতদিন আমায় বলিসনি তো খোকা!

—বললে লাভ কিছুই হত না, শুধু তোমার দুঃখের বোঝাটা আরও ভারী হয়ে উঠতো। একটুখানি চুপ করে থেকে প্রসঙ্গটা হাল্কা করবার জন্যে সমীদ বলে, কেন মিছে টাকার কথা ভেবে মন খারাপ করছ মা?—বেশ আছি। বাবার লাইফ ইনসিওরের পঁচিশ হাজার টাকা

ব্যাঙ্কে মজুত, কয়েক মাস পরে একটা মাস্টারি জুটিয়ে নেব। ব্যস্, কোনও চিন্তা নেই। তোফা নির্ভাবনায় খাও-দাও আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোও।

রমা দেবী—তোর একজামিনের কত দেরি রে খোকা!

—এই তো এসে পড়ল, আর দিন পনেরো বাদেই। কেন বলতো মা?

—তাপসকে অনেক দিন দেখতে পাই না তাই।

—কি করে পাবে, ওর বাবার শেষ কাজ যা করে শেষ করা হয়েছে ও বাড়িতে—সে এক মহামারী ব্যাপার। তারপর বাড়ি ছেড়ে রায় স্ট্রীটের নতুন বাড়িতে আসা সেও এক দক্ষযজ্ঞর পর্ব। শেষ কালে গোঁ ধরে বসল পরীক্ষা দেবে না। কিছুতেই রাজি করাতে পারি না, শেষকালে অনেক বলে-কয়ে যদিই বা রাজি করান গেল, কিন্তু আর এক নতুন উপসর্গ সৃষ্টি হল।

—কি?

—দিন চার-পাঁচ বাদে গেলাম একদিন রায় স্ট্রীটের বাড়িতে। ভাবলাম পড়াশুনায় একেবারে ডুবে আছে তাই এতদিন কোনও খবরই পাইনি। বাইরে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে ওদের বহুদিনের পুরোনো কর্মচারী হরিরাম। বললাম, কি হরিদা, বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছ বুঝি, যাতে কেউ ঢুকে তোমার খোকাবাবুর পড়ার ব্যাঘাত না ঘটায়? বৃদ্ধ হরিরাম প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি! বলল, না দাদাবাবু, রোজ ভোরে উঠে খোকাবাবু বেরিয়ে যায়, কোনো কোনো দিন বেলা দুটো-আড়াইটের সময় ফিরে দুটো নাকে মুখে গুঁজে আবার বেরিয়ে যায়—ফেরে রাত বারটা-একটায়। খোকাবাবুর রকম-সকম আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না বাবু।

বললাম, তুমি মিছে ভেবে মরছ হরিদা, ফাঁকা বাড়িতে মন টেকে না তাই—

—ব্যারিস্টার সাহেবের ওখানেও যায় না খোকাবাবু। ওঁরাও সব শুনে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আমিও বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। ক্ষণিকাদের ওখানে যায় না, তবে যায় কোথায় ?

বললাম, তুমি ভেব না হরিদা, যা হয় ব্যবস্থা আমি করছি।

সোজা চলে গেলাম ল্যান্সডাউন রোডে। বাইরের ঘরে একঘর মক্কেল নিয়ে বসে আছেন চক্রবর্তী সাহেব। আমায় দেখেই বললেন, উপরে যাও সমীদ, ক্ষণিকা পড়ার ঘরেই আছে।

ক্ষণিকার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেও তাপসের এই হঠাৎ সংসার-বৈরাগ্যের কারণ খুঁজে পেলাম না। ঠিক হল, ক্ষণিকার চিঠি নিয়ে সুনীল রাত্রিতে রায় স্ট্রীটের বাড়িতে অপেক্ষা করবে। যত রাতেই ফিরুক চিঠি ওর হাতে দিয়ে তবে সুনীল আসবে।

ক্ষণিকা লিখে দিল ঃ তাপস, বিশেষ দরকার কাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবো, আমি না যাওয়া পর্যন্ত বাড়ি থেকে বেরিও না।

পরদিন সকালে তাপসের ওখানে গিয়ে দেখি, আমার আগেই ক্ষণিকা এসে বসে আছে। তাপসকে দেখলাম, এই ক'দিনে এরকম অদ্ভুত পরিবর্তন বড় একটা দেখা যায় না। বললাম, তোর মতলবটা কি বলবি ?

তাপস বললে, বাড়িতে ভাল লাগে না তাই ঘুরে বেড়াই। সন্ধ্যে-বেলায় গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকি। ক্ষণিকা বললে, আর ক'দিন বাদে পরীক্ষা, বইটা খুলে বসলেও তো সময় কেটে যায়।

ম্লান হেসে তাপস বললে, একটা অনুরোধ আজ তোমাদের করবো—তোমাদের কথায় পরীক্ষা দিতে রাজি হয়েছি, কিন্তু পড়বার অনুরোধ আমায় কোরো না। না-পড়েও মোটামুটি পাস করতে পারবো এ বিশ্বাস আমার আছে। রাতদিন পড়ে ফার্স্ট সেকেণ্ড হওয়ার মোহ আমার কেটে গেছে।

তর্ক করা বৃথা, শরীরের ওপর যত্ন নেবার জন্য বিশেষ করে বলে আমি আর ক্ষণিকা চলে এলাম।

রমা দেবী—আহা বেচারা! সংসারে ওর আজ আপন বলতে কেউ রইল না। একটু ইতস্ততঃ করে রমা দেবী বললেন, ক্ষণিকা কি স্থির করলে রে খোকা?

সমীদ কি একটা বলতে যাচ্ছিল, দরজার বাইরে খট্ করে একটা আওয়াজ হতেই দু'জনে ফিরে চাইল। বাইরে দরজার চৌকাঠ ধরে নতমুখে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে সুমিতা।

রমা দেবী বললেন, ওকি, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন মা! ভেতরে আয়।

আস্তে আস্তে ভিতরে এসে প্রথমে রমা দেবীকে পরে সমীদকে প্রণাম করলো সুমিতা, তারপর মুখ নিচু করে সমীদের পড়ার টেবিলটা ধরে দাঁড়াল।

সমীদ ও রমা দেবী দু'জনেই বেশ একটু বিস্মিত হলেন। আদর করে কাছে টেনে নিয়ে রমা দেবী বললেন, আমায় কিছু বলবি মা?

সুমিতা—আমি বেথুন হোস্টেলে থাকবার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি মাসীমা। ভিখনকে একটু সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি জিনিসপত্তর-গুলো ট্যাক্সি থেকে তুলে দেবার জন্যে।

বাধা দেবার ক্ষমতা নেই, কেন চলে যাচ্ছিস জিজ্ঞাসা করবার অধিকারও নেই। অপরাধীর মত অসহায় দৃষ্টিটা বাইরে মেলে চুপ করে থাকেন রমা দেবী। সমীদের অবস্থা আরও শোচনীয়—মনে হয় সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওর প্রচ্ছন্ন অপরাধ। নত মুখে চুপ করে বসে থাকলেও অসোয়াস্তিতে অন্তরটা ছটফট করতে থাকে। দেবতার অযাচিত আশীর্বাদের মত ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলো তাপস। তিন জনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

সুমিতা বললে, ক'দিনের মধ্যে তাপসদার এ কি চেহারা হয়েছে!

তাপস বললে, চেহারা জিনিসটা কি জান সুমিতা, আবহাওয়ার মত পরিবর্তনশীল।

রমা দেবী বললেন, ওসব তত্ত্ব আলোচনা এখন থাক—ছেলের মুখ দেখেই বুঝেছি সারাদিন খাওয়া হয়নি। আমি চললাম চট করে খানকতক লুচি ভেজে আনি, আয় তো সুমি। উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে পরক্ষণেই বিবর্ণ মুখে সুমিতার দিকে চেয়ে বললেন, থাক, তোকে আসতে হবে না ; আমি একাই পারবো।

ভিখন দরজার বাইরে থেকে বললে, দিদিমণি, ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি।

ছোট্ট ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে তার ভিতর থেকে একটা টাকা বার করে ভিখনের দিকে ছুড়ে দিয়ে সুমিতা বললে, আজ আমার যাওয়া হবে না ভিখন—তুমি ওকে বিদায় করে দাও। তারপর রমা দেবীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে,— তুমি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ মাসীমা, চলো। রমা দেবীকে এক রকম টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুমিতা।

কিছু বুঝতে না পেরে তাপস তাকায় সমীদের দিকে। একটু ইতস্ততঃ করে সমীদ বলে, এখানে ওর পড়াশুনোর অসুবিধা হচ্ছে তাই বেথুন হোস্টেলে চলে যাচ্ছে। সমীদের কাঁধে হাত দিয়ে বেশ খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে তাপস বলে, তুই আমায় কি ঠাউরেছিস বলতো ? এখানে পড়ার অসুবিধে হচ্ছে বলে হোস্টেলে চলে যাচ্ছে এ কথা তুই আমায় বিশ্বাস করতে বলিস ? সত্যি ব্যাপার কি বলতো ?

দ্বিধা সঙ্কোচ এসে পথ আড়াল করে দাঁড়ায়। তবুও বলে যায় সমীদ সুমিতার ইতিহাস,—গঙ্গাজলকে মায়ের কথা দেওয়া, সুমিতাকে এখানে আনার উদ্দেশ্য, সব শেষে সমীদের অক্ষমতায় মায়ের দুঃখ ; সব —সব ধীরে ধীরে বলে যায় সমীদ।

সব শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল তাপস। তারপর উঠে পায়চারি করতে করতে বললে, এ কথাও ধ্রুবসত্য যে ক্ষণিকাকে না

দেখলে সুমিতার মত মেয়েকে বধূরূপে পাওয়া যে কোনও ছেলের পক্ষে ভাগ্যের কথা। তোর জন্যে খালি দুঃখই হচ্ছে, সেটা লাঘব করবার কোনও উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না।

ঘরের আবহাওয়া থমথমে ভারী হয়ে ওঠে। সমীদ বলে, তারপর, তুই হঠাৎ কি মনে করে উদয় হলি ?

জানালার কাছ থেকে উত্তেজিত ভাবে ফিরে এসে চেয়ারে বসে তাপস বলে, তোর কাছে অ্যাডভাইস নিতে এলাম, একটা লোককে খুন করবো না হাত পা ভেঙে চিরদিনের মত পঙ্গু করে দেব ? কোনটায় বেশি জব্দ হবে ?

ভয় পাবার কথা, কিন্তু হেসে ফেলে সমীদ বলে, কে লোকটা ? কি করেছে এ সব না জেনে তোকে কী অ্যাডভাইস দেব বলতে পারিস ?

—তুই চিনিস তাকে, রায়বাহাদুর এইচ. কে. বোসের একমাত্র বংশ-দুলাল অরুণ। আমাদের সঙ্গে পড়ে।

—বুঝতে পেরেছি। নতুন ক্রাইসলার গাড়ি চড়ে নিত্যি নতুন ঝকঝকে-তকতকে পোশাক পরে ক্লাসে আসে।

—হ্যাঁ, সেই ফপিস ড্যাণ্ডিটা। ও শুধু পোশাক আর ঐশ্বর্যের জেল্লায় চোখ ধাঁধিয়ে মেয়েদের মন জয় করতে চায়। ক্ষণিকার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা দেখে হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরে আর ছুতোয়-নাতায় আমাদের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করে।

—ওর ওপর অবিচার করছিস তাপস। মেয়েদের মন জয় করবার মাত্র দু'টি রাস্তা আছে। এক ভালবেসে আর ঐশ্বর্যের জৌলুষ দেখিয়ে। প্রথম পথটা খুবই শক্ত। কঠোর সাধনা, ধৈর্য ও সময়সাপেক্ষ। খুব কম লোকেই ওপথে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। দ্বিতীয় পথটা অপেক্ষাকৃত সহজ হলেও ভাগ্যদেবতার স্ট্রং ব্যাকিং একান্ত প্রয়োজন। ও যদি সহজ পথটাই বেছে নিয়ে থাকে, দোষ কি ? মাত্র এই অপরাধে যদি তুই খুনখারাপি করতে চাস—আমার ঘোর আপত্তি আছে।

টেবিলটায় জোরে একটা ঘুষি মেরে তাপস বলে, মোটেই না, সবটা না শুনে যা তা একটা রিমার্ক পাস করা তোর একটা বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

সমীদ হেসে বলে, দয়া করে সবটা শোনাও তাহলে!

—বাবার খুড়তুতো বোন, মানে আমার পিসীমা ছেলেবেলা থেকে আমাকে খুব ভালবাসেন ও স্নেহ করেন। বাবার মৃত্যুর পর চিঠি লিখে লোক পাঠিয়ে বহুবার ডেকে পাঠিয়েছেন, যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বিডন স্ট্রীটে পিসীমার বাড়ি। আজ ভাবলাম যাই একবার ঘুরেই আসি। সকালে যেতেই আমাকে জড়িয়ে ধরে, হাঁউ-মাঁউ করে কান্না। কিছুতেই থামাতে পারি না পিসীমাকে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বুঝিয়ে-সুজিয়ে চলে আসব, আসতে দেবেন না। অগত্যা দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার শীগগির আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে নিষ্কৃতি পেলাম। হেদোর ধারে এসে ঘড়ি দেখলাম চারটে বাজে। ভাবলাম এখন বাড়ি গিয়ে কি করবো, তোর চেয়ে তার এম. এ. পরীক্ষার কঠোর সাধনার পথে খানিকটা ব্যাঘাত ঘটিয়ে যাই। তাছাড়া অনেক দিন মাসীমার হাতের ফুলকো লুচি, পাটনাই হালুয়া আর স্নিগ্ধতার হাতের চা খাইনি। মন স্থির করে ফেললাম। বাস স্টপে দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে দেখছি শ্যামবাজারের বাস আসছে কিনা—হঠাৎ পিছনে গেল গেল চীৎকার। লাফিয়ে ফুটপাথের ওপর উঠে দেখি, আর একটু হলেই তোমার ভাগ্যদেবতার বরপুত্র দামী ক্রাইসলার চাপা দিয়ে আমাকে পরপারে পাঠাচ্ছিলেন আর কি!

—তারপর?

—তারপর দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। তাদেরই মুখে শুনলাম উল্টো দিকে ফুটপাথে দু'টি তরুণী ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছিল, তাহাদের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন লাট সাহেব।

ভিড় বেশ জমে উঠতেই মোড়ের পুলিস কনেস্টবলটি ছুটে এসে গাড়ির কাছে দাড়িয়ে পকেট থেকে নোটবই পেনসিল বার করতেই—অরুণবাবু পকেটে হাত দিয়ে সেই মুঠো করা হাত বাড়িয়ে দিলেন কনেস্টবলটির দিকে। ব্যস—কেশ ডিসমিস। নোট বই ও পেনসিল আবার চলে গেল যথাস্থানে। হাসিমুখে সেই হাতে এক লম্বা স্যালুট করে ভিড় সরিয়ে দিতে লাগলো আইন ও শৃঙ্খলার প্রতীক। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে দরজা খুলে নেমে পাশে এসে দাঁড়াল অরুণ। তারপর একগাল হেসে বললে, ও আপনাকেই চাপা দিচ্ছিলাম নাকি? জবাব দিলাম না অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবির পকেট থেকে দামী সিগারেট কেসটা বার করে, নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে কেসটা আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

বললাম, খাই না।

অরুণ বললে, শুনলাম আপনার বাবা মারা গেছেন। বাড়ি চিনলে আর অন্তরঙ্গতা থাকলে একদিন গিয়ে আপনার শোকে সমবেদনা জানিয়ে আসতাম, আর সেই সঙ্গে কংগ্রাচুলেট করেও আসতাম।

অবাক হয়ে ওর দিকে ফিরে তাকালাম।

অরুণ বলে চলল, শুনেছি আপনার বাবা বহু টাকা রেখে গেছেন। এইবার একখানা দামী গাড়ি কিনে ফেলুন; এখন আপনার ট্রামে-বাসে বাদুড়ের মত ঝুলতে ঝুলতে যাওয়ার মানেই হয় না।

বললাম, গাড়ি বাড়ি আর পোশাকের মধ্যে যারা আত্মতৃপ্তি খোঁজে, আমাদের ত্রিশূলচক্র তাদের অবজ্ঞায় পরিহার করে চলে। বাস এসে গিয়েছিল, কোনও রকমে ঠেলেঠুলে উঠে পড়লাম। রাস্কেলটা তাতেও দমল না। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, একটু ভুল করলেন তাপসবাবু, এটা মেকির যুগ। ভিক্ষে চাইতে গেলেও খানিকটা ভেকের দরকার হয়।

আরও কি সব বললে শুনতে পেলাম না, বাস তখন ছেড়ে দিয়েছে। এইবার বল, ওকে খুন করা উচিত না।

—না!

দু'জনে চমকে ফিরে তাকাল। দু,খানা প্লেটে সদ্যভাজা গরম লুচি আর আলুভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকলো সুমিতা। প্লেট দু'টো টেবিলের ওপর ওদের সামনে নামিয়ে রেখে বললে, খুন করে কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না তাপস দা! ওতে তার উপকারই করা হয়। যে মরে গেল সে বেঁচে গেল। মনের সুখ শান্তি হারিয়ে যে হতভাগ্য বেঁচে রইল, তার শাস্তিটা একবার ভাবো তো। খুনখারাপি ছেড়ে তোমরা বরং খেতে সুরু কর। আমি চা আর হালুয়া নিয়ে আসি।

পেটে ক্ষিদে সামনে খাবার, শুধু আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব।

নিস্তব্ধ ঘরে খাবার প্লেটের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বায়োস্কোপের স্লো মোশন পিকচারের মত একখানা লুচি ভেঙে আলু ভাজার সঙ্গে মুখে তুলে দুই বন্ধু খাওয়ার অভিনয় করতে লাগল।

॥ নয় ॥

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। ফলও বেরিয়ে গেছে হু'দিন আগে। দীর্ঘ কয়েক মাস বাদে আজ চক্রবর্তী সাহেবের বাড়িতে চায়ের আসর বসেছে। পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আলোচনা চলছিল। চক্রবর্তী সাহেব বলছিলেন, তোমার যুক্তিটাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারছিনে বলে হুঃখিত তাপস। আমার মনে হয়, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব স্কুল পর্যন্ত থাকা ভাল। তারপরও যারা সেটা আঁকড়ে ধরে থাকে তাদের বিশেষ একটা উদ্দেশ্য থাকে। যেমন ধর, কেউ চায় আই-সি-এস বা ঐ রকম একটা কিছু হতে, আবার কেউ চায় ভাল রেজাল্ট দেখিয়ে নি-খরচায় ইয়োরোপ ঘুরে একটা বিশেষ লাইনে এক্সপার্ট হয়ে আসতে। তাছাড়া যারা স্বভাবতই ভাল ছেলে তাদের কথা ছেড়েই দিলাম, তাদের জীবনে পরীক্ষায় সব চেয়ে বেশি নম্বর পাওয়াটাই একটা নেশার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে।

ক্ষণিকা হুষ্টুমি করে বলে, সমীদ কোন্ শ্রেণীতে পড়ল বাবা?

চক্রবর্তী সাহেব হেসে জবাব দেন, সমীদকে ও হু'টোর মধ্যে শেষেরটিতেই বেশি মানায়। কেন না, শত অশান্তি বিপদ-আপদ মাথার ওপর তাণ্ডব নাচ জুড়ে দিলেও, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ও হতোই। ওর স্বভাবই হল শান্ত ধীর স্থির। যখন যে বিষয় নিয়ে ও পড়বে, বাহ্য জগৎ ভুলে তাতেই ও তন্ময় হয়ে যাবে। এতখানি নিষ্ঠা একাগ্রতা কি ব্যর্থ হতে পারে মা?

কপট অভিমানে ক্ষণিকা বলল, আর আমি যে রাতদিন বই নিয়ে এই কঠোর তপস্যা করলাম কী ফল তার হল? ভাল ভাবে পাস করলাম শুধু। আমার এই একাগ্রতা নিষ্ঠা এগুলোর কোনও মূল্য নেই বলতে চাও তুমি?

চক্রবর্তী, তোমার নিষ্ঠা একাগ্রতা তো শুধু পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল না মা, সামনে বই খুলে রেখে তোমার মন ছুটে বেড়াত বিশেষ কয়েকটি মানুষের পিছনে। যেমন ধর, আমি, সমীদ, তাপস সুনীল, পিসীমা, এমন কি বুড়ো হিন্দুস্থানী চাকর জানকী পর্যন্ত। এর জন্য তোমার আপসোস করবার কিছু নেই মা, এর পরও তুমি সমীদের মত রেজাল্ট করলে আমি শুধু অবাকই হতাম না, দুঃখও পেতাম।

তাপস সমীদ ক্ষণিকা—তিনজনেই অবাক হয়ে তাকায় চক্রবর্তী সাহেবের দিকে।

ক্ষণিকার গলায় সত্যিকার অভিমানের সুর বাজে, বলে, কেন বাবা?

কি একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নেন চক্রবর্তী সাহেব। হেসে বলেন, সেটা এদের সামনে বলব না মা—অন্য সময় শুধু তোমাকে বলবো।

অনুমানে কিছুটা হয়তো বোঝে, হয়তো বোঝে না। তিনজনেই চুপ করে থাকে। তাপস বললে, আমি কোন্ শ্রেণীতে স্থান পেলাম কিছুই বললেন না তো?

চক্রবর্তী সাহেব—তুমি এদের মধ্যে কোনও শ্রেণীতেই পড় না। তুমি হচ্ছ এক্সট্রা চেয়ার?

—এক্সট্রা চেয়ার?

—হ্যাঁ, হাউস ফুল হয়ে গেলে, যখন কোনও শ্রেণীতে তিল ধারণের স্থান থাকে না, তখন কোনও ধনী মানী অভ্যাগত বা দর্শক এসে পড়লে তাকে যেমন এক্সট্রা চেয়ার দেওয়া হয়, তোমাকেও সেই রকম স্পেশাল আসন ও সম্মান দিলাম। না পড়েশুনে শুধু দৃঢ় মনোবলের ওপর যে ছেলে পাস করতে পারে, মন দিয়ে পড়লে তার পক্ষে ফাস্ট সেকেণ্ড হওয়া যে মোটেই শক্ত নয় একথা সবাইকে তুমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছ।

আনন্দে ক্ষণিকা ও সমীদ করতালি দিয়ে ওঠে। উঠে দাঁড়িয়ে সবার দিকে মাথা ঝুঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বসে পড়ে তাপস।

মিনতি কুটীরের সামনের সবুজ ঘাসে ভরা লনটার মাঝখানে কতকগুলো বেতের চেয়ার টেবিল সাজিয়ে চায়ের আসর। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আশপাশের বাড়িগুলোতে আলো জ্বেলে দিয়েছে। না-আলো না-অন্ধকার লনে বসে ক্ষণিকা ভাবছিল—এরকম রমণীয় সন্ধ্যা জীবনে খুব কমই আসে। পরম তৃপ্তিতে চোখ বুজে বেতের চেয়ারটায় গা এলিয়ে বসল ক্ষণিকা।

সামনে গেটের আইভি লতাগুচ্ছের ভেতরে চাপাপড়া ইলেকট্রিক বাল্‌বটা হঠাৎ জ্বলে ওঠে। লতাপাতার ফাঁক দিয়ে এক ফালি কড়া আলো ঠিকরে এসে পড়ে ক্ষণিকার চোখে মুখে।

ধড়মড়িয়ে উঠে সোজা হয়ে বসে সামনে দেখে—সুনীল গেট থেকে বাড়ি মুখো চলেছে। ডাকতেই কাছে এসে দাঁড়াল সুনীল।

ক্ষণিকা বললে, পিসীমাকে বলে দাও রাত্রে আমি খাব না শুধু বাবার খাবার তৈরি হবে।

চক্রবর্তী সাহেব—ব্যাপার কি কণা মা?

ক্ষণিকা—তোমায় বলতে একদম ভুলে গেছি বাবা; আজ সমীদের পাসের খাওয়া। মা বিশেষ করে বলে পাঠিয়েছেন—আমাকে আর তাপসকে।

চক্রবর্তী সাহেব—বুড়ো বলে আমাকে কি ইচ্ছে করেই বাদ দিলে সমীদ?

সমীদ কিছু বলবার আগেই ক্ষণিকা বলে, মায়ের মৃত্যুর পর বাইরে কোথাও যে তুমি খাও না, একথা ওরা সবাই জানে বাবা!

সুনীল চলে যাচ্ছে দেখে বলে, ভাই সুনীল, তুমি বেশ ভাল

করে আর একবার চা খাওয়াও এঁদের, আমি ততক্ষণ কাপড়চোপড় বদলে ঠাকুর ঘর হয়ে আসছি।

রমা দেবী বললেন, সুমি, মাংসটা চেখে দেখ তো মা! ভয় হয় এম-এ পাস মেয়ে তার উপর রান্নাতেও নাকি অন্নপূর্ণা। তাপস সমীদের মুখে তো প্রশংসা ধরে না।

একটা চায়ের প্লেটে খানিকটা মাংস নিয়ে ফোঁস করে ওঠে সুমিতা, অন্নপূর্ণা না ছাই। তোমার পায়ের কাছে বসে যে কোনও মেয়ে দশ বছর শিখলেও তোমার ধারে কাছে পৌঁছুতে পারবে না। আসল কথা হল সুন্দরী মেয়ে, যা শখ করে রান্না করে তাই ধন্য ধন্য পড়ে যায়।

—ঠিক বলেছ ভাই!

দু'জনে চমকে উঠে দরজার দিকে চেয়ে দেখে, টকটকে লালপাড় একখানা গরদের শাড়ি পরে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষণিকা। সুমিতা লজ্জায় লাল হয়ে মুখ নিচু করে। রমা দেবী কি বলবেন বুঝতে না পেরে ঠায় চেয়ে থাকেন।

ক্ষণিকা—আমি কাপড়চোপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে এসেছি মা, ঘরে ঢুকবো? দ্বিধা সঙ্কোচ নিমেষে দূর হয়ে গিয়ে প্রসন্ন হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রমা দেবীর। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, এস মা এস, অপরিষ্কার ঘর তার ওপর ধোঁয়ায় ভর্তি সেই জন্য তোমায় ডাকতে ইতস্ততঃ করছিলাম।

ঘরে ঢুকে মেঝের ওপর জেবড়ে বসে ক্ষণিকা বললে, মায়ের কাছ থেকে ডাকের প্রত্যাশায় বসে থাকার মত নির্বোধ মেয়ে আমি নই মা! নেহাত কিছু না বললে ভাল দেখায় না তাই—।

বাধা দিয়ে রমা দেবী বললেন, ওরে সুমি, ওঘর থেকে একখানা আসন এনে দে, এমন শাড়িখানা নষ্ট হয়ে যাবে যে!

এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে পেল সুমিতা। তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিল, ক্ষণিকা হাত ধরে বাধা দিয়ে বললে, থাক থাক ভাই, বসেই যখন পড়িছি তখন নষ্ট যা হবার হয়ে গেছে। রমা দেবীর দিকে ফিরে বলে, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলে মেয়েকে আসন পেতে অভ্যর্থনা করতে হয়—এটা কোন্ দেশের প্রথা মা ?

এবার সত্যিই লজ্জা পান রমা দেবী। মুগ্ধ অপলক চোখে চেয়ে থাকেন শুধু। সমীদ আর তাপসের মুখে শুনেছিলেন, ক্ষণিকা সুন্দরী। আজ বুঝলেন সব দিক দিয়ে এমন সুলক্ষণা মেয়ে চট করে নজরে পড়ে না।

ক্ষণিকা বললে, তারপর ভাই সুমিতা, রান্নার কথা কি বলছিলে ?

লজ্জায় মাথা নিচু করে সুমিতা। চেখে দেখবার জন্য প্লেটে রাখা মাংস থেকে এক টুকরো তুলে মুখে দিয়ে পরম তৃপ্তিতে চোখ বুজে ক্ষণিকা বলে, সুমিতা সত্যি কথাই বলেছে, সারাজীবন চেষ্টা করলেও এ রান্না আমার হাত দিয়ে বেরোবে না।

প্রশংসাস্ফীত চোখে রমা দেবীর দিকে চেয়ে বলে, জানেন মা, আমরা আধঘণ্টা হল এসেছি। সমীদের পড়ার ঘরে বসে নানা রকম আলোচনা চলছিল। আমি কিন্তু প্রাণখুলে যোগ দিতে পারছিলাম না, খালি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম।

রমা দেবী ও সুমিতা দু'জনেই একটু অবাক হয়ে চাইলেন ক্ষণিকার দিকে।

নিঃশব্দে প্লেটের মাংসটুকু শেষ করে একগাল হেসে ক্ষণিকা বললে, বুঝতে পারলেন না ? এই মাংসর গন্ধই আমাকে পাগল করে টেনে নিয়ে এল রান্নাঘরে। কী করে এমন চমৎকার রান্না করলেন ? না-শিখে আমি একপাও নড়ছিনে এখান থেকে।

মেয়েদের খুশী করবার সব চেয়ে সহজ উপায় হল রান্নার প্রশংসা,

তার উপর যদি কেউ বলে, রান্নাটা আমায় শিখিয়ে দি—ব্যস, তাহলে তো আর কথাই নেই।

রমা দেবীও এ দুর্বলতার হাত থেকে রেহাই পাননি। মহা উৎসাহে সুরু করলেন, তোমাকে সব খুলেই বলি মা। সমীদের বাবা কন্‌ট্রাকটারি কাজ করতেন। নানান জায়গায় ঘুরতে হত। যেখানে-সেখানে যা তা খেতেন। নিজেও ভুগতেন আমাকেও ভোগাতেন। অনেক ভেবে-চিন্তে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা কী তোমার খেতে ভাল লাগে আমায় বল, আমি রান্না করে দেব। শুনে হো হো করে হেসে উঠে বললেন, তোমাদের পুঁজি তো ঐ ডাল ভাত শাক চচ্চড়ি মাছের ঝোল? ওতে আমার অরুচি ধরে গেছে। রোজ আমার মাংস চাই, পারবে নিত্যি নতুন ধরনের মাংস রাঁধতে? কারি কাবাব কোর্মা রোস্ট? কেমন জেদ চেপে গেল, বললাম, পারবো। চুপ করে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে কি ভাবলেন তারপরে বললেন, বেশ পনের দিন সময় দিলাম, এর মধ্যে শিখে নাও। পনের দিন বাদে তোমার পরীক্ষা সুরু হবে, পাস করতে পার ভাল, নইলে যেমন বাইরে খাচ্ছি তেমনি চলবে।

কৌতূহল বেড়ে ওঠে, ক্ষণিকা বলে, তারপর?

—সমীদ তখন স্কুলে পড়ে। সারা দুপুরটা একলা ছটফট করে কাটাই—কোনও দিকেই আলো দেখতে পাই না; দু-তিন দিন এইভাবে কাটলো। হঠাৎ কাশী থেকে আমার খুড়তুতো ভাই অনাথ এসে হাজির। কী ব্যাপার? অনাথ বললে, এখানকার একটা আফিসে চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম ডেকে পাঠিয়েছে। পরশু ইণ্টারভিউ। আমি আর অনাথ প্রায় সমবয়সী। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি, পড়েছি। বললাম, অনাথ তোকে নিশ্চয় বাবা বিশ্বনাথ আমার কাছে পাঠিয়েছেন, এই তিন দিন খালি বাবাকে ডেকেছি।

গম্ভীর হয়ে অনাথ বললে, ব্যাপার কী?

সব খুলে বললাম। শুনে তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট দুটো উলটে অনাথ বললে, এই? এরই জন্য সাত-সতেরো ভেবে মরছিস? দে আমায় পাঁচটা টাকা, এক ঘণ্টার মধ্যে তোর সব মুশকিল আসান করে দিচ্ছি।

বেশ একটু রেগেই বললাম, এটা তামাসার ব্যাপার নয় অনাথ!

—কে বললে আমি তামাসা করছি। সত্যি বলছি পাঁচটা টাকা দে, বেশ বড়সড় দেখে একটা টিফিন ক্যারিয়ার কিনে নিয়ে আসি। তারপর যেদিন তোর যা দরকার হোটেলে অর্ডার দিয়ে আনিয়ে দেব। পতি দেবতার খাবার আগে শুধু একটু গরম করে দিবি ব্যস্।

বললাম, না অনাথ এভাবে প্রতারণা করতে আমি পারবো না। অন্য উপায় যদি জানা থাকে তো বল।

এবার সত্যই চিন্তিত হয়ে পড়লো অনাথ। খানিকক্ষণ বাদে বললে, আর একটা উপায় আছে। ভারী শক্ত, পারবি তুই?

—পারতেই হবে, যত শক্তই হোক তুই বল।

অনাথ বললে, দুপুর বেলা একটা গাড়ি নিয়ে আমার সঙ্গে তোকে বেরুতে হবে। পাটনায় নাম-করা হোটেল তিন চারটের বেশি নেই। হোটেলে গিয়ে হেড বাবুর্চির কাছ থেকে রান্নার ফরমুলা শিখে আসতে হবে তোকে। শুধু হাতে হবে না, হয়তো দু'দশ টাকা ঘুষও দিতে হবে।

তখুনি রাজি হয়ে গেলাম। দু'দিন অনাথের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। পনের দিন বাদে পরীক্ষায় বেশ প্রশংসার সঙ্গেই পাস করলাম।

মন্ত্রমুগ্ধের মত ক্ষণিকা বললে, খোসামোদ করছি না মা, আপনার পরীক্ষা আমাদের ইংরেজীর এম-এ পরীক্ষার চেয়েও শক্ত। সব ক'টি রান্নাই আমায় শিখিয়ে দিতে হবে—আজ শুধু এই অদ্ভুত কারিটা কি ফরমুলায় রাঁধলেন আমায় শিখিয়ে দিন।

পরিতৃপ্তির হাসিতে সারা মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে রমা দেবীর। মাংস হয়ে গিয়েছিল, ডেকচিটা উনুন থেকে নামিয়ে রেখে হাত ধুয়ে

বললেন। খুব সোজা তুমি একবার শুনলেই শিখে নিতে পারবে। প্রথমে মাংসটাকে হলুদ বাটা দিয়ে বেশ করে মেখে নেবে। তারপর অল্প একটু লঙ্কা বাটা আর আদার রস দিয়ে মাখবে। মাংসর পরিমাণ বুঝে ঘি দিয়ে খালি ডেচকিটা অল্প আঁচে উনুনের উপর বসিয়ে দেবে। ঘিটা তৈরি হলে তিন চার কোয়া রসুন তাতে ফেলে দিয়ে হাতা দিয়ে নাড়তে থাকবে। রসুনের কোয়াগুলো লালচে হয়ে এলে গরম মসলা, মানে কয়েকটি ছোট এলাচ লবঙ্গ আর তেজপাতা ফেলে দিয়ে বেশ করে নেড়ে ভেজে নেবে। তারপর এক বা দু' চামচে চিনি দিয়ে বেশ করে নাড়বে। চিনিটা ঘি-এর সঙ্গে মিশে গেলে সোনার মত রঙ হবে। তখন কয়েকটা টম্যাটো ওর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বেশ করে ভেজে নেবে, তারপর একটু পরে দেবে মাংস। আগে থেকে একটা কলাই-এর বাটিতে বা চিনে মাটির কাপে পেঁয়াজের রস ঢেকে রেখে দেবে। মাংস কষবার সময় অল্প অল্প রস ছড়িয়ে দেবে। তারপর বেশ করে নেড়েচেড়ে ঢাকনি খুলে দেখতে পাবে, মাংস থেকে জল বেরিয়েছে। এই কষাটাই হল আসল রান্না। জলটা মরে নিয়ে যখন দেখবে মাংসটা বেশ সুকো-সুকো হয়ে উঠেছে তখন গরম জল ঢেলে দিয়ে ঢাকনি বন্ধ করে দেবে। মাংস সিদ্ধ হয়ে গেলে নুন ও আলু দিয়ে খানিক বাদে নামিয়ে ফেলবে। ব্যস—মাংস হয়ে গেল। এ ফরমুলায় রান্না-মাংস রোজ খেলেও ক্ষতি হবে না।।

ক্ষণিকা—সাধারণ বাঙালী সংসারে কিন্তু তেল দিয়ে রান্না করে মা, মাংস নামিয়ে তারপর ঘি গরম মসলা দেয়।

রমা দেবী—যদি খাঁটি সরসের তেল হয় তাহলে শুধু তেল দিয়েও ভাল রান্না হয়; কিন্তু তেল ঘি দুটো একসঙ্গে দিলেই মাংস গুরুপাক হয়ে যাবে।

সমীদের পড়ার ঘর থেকে দু'জনের সম্মিলিত উচ্চ হাসির আওয়াজ ভেসে আসে। ক্ষণিকা ও রমা দেবী সচকিত হয়ে ওঠেন। ক্ষণিকা

বলে, এই দেখুন, কথায় কথায় আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করে দিয়ে গেলাম।

এরই মধ্যে কখন নিঃশব্দে সুমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে দুজনের কেউ খেয়ালই করেনি। ক্ষণিকা বললে, সুমিতা হঠাৎ কোথায় পালাল বলুন তো?

রমা দেবী বললেন, কোথায় আর যাবে, হয়তো তাপসকে চা করে খাওয়াচ্ছে। এক ঘণ্টা অন্তর সুমিতার হাতের চা না পেলে ছেলে আমার চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। বলে কি জান? অন্য সব বিষয়ে মা আমাদের তুলনাবিহীন, কিন্তু একই চা চিনি দুধ সুমিতার হাতের ছোঁয়া পেলে যেমন আনন্দে গান গেয়ে ওঠে অন্য কারও হাতে তেমন হয় না। পাগল ছেলে!

ক্ষণিকা গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু সুমিতা তো শুনলাম হোস্টেলে চলে গেছে, তাপসের তাহলে চা খাওয়া এক রকম বন্ধ হয়ে গেছে বলুন।

হাসি মুখেই জবাব দেন রমা দেবী, এক রকম তাই, সুমিতা না থাকায় আমাকেই চা করতে হয়, পিত্তি রক্ষে করবার মত এক কাপ খেয়েই বলে আর দরকার নেই।

—আর সমীদ? নিজের কানেই গলাটা ভারি লাগে—চেষ্টা করেও স্বাভাবিক করতে পারে না ক্ষণিকা।

—খোকা? খাওয়ার ব্যাপারেও নির্বিকার, খেতে হয় তাই খাওয়া। রবিবার বা ছুটীর দিনে সুমিকে হোস্টেল থেকে আনিয়ে নিই আমি। তাপস এসে পড়লেই ব্যস হৈহল্লা চেঁচামেচি শুরু করে দেবে, —সাতদিন অনুপস্থিত, জরিমানা হল সাত কাপ চা তবে তোমার ছুটী। সুমিও এসে আগে খোঁজ নেয় তাপসদা এসেছিল কি না, কাজ করতে পেলে ও যেন বেঁচে যায়, এক একসময় ভাবি···

বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নেন রমা দেবী,—সামলাতে পারেন

না দীর্ঘ নিঃশ্বাসটাকে। একটু চুপ করে থেকে বলে—তুমি যাও মা ওদের সঙ্গে গল্প করোগে, আমি ততক্ষণে রান্নাটা শেষ করে ফেলি।

চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ক্ষণিকা। প্রথমটা বাইরে কিছুই দেখা যায় না, ধোঁয়ায় চোখ দুটো ধাঁধাঁ লেগে যায়। একটু পরে অস্পষ্ট আলোতে দেখতে পায় পশ্চিমের বারান্দার শেষ প্রান্তে রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে নিস্পন্দ পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে সুমিতা। নিঃশব্দে কাছে গিয়ে পিঠের ওপর একখানা হাত রেখে সস্নেহে বলে, অন্ধকারে একলাটি দাঁড়িয়ে কেন সুমিতা?

কোনও উত্তর আসে না।

এবার কাছে টেনে নিয়ে ক্ষণিকা বলে, আজ তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করবো বলেই এসেছি আমি অথচ তুমিই আমায় অ্যাভয়েড করে চলেছ?

শুধু মুখ তুলে একবার ক্ষণিকার দিকে তাকায় সুমিতা তারপর দ্রুতপদে বাঁদিকে রমা দেবীর অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে পড়ে।

অবাক হয়ে নিজের মনকে প্রশ্ন করে ক্ষণিকা, সুমিতার চোখে জল, না দেখবার ভুল?

সমীদের ঘরে ঢুকতে গিয়ে তাপসের কথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্ষণিকা।

তাপস বলছিল, ঘটনাচক্রে অনেক সময় দেখা যায়, কোনও রকম অপরাধ না করেও নির্দোষীকে সারাজীবন চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়। সুমিতার কথাই ধরা যাক, জন্মের পর থেকেই বেচারি জেনে এসেছে ওর ঘর-বর ঠিক হয়েই আছে। আজ বুক ভরা আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে কোথায় ঘর? ধু ধু করছে চোরাবালি ঢাকা বিস্তীর্ণ মাঠ। এর জন্য দায়ী কে?

—কেউ না।

—কেউ না?

—না। আমাকে লক্ষ্য করে কথাটা যদি বলে থাকিস খুব ভুল করেছিস। আমার এতে কোনও হাতই ছিল না, এমন কি কয়েক মাস আগে পর্যন্ত সুমিতার অস্তিত্বও আমার অজানা ছিল। কথাটা তোকে আগেও বলেছি তবুও আজ উদাহরণ দিতে সুমিতার কথাটাই মনে এল কেন বুঝতে পারলাম না।

তাপস চুপ করে থাকে।

সমীদ বলে যায়, সত্যিকার দায়ী যে, তাকে তুইও চিনিস আমিও চিনি। যদি কোনও দিন তার নাগাল—

কথা শেষ করতে পারে না সমীদ। তাপস উত্তেজনায় প্রায় উঠে দাঁড়িয়ে বলে, কে সে?

জবাবটা তখনই দেয় না সমীদ! প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের হাসিতে ঠোঁট দুটো ঈষৎ বেঁকে যায়, বলে, অদৃষ্টবাদে যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে বলবো, ভাগ্য দেবতা। ঐ খাম খেয়ালি দেবতাটির হঠাৎ খেয়াল খুশীর রসদ যোগায অসংখ্য নিরীহ নরনারী, সারাজীবন তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে বেঁচে থেকে। আর যদি নাস্তিকের মত বলিস ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না, সুখ-দুঃখ, সব আমাদের নিজেদের সৃষ্টির ফল, তা ভোগ করতেই হবে। তাহলে আমাকে অনায়াসে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিয়ে খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারিস।

বলবার কথা খুঁজে পায় না তাপস। চেয়ারটার পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে।

ক্ষণিকা ভাবছিল এই বেলা চুপি চুপি পালিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে মায়ের কাছে অথবা অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াতে পারলে বেঁচে যায়। কোনটাই হয় না। পা দুটো অসম্ভব ভারি, এক পাও নড়তে পারে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকে।

সমীদ নিজের মনেই বলে যায়, রোমের নিষ্ঠুর শয়তান রাজা নিরোর কথা জানিস তো—যিনি নিরীহ প্রজাদের ধরে এনে ঘটা করে

সিংহের মুখে ফেলে দিয়ে, নয় তো ঘর বাড়ি এমনকি সারা শহরটা জ্বালিয়ে দিয়ে পৈশাচিক আনন্দে বিভোর হয়ে বাঁশি বাজাতেন ? তবুও তুলনায় নিরো অনেক হিউম্যান।

—নিরো হিউম্যান ? অবাক হয়ে বলে তাপস।

—হ্যাঁ। নিরো মানুষের জীবন নিয়ে খেলতো। জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে খেলাও থামতো, বাঁশিও থামতো। কিন্তু ইনি ? মন নিয়ে খেলার শেষ কবে হবে কেউ জানে না, ব্যথার বাঁশিও বেজে চলে, থামে না।

—তাপসদা সমীদদা তোমরা এস, খাবার দেওয়া হয়েছে। তুমিও এস ক্ষণিকাদি।

নিঃশব্দে কখন যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে জানতেও পারেনি ক্ষণিকা। চমকে চেয়ে দেখে, কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করেই হন হন করে বারান্দা দিয়ে খাবার ঘর মুখো চলেছে সুমিতা।

॥ দশ ॥

হোস্টেলের গেট দিয়ে বেরুতেই সামনের ফুটপাথে লীনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রথমটা চিনতেই পারেনি সুমিতা। লীনা এসে জড়িয়ে ধরে বললে, এই ক মাসে এতই পর হয়ে গেছি যে চিনতেই পারলি না ?

সত্যিই অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে লীনার। হোস্টেলে লীনা আর সুমিতা একই ঘরে থাকতো। পাতলা ছিপ ছিপে চেহারা, রোগা বললেও ভুল হয় না। সুমিতার স্বাস্থ্য বরাবরই ভাল। নিটোল গোলগাল গড়ন। অন্য মেয়েরা ঠাট্টা করে বলতো—লরেল-হার্ডি। সেই লীনা, বিয়ে করে মাস চারেকের মধ্যেই —

লীনা বললে,—অবাক হয়ে দেখছিস কি ?

—তোকে। ছেলে বেলায় মা মাসি পিসী আর পাড়ার গিন্নী-বান্নিদের মুখে শুনতাম—বিয়ের জল পড়লে মেয়েদের চেহারা নাকি একদম বদলে যায়। বিশ্বাস হত না, কিন্তু আজ তোকে দেখে—

বাধা দিয়ে লীনা বলে—শুধু বিয়ের জল নয় ভাই, পাক্কা তুটি মাস মুসৌরিতে সকাল বিকেল মাইল চারেক করে হেঁটেছি, সেই সঙ্গে খাওয়া।

মোটরের হর্ন শুনে তুজনেই পিছন ফিরে চেয়ে দেখে। পুব দিকের ফুটপাথের গা ঘেঁষে প্রকাণ্ড একখানা ক্যাডিলাক গাড়ি এসে দাঁড়াল।

কতকটা নিজের মনেই বললে সুমিতা, হুঁ, শত কাজের মধ্যেও ডিউটিতে ঠিক হাজরে দেওয়া চাই। কিছু বুঝতে না পেরে লীনা বলে, ও কে ভাই ?

সুমিতার গলায় পরিহাসের তরল সুর বেজে ওঠে, বলে— রূপকথায় পড়িসনি পক্ষিরাজে চড়ে রাজ পুত্তুর এ রাজ্য থেকে ও রাজ্য ঘুরে

বেড়ায় মনের মত রাজকন্যার সন্ধানে! এ যুগে পক্ষিরাজের স্থান নিয়েছে মোটর গাড়ি, আর তাতে করেই ঘুরে বেড়াচ্ছে রায় বাহাদুরের একমাত্র বংশ-দুলাল অরুণাংশু বোস। বিয়ে করে হয় তো তুই ঠকে গেলি লীনা নইলে রাজরাণী হবার একটা চান্স নিতে পারতিস।

লজ্জায় লাল হয়ে লীনা বলে, ধ্যেৎ।

সুমিতা,—যাক ওসব কথা, কবে থেকে আসছিস হোস্টেলে?

—সে আর হবে না ভাই।

—কেন?

—আমার আর ওঁর খুবই ইচ্ছে ছিল বি. এ-টা পাস করি কিন্তু শ্বশুর ভীষণ গোঁড়া, সেকেলে-পন্থী। বলেন, বিয়ের পর ওসব ছেলেমানুষী চলবে না। একা বাড়ি থেকেই বার হতে দেয় না।

—আজ তাহলে এলি কি করে?

—আজ ওদের অফিসের ডিরেকটারদের কি একটা মিটিং, যাবার সময় নামিয়ে দিয়ে গেল, ঠিক এক ঘণ্টা ছুটী মঞ্জুর, তারপরই হাজির থাকতে হবে গেটের সামনে।

অবাক হয়ে সুমিতা বলে, এত বাঁধাবাঁধির মধ্যে হাঁফিয়ে উঠিস না তুই?

—কি করবো ভাই, আগে কি জানতুম যে বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ির চৌকাঠ মাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছার বারো আনাই বাইরে রেখে যেতে হয়! শুধু আমি আর উনি হলে যা হয় হত; কিন্তু তা তো নয়, প্রকাণ্ড সংসার—শ্বশুর শাশুড়ী দেওর-ননদ ঠাকুর-চাকর আত্মীয় কুটুম্ব সব সময় যেন হাট বসে গেছে। তার উপর দুবেলা খাবার সময় শ্বশুরের সামনে হাজির থাকা চাই-ই চাই। কোনও রকমে এর নড় চড় হবার যো নেই। বাড়ির বড় বৌ আমি, না করেই বা উপায় কি?

শ্বশুর বাড়ির কথায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে লীনা।

কেমন হাসি পায় সুমিতার। ভাবে, এই একটি মাত্র পরিবেশ ছাড়া লীনার টাইপের মেয়েরা বাঁচবার কল্পনাও করতে পারে না। স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী পুত্র কন্যা সংসার। এই হল এদের পৃথিবী, ঠিক যেমনটি পরিকল্পনা করে গেছেন অনেক বছর আগে ধর্মান্ধ গোঁড়া সমাজপতির দল। লীনার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে আঁতকে ওঠে সুমিতা।

বেথুনের গেটের সামনে ওল্ড মডেল সিডন বডি একখানা অস্টিন এসে দাঁড়াল। রীতিমত ভয় পেয়ে লীনা বলে, চললুম ভাই, উনি আগেই এসে পড়েছেন, বোধ হয় মিটিং হয়নি।

একরকম ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল লীনা।

লীনা চলে যেতেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সুমিতা ওদিককার ফুট-পাথের গা ঘেঁষে তখনও দাঁড়িয়ে আছে ক্যাডিলাক গাড়িটা। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠল সুমিতার। ফুটপাথ ধরে দক্ষিণ মুখো কিছুটা এগিয়ে এসে ডাকল, শুনুন!

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে চারদিক দেখে নিয়ে অরুণ বললে, আমায় ডাকছেন?

—হ্যাঁ।

দরজা খুলে বাইরে এসে সত্য ধরানো সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল অরুণ।

সুমিতা 'বললে, নিত্যি নতুন গাড়ি নিয়ে এভাবে যখন তখন মেয়েদের পিছনে ঘুরে বেড়ান কেন?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অস্ফুটস্বরে কি যে বললো অরুণ বোঝা গেল না।

সুমিতা বলে ওঠে, এম-এ, পাস করেছেন, অথচ এই সোজা কথাটা বোঝেন না যে মাকাল ফলের মত বাইরের খোলসটাকে সম্বল করে রাতদিন মেয়েদের পেছনে হ্যাং হ্যাং করে ঘুরে বেড়ালে ফল তার উল্টোই হয়?

আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে অরুণ বলে, এম-এ পাস করেছি এ খবরটা পেলেন কোথায় ?

সুমিতা বলে, ধ্রুব সত্য যেটা তার জন্যে গেজেট হাতড়াতে হয় না। আজ পর্যন্ত কেউ শুনেছে যে রায় বাহাত্নর, রায় সাহেব বা ঐ রকম হোমরা চোমরা ঘরের ছেলেরা উনিভারসিটি থেকে ব্যর্থতার ছাপ নিয়ে ফিরে গেছে ?

জবাব দেবার কিছু না পেয়ে চুপ করে থাকে অরুণ।

সুমিতা বলে যায়—সত্যিকার মেয়েদের মন জয় করতে হলে চাই শ্রদ্ধা। ভাল যাকে বাসবেন আগে তাকে শ্রদ্ধা করতে শিখুন। তারপর চাই নিষ্ঠা, একাগ্রতা। পয়সার ভূমিকা এখানে একেবারে গৌণ। মেয়েদের মন জয় করা ব্যাঙ্কের চেক বই সই করার মত সহজ ভেবেছেন বলেই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

আঘাতের পর আঘাত। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসে সুমিতা, আজ বেহায়া লোকটাকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দেবে।

সমস্ত পুরুষ জাতটার ওপর মনে মনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাগে চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে সুমিতার। স্বভাবতঃ দেখা যায় দ্বিতীয় রিপুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মুখে কেমন একটা বীভৎস কুৎসিত ছাপ ফুটে ওঠে, সত্যিকার চেহারাটা তার নিচে চাপা পড়ে যায়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে এর ত্নর্লভ ব্যতিক্রমও দেখা যায়—রাগলে আরও সুন্দর দেখায়। সুমিতা এই ত্নর্লভ ব্যতিক্রম। জবাব দিতে ভুলে গিয়ে মুগ্ধ অপলক চোখে চেয়ে থাকে অরুণাংশু, একটু পরে বলে, বাধা পেলাম প্রথম এই শতদ্রু তীরে !

রাগে জ্বলে উঠে সুমিতা বলে, জবাব দেবার আর কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না বুঝি ?

মৃত্নু হাসিতে ঠোঁট্ ত্নটো ঈষৎ বেঁকে যায় অরুণের, বলে—জবাব

আমার একটা তৈরিই আছে, খুঁজতে হবে না। ভাবছি এখানে দাঁড়িয়ে বলাটা—

—এখানে বলতে আপত্তিটা কিসের ?

—আমার দিক থেকে কিছু নেই, কিন্তু মেয়েদের কাছে আমার যা সুনাম, তাতে এখানে দাঁড়িয়ে আর কিছুক্ষণ ঝগড়া করলে আপনার সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে কি না ভাবছি।

—আপনার মতে ঝগড়া করবার নিরাপদ স্থানটি কোথায়, দয়া করে বলবেন ?

সুমিতা আজ মরিয়া। যাহোক একটা হেস্তনেস্ত আজ করবেই।

জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে রাস্তা পার হয়ে গাড়ির পিছনের সীটের দরজা খুলে দাঁড়াল অরুণ। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে ঘুরে গিয়ে সামনের সীটের দরজাটা খুলে ড্রাইভারের পাশের সীটটিতে বসে পড়ল সুমিতা।

মাণিকতলা স্ট্রীট বেয়ে সেণ্ট্রাল এভিনিউ-এ পড়ে সোজা দক্ষিণ-মুখো ছুটে চলল এ যুগের পক্ষিরাজ।

চুপচাপ। নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে চলেছে দামী ক্যাডিলাক। মোড়ে রেড লাইটের সামনে গাড়ি থামে। ট্রাম বাস ট্যাক্সি থেকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখে লোকে ঝকঝকে দামী গাড়িটা, হয়তো আরোহীকেও চেনবার চেষ্টা করে। কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করে সুমিতা। মনটাকে দৃঢ় করে সামনে দৃষ্টি রেখে পাথরের মত বসে থাকে। কখনও বা অসতর্ক পথচারিকে সজাগ করতে পিকিউলিয়র ইলেকট্রিক হর্নটা বিকট আর্তনাদ করে থামে ; পর মুহূর্তে পাশের সবাইকে হকচকিয়ে দিয়ে ছুটে চলে যায়—একটা অদ্ভুত জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে রাস্তার লোকগুলো চেয়ে থাকে। নিঃশব্দ পথ চলার ব্যতিক্রম হিসাবে মন্দ লাগে না।

রেড রোডের মাঝামাঝি একটা নির্জন জায়গায় গাড়ি থামিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে দিল অরুণ।

কথা শুরু করবার খেই খুঁজে পায় না কেউ। একটু ইতস্ততঃ করে পকেট থেকে দামী সিগারেট কেসটা বার করে অরুণ বলে, অনেকক্ষণ খাইনি, যদি অনুমতি করেন--

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে ফেলে সুমিতা বলে, বিলিতি কেতাগুলো দুরস্ত করবার ষোল আনা ইচ্ছে, অথচ—

কথা কেড়ে নিয়ে অরুণ বলে, অথচ তাদের সব চেয়ে অনুকরণীয় গুণটি অর্থাৎ নারীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা—একেবারে ভুলে বসে আছি। এই বলবেন তো? জানি, আর সেই জন্যই আপনাকে এই জনবিরল রেড রোডে নিয়ে এসেছি।

চুপ করে বসে থাকে সুমিতা।

স্টিয়ারিং হুইলটার ওপর মাথাটা কাত করে কি যেন ভেবে নেয় অরুণ। তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলে বলে, কৈফিয়ৎ একটা আমার আছে, তবে আমার বাইরের আচরণগুলোর মধ্যে সেটা ঠিক খাপ খাবে কি না বুঝতে পারছিনে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে অরুণ, তবে এটা ঠিক যে আমার পারিবারিক জীবন এর জন্যে অনেকখানি দায়ী। দয়া করে শুনবেন? খুব বেশি সময় নেব না।

দ্বিধা-সঙ্কোচ উঁকি দেবার চেষ্টা করে যেন। ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে সুমিতা বলে, বলুন।

পশ্চিম দিকে গঙ্গার বুকে নোঙর করা বিরাট দৈত্যের মত বিদেশী জাহাজগুলোর কেবিন থেকে ঝলমলে আলো ঠিকরে পড়েছে জোয়ারের অশান্ত ঢেউ এর মাথায়। স্থির অচঞ্চল দীপশিখা—চঞ্চল জলের সঙ্গে মিশে খুশীতে নাচতে নাচতে চলেছে কোন সে অজানার সন্ধানে। চুপ করে কিছুক্ষণ সেই দিকে চেয়ে থেকে, অভিমানে নিঃশেষ হয়ে আসা সিগারেটটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে অরুণ বললে, রুপোর চামচ মুখে করে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম এ বিষয়ে দ্বিমত নেই, কিন্তু খেয়ালী

বিধাতাপুরুষ আমার চেয়ে ঐ চামচটার ওপরই বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন। জন্মের দু'দিন পরেই সূতিকাগারেই মাকে হারালাম। মানুষ হলাম নার্স-আয়ার কোলে।

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে সুমিতার দিকে চেয়ে অরুণ বললে, পয়সা দিয়ে মাতৃস্নেহ কাউকে কিনতে শুনেছেন? আমার বাবা তাই করেছিলেন। জ্ঞান হবার পর দু'তিন বছর পর্যন্ত মাদ্রাজী আয়া রুক্মিণীকেই মা বলে জানতাম। মাসে একশো টাকার বিনিময়ে সে দিত মাতৃস্নেহ, আর দিত আমার অসংখ্য অন্যায় আবদার আর জুলুমের নির্বিবাদ প্রশ্রয়। স্কুলে ভর্তি হলাম। ছেলেদের কথা বাদই দিলাম—মাস্টাররা পর্যন্ত সব সময় তটস্থ। আমি যা বলি, যা করি, তাই ঠিক, তার প্রতিবাদ করবার সাহসও হত না কারও। এক কথায় আলালের ঘরের দুলাল। এমনি আবহাওয়ায় আমি মানুষ। মেয়েদের মনের মণিকোঠার হদিশ কোনও দিনই পাইনি, ভাবতাম আমি যাকে চাইব—ধরা দিয়ে ধন্য হয়ে যাবে সে। অস্বীকার করবো না, সে দিক থেকে খানিকটা চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন আপনি। সবার আগে আপনার কাছে ক্ষমা না চাইলে—

স্টিয়ারিং-এর বাঁ-পাশে বোর্ডে আলোকোজ্জ্বল দামী গোল ঘড়িটার সবুজ কাঁটা দুটো ন'টা আর বারোটার ঘর ছুঁয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

সুমিতা বললে, ন'টা বাজে, চলুন ফেরা যাক।

খানিকটা পথ নিঃশব্দে চলে আসার পর সুমিতা বললে, তাপস চৌধুরী. সমীদ রায় এদের চেনেন নিশ্চয়ই।

একটু অবাক হয়ে সুমিতার দিকে চেয়ে অরুণ বলে, হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে পড়তাম। কেন বলুন তো?

উত্তরটা এড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে সুমিতা: ক্ষণিকা চক্রবর্তীও

তো আপনাদের সঙ্গে পড়তেন। হাত তাঁর দিকেও বাড়িয়ে ছিলেন নিশ্চয়ই। তিনি ধন্য হলেন না কেন?

স্টিয়ারিং-সুদ্ধ হাতখানা কেঁপে ওঠে যেন—পাকা ড্রাইভার তখনই সামলে নিয়ে বিমূঢ়ের মত সুমিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে অরুণ। গাড়ি চলতে থাকে।

তেমনি সামনে রাস্তায় দৃষ্টিমেলে সুমিতা বলে, এর কোনও মক্ষম জবাব ভেবে রাখেননি বুঝি?

বৌবাজার স্ট্রীটের মোড়ে রেড লাইট। গাড়ি থামাতে ভুলে যায় অরুণ। ট্রাফিক কনেস্টেবল নোট বই-এ নম্বর টুকে নেয়।

সুমিতা হেসে বলে এত অন্যমনস্ক হয়ে গাড়ি চালিয়ে একটা অ্যাকসিডেণ্ট করে বসবেন নাকি?

—ঐ একটা জিনিস সুমিতা দেবী চেষ্টা বা ইচ্ছে করে ঘটান যায় না। এমনিতেই হঠাৎ ঘটে যায়। যেমন ধরুন আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াটা। কত দিন কত চেষ্টা করেছি, আজ আপনা হতেই ঘটে গেল।

সামনে রিক্সা, ব্রেক করে থামল গাড়ি।

অরুণ বললে, আপনার আগের প্রশ্নটার জবাব এখনও দেওয়া হয়নি। ক্ষণিকার পিছনে অনেকদিন ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, হাত বাড়াবার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু পেরে উঠলাম না শুম্ভ-নিশুম্ভ দুই দৈত্যের চক্র ব্যূহ ভেদ করতে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে ফেলে সুমিতা, বলে—ত্রিশূল চক্রের কথা বলছেন?

বিস্ময়ে বাকরোধ হয়ে যায় অরুণের। অনেক চেষ্টা করে শুধু বলে, আপনি—

কথাটা ছিনিয়ে নিয়ে সুমিতা বলে, এত কথা জানলাম কি করে? ধরে নিন অ্যাকসিডেণ্টলি জেনেছি, কিন্তু উপমাটার প্রশংসা

করতেই হবে। 'দুই পাশে সদা জাগ্রত প্রহরী, মাঝখানে পরীর দেশের রাজকন্যা—ক্ষণিকের দেখাতেই পুরুষের মাথা ঘুরে যায়, চমৎকার।

হঠাৎ ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই সোজা হয়ে বসে সুমিতা। হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে, ওটা কিন্তু অবাক হয়ে ন'টার ঘরে থেমে নেই।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি চালায় অরুণ। পথ অল্প বাকি ছিল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যায় বেথুনের গেটের কাছে। স্টার্ট বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকে অরুণ।

সুমিতা বলে, রয়টারের খবর, আর কয়েকদিন বাদেই রাজকন্যার কপালে টকটকে লাল সিঁদুর রক্ত-নিশানের মত উড়বে। এ দুঃসংবাদের খবর রাখেন কি ?

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে অরুণ। বলে, কে ? তাপস না সমীদ ? কার গলায় বরমাল্য পড়বে ?

—সেটা এখনও সঠিক জানা যায়নি, কেন না ক্ষণিকা দেবী স্বয়ংবরা হবে না তবে বরমাল্য যার গলাতেই পড়ুক আপনার বিপদ তাতে একটুও কমবে না। এবার শুধু ত্রিশূলচক্র নয়—ব্যাকগ্রাউণ্ডে সিঁদুরে মেঘ। তাই সময় থাকতে সাবধান করে দিয়ে গেলাম।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নেমে পড়ল সুমিতা। এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা দিয়ে সামনে মুখ বাড়িয়ে বিভ্রান্তের মত অরুণ ডাকল, শুনুন, আপনি ওদের—

—কেউ না। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল সুমিতা। কৌতুকে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, তবুও কেন ওদের এত খবর রাখি ? এই কথাটা জানবার জন্যই মনে মনে ছটফট করে মরছেন, নয় কি ?

কোন জবাব না দিয়ে শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে কলেজ পাড়ার ডনজুয়ান। এক পা এগিয়ে কাছে এসে সুমিতা বলে,

আপনার মত আমিও ঐ ত্রিশূলচক্রের সান্নিধ্য যথাসম্ভব এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করি। এর বেশি আর কিছু বলতে পারবো না।

বিস্মিত স্তম্ভিত অরুণকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়েই দ্রুত পা চালিয়ে গেটের মধ্যে ঢুকে ডান দিকের পথে অদৃশ্য হয়ে যায় সুমিতা।

॥ এগারো ॥

মিনতি কুটীরের গেটের ডানদিকে লাল নীল সাদা কাপড় দিয়ে মোড়া বাঁশের তোরণে সানাই ভৈরবী আলাপ করছিল। ভিতরে লাল সুরকি বিছানো পথটায় ঢিলে পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে শ্লিপার পায়ে অন্যমনস্ক হয়ে পায়চারি করছিলেন চক্রবর্তী সাহেব। গেটের বাইরে ফুটপাথ থেকে শিশু-কণ্ঠ ভেসে এল, ওমা সানাই বাজছে যখন নিশ্চয় বিয়েবাড়ি।

উত্তরে মা কি বললেন শোনা গেল না।

শিশু—তাহলে দাঁড়িয়ে পড়লি কেনো—চল্, লুচি খেয়ে আসি।

এক-পা দু-পা করে এগিয়ে এসে গেটের পাশে আইভি লতাগুচ্ছের কাছে চুপটি করে দাঁড়ালেন চক্রবর্তী সাহেব।

এবার মায়ের মৃদু ভর্ৎসনা শোনা গেল, ছিঃ পলটু! পরের বাড়ি ভিক্ষে করে খাওয়ার চেয়ে উপোস দিয়ে মরা ভাল। বাড়ি চল্—ভাত খাবি।

—ভাত না ছাই—ফেন-ভাত আর নুন—রোজ আর আমি খেতে পারি না। কতদিন লুচি খাইনি—তুই চল্ ভিতুরে—এরা কিছু বলবে না। দেখছিসনে গেটে চাকর-দরোয়ান কেউ নেই।

গেট পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন চক্রবর্তী সাহেব। শতছিন্ন ময়লা শাড়ি-পরা মা, আর তার হাত ধরে টানছে ছেঁড়া হাফ প্যান্ট-পরা এক শীর্ণকায় ছ'সাত বছরের ছেলে।

সব গেলেও মায়ের চোখে-মুখে ভদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের খানিকটা ছাপ এখনও নিঃশেষ হয়ে মুছে যায়নি। চক্রবর্তী সাহেবকে দেখে ছেলেটি ভয়ে কুঁকড়ে মায়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়াল।

দু'জন ঝাঁকা মুটের মাথায় বাজার করে সুনীল এসে দাঁড়াল গেটের

কাছে। চক্রবর্তী সাহেব বললেন, সুনীল আমার এই মেয়েটিকে আর ওর ছেলে পলটুকে এখনিই ভিতরে নিয়ে যাও। কণা মাকে বলবে একখানা নতুন কাপড়, প্যান্ট, গেঞ্জি, জামা যা দরকার এখনই ব্যবস্থা করে দিতে। এরা আমার নিমন্ত্রিত—আজ এখানে থাকবে, কাল দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে যাবে।

মেয়েটির দিকে ফিরে বললেন, যাও মা এর সঙ্গে ভেতরে যাও, কোনও সঙ্কোচ করো না—আমি তোমার ছেলে।

একটা অব্যক্ত অদ্ভুত চাউনি মেলে চেয়ে রইল মেয়েটি চক্রবর্তী সাহেবের দিকে। সুনীল কাছে গিয়ে ছেলেটির একখানা হাত ধরে সস্নেহে বলল, এস পলটু, কিছু খেয়ে নিয়ে চল দু'জনে আবার বাজার করতে যাব—এখনও অনেক জিনিস কিনতে বাকি।

উৎসাহে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পলটুর। চকিতে একবার মায়ের দিকে চেয়ে জোরে পা চালিয়ে গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ল সুনীলের সঙ্গে।

চক্রবর্তী সাহেব বললেন, যাও মা, সংসারে আমার লোকাভাব, তাড়াতাড়ি স্নান করে তরকারিগুলো কুটে ফেলতে হবে তোমাকে। চুপচাপ বসে নেমন্তন্ন খাওয়া চলবে না, তা কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি।

জল-ভরা চোখে একবার চক্রবর্তী সাহেবের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল পলটুর মা। তারপর ছিন্ন কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছতে মুছতে মহিলাটি সুনীল ও পলটুর অনুসরণ করলো।

ঘটনাটা ছোট্ট, কিন্তু তার অনুভূতি বিরাট।

একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে সারা দেহ মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল চক্রবর্তী সাহেবের। মুগ্ধ অপলক চোখে ওদের গমন-পথের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

—ব্রেভো চক্রবর্তী—রথ দেখা আর কলা বেচা এক সঙ্গে সেরে ফেললে কি ভেরি ক্লেভার। চমকে ফিরে চাইলেন চক্রবর্তী সাহেব। ঠিক পিছনে দামী স্যুট পরে, প্রকাণ্ড একটা হাভানা চুরুট মুখে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যারিস্টার ডাটা।

ঈষৎ লজ্জিতভাবে বললেন চক্রবর্তী সাহেব, তুমি কখন এলে দত্ত —জানতেই পারিনি।

—কি করে আর জানবে বল। পরোপকারের প্রকাণ্ড দিঘীতে তুমি দু'পা নেমেই ডুব দিলে– নীরব দর্শক সেজে তীরে দাঁড়ান ছাড়া আমার আর উপায় কি বল!

—তোমার কথাগুলো একটু হেঁয়ালি ঘেঁষা দত্ত—ব্যাপার কি খুলে বল তো?

চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে দত্ত বললে, একটি উদ্বাস্তু মেয়েকে দেখেই তুমি অভিভূত হয়ে পড়লে, তাই বলচি চল আমার সঙ্গে একবার শিয়ালদা স্টেশনে। স্বর্গ নরক কথা দুটো এতদিন পুঁথির কথা বলেই জানতাম। শিয়ালদা ঘুরে এলে নরকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করবে। তাদের দুঃখ-দুর্দশা যদি লাঘব করতে পার, তাহলে বলবো একটা কাজের মত কাজ করলে।

চক্রবর্তী সাহেব বললেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু সময় নেই। দু' একটা কথায় তোমার উত্তর দিচ্ছি। দুনিয়ার সব দুঃখীর দুঃখ মোচন করতে ভগবান বুদ্ধ যীশু চৈতন্যদেব কেউই পারেননি। আমাদের বর্তমান গভর্ণমেণ্ট কোটি কোটি টাকা খরচ করেও আংশিক সাফল্যলাভ করেছেন মাত্র। সে ক্ষেত্রে আমার মত একজন ক্ষুদ্র নগণ্য লোক কি করতে পারে বল? দু' একজনকে কিছুটা সাহায্য করতে পারলেই আমি খুসী। ক্ষুদ্র ব্যাপারী জাহাজের খবর নেবার ইচ্ছা ষোল আনা থাকলেও সাধ্য ও সামর্থ্য নেই। যাকগে ও সব কথার। তুমি হঠাৎ সকালে উদয় হলে, ব্যাপার কি?

—ব্যাপার একটু আছে ভাই। মিঃ স্যানিয়ালকে জান তো, আজ তাঁর বিবাহের হীরক-জয়ন্তী—মানে পঁচিশটা বছর নিরুপদ্রব শান্তিতে কাটিয়েছেন—তারই উৎসব। এদিকে তোমার মেয়ের বিয়ে আজ সন্ধ্যায়। মহা সমস্যায় পড়লাম। অনেক ভেবে একটা উপায় ঠিক করিছি ভাই।

—কি উপায় ?

—আমি যাব স্যানিয়েলের পার্টিতে আর মিসেস ও ছেলে মেয়েরা আসবে তোমার এখানে। আমি না এলে পাছে তুমি কিছু মনে কর, তাই আগেই বলতে এলাম ভাই।

চক্রবর্তী সাহেব হেসে বললেন, এই কথা! তা তুমি তিলকে তালের সঙ্গে তুলনা করছ কেন ভাই ? জান তো কণা মার জেদ নেহাত যাকে না বললে নয় তা ছাড়া আর কাউকে নেমন্তন্ন করতে পারবো না। বারের মধ্যে শুধু তোমাদের ক'জনকে বলিছি। কণা মার সহপাঠী বন্ধু-বান্ধব কাউকে বলা হয়নি। যাক, তুমি এলে খুসী হতাম, কিন্তু এ অবস্থায় এ ছাড়া তোমারই বা করবার কি আছে!

তারপর জানকী এসে জানালে টেলিফোন এসেছে। তাড়াতাড়ি বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন চক্রবর্তী সাহেব।

বিকেল চারটের সময় একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল পোর্টিকোয়। চক্রবর্তী সাহেব নিচেই ছিলেন। বেরিয়ে এসে দেখলেন, একটি আঠারো-উনিশ বছরের সুন্দরী মেয়ে এক ঝুড়ি ফুল নিয়ে গাড়িতে বসে আছে। অচেনা মুখ, তবুও ক্ষণিকার বান্ধবী বলে অনুমান করে বললেন, তুমি কোত্থেকে আসছ মা ?

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে প্রণাম করে সুমিতা বললে, আপনি আমায় চিনবেন না—আমি সমীদবাবুর বোন সুমিতা।

ক্ষণিকার কাছে সুমিতার কথা শুনেছিলেন চক্রবর্তী সাহেব। পরম

আদরে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, এইবার চিনেছি মা, দাঁড়াও আগে ট্যাক্সিটাকে বিদায় করি।

মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে ডাকলেন, সুনীল, ও সুনীল! সুনীল কাছেই কোথাও ছিল, ছুটে এসে হাজির হল। একা সুনীল এল না সঙ্গে নতুন হাফপ্যাণ্ট আর তার উপর নতুন রঙিন সার্ট-পরা পল্টু।

চক্রবর্তী সাহেব—সুনীল গাড়ি থেকে ঝুড়িটা নামিয়ে এঁকে তোমার দিদির কাছে পৌঁছে দিয়ে এস।

সুনীল হাত দেবার আগেই পল্টু ফুলের ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে দাঁড়াল।

চক্রবর্তী সাহেব হেসে বললেন, এর মধ্যেই তোমার অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে কাজকর্ম শিখিয়ে নিয়েছ দেখছি।

সুমিতাকে নিয়ে ওরা ভিতরে চলে গেল।

ক্ষণিকার ঘরে উঁকি দিয়ে সুনীল বললে, এই তো কিছু আগেও দিদি এই ঘরে ছিল; চলুন দেখি ঠাকুর ঘরে।

ঠাকুর ঘরের ইতিহাস কিছুটা শোনা ছিল সুমিতার, কৌতূহলও ছিল। সুনীলের নির্দেশে জুতো খুলে তিন জনে নিঃশব্দে তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

মায়ের ছবিটা বুকের মধ্যে চেপে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদছিল ক্ষণিকা। তিন জনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দরজার বাইরে। সুনীল চুপি চুপি পল্টুকে ইশারা করলে ফুলের ঝুড়ি নিয়ে পা টিপে টিপে নিচে নেমে গেল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুমিতা।

নিজের ইচ্ছায় পছন্দ মত ছেলেকে বিয়ে করার মধ্যে কান্নার কি যে থাকতে পারে আকাশ-পাতাল ভেবেও কূল-কিনারা পেল না সুমিতা। এভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও অশোভন। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে কাছে এসে ডাকল সুমিতা—ক্ষণিকাদি।

সন্থ ঘুম থেকে ওঠার মত ধড়মড় করে উঠে সামনে সুমিতাকে দেখে লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল ক্ষণিকা। নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে সুমিতাকে জড়িয়ে ধরে বললে, এত সকাল সকাল তোমরা আসবে বুঝতে পারিনি ভাই।

সুমিতা—আমরা নই, আমি একা। এসেছিলাম তোমাকে ফুল দিয়ে সাজাব বলে, কিন্তু তোমার কাণ্ড-কারখানা দেখে সাহস পাচ্ছি না। সন্ধ্যা হবার আর দেরি নেই—অথচ তোমার এখনও কিছু হয়নি। ব্যাপার কি ক্ষণিকাদি?

—ব্যাপার এমন কিছুই নয় ভাই। আজ সকাল থেকে খালি মাকে মনে পড়ছে, তা ছাড়া বাড়িতে এমন কেউ নেই যে তাড়া দিয়ে কনে সাজাতে বসবে। তুমি আসাতে কি খুসী যে হয়েছি ভাই! চলো, কোথায় তোমার ফুল?

—দোতলায় তোমার ঘরে। তুমি চলো, চট্ করে গা ধুয়ে কাপড় পরে নেবে -আমি ততক্ষণে গহনাগুলো রেডি করে রাখি।

—গহনা? অবাক হয়ে সুমিতার দিকে তাকায় ক্ষণিকা।

—হ্যাঁ, ফুলের গহনা; স্পেশাল অর্ডার দিয়ে মার্কেট থেকে এনেছি। দামী হীরে-জহরতের গহনা তোমার আছে জানি, কিন্তু আজ তোমাকে ফুলরাণী সাজাব। কথায় কথায় দেরি হয়ে যাচ্ছে—তুমি এস নিচেয়। হাত ধরে ক্ষণিকাকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে চলে সুমিতা।

সন্ধ্যার পরই নিমন্ত্রিত-অভ্যাগতের দল একে একে আসতে শুরু করল। সব মিলিয়ে সংখ্যায় শ' দেড়েকের বেশি হবে না। রাত্রি আটটার পর লগ্ন—যথারীতি বর এল' শাঁক ও উলুধ্বনি পড়ল। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে ক্ষণিকার বিয়ে হয়ে গেল।

রমা দেবী সন্ধ্যার আগেই এসে মেয়েদের অভ্যর্থনা ও খাওয়ানোর ভার নিয়েছেন। পুরুষদের দেখাশোনার ভার চক্রবর্তী সাহেব ও

সমীদের উপর। রাত্রি এগারটার মধ্যেই সব নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে এল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর সমীদ তাপসের দেখা পেল। নিচে চক্রবর্তী সাহেবের বসবার ঘরে, অন্ধকারে একটা ইজি-চেয়ারে চুপ করে শুয়ে আছে সে।

সমীদ প্রথমটা হতভম্ভ হয়ে গেল। চেয়ার থেকে এক রকম টেনে তুলে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বলল, তোর ব্যাপারটা কি বল তো তাপস? বিয়ের মন্ত্র ক'টা আউড়ে সাত পাক ঘোরার পর থেকেই উধাও। কি হয়েছে বল তো আমায়?

নীরবে চেয়ে রইল তাপস সমীদের মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না সমীদ তোর মত ছেলেকে বাতিল করে ক্ষণিকা আমার মত একটা অপদার্থকে স্বামিত্বে বরণ করবে!

সমীদ হেসে বলল, আত্মবিশ্লেষণ ভাল, কিন্তু নিজেকে অত ছোট করে দেখার মধ্যে কোনও পৌরুষ নেই। ক্ষণিকা যদি আমায় বরমাল্য দিত, খুসী হতাম না বললে মিথ্যা বলা হবে, কিন্তু ওর বিদ্যে-বুদ্ধির তারিফ করতে পারতাম না।

ক্ষণিকার মত একজন জীবন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন আমার চাইতে তোর অনেক বেশি। একথা তর্ক করে তোকে বোঝাতে পারবো না। এই-ই ভাল, রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে বলি—

"এই করেছ ভাল নিঠুর এই করেছ ভাল।"

সমীদকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ধরা-গলায় তাপস বললে, মনের দিক থেকে তুই অনেক বড় জানতাম, কিন্তু এত বড় কল্পনাও করতে পারিনি।

—আচ্ছা ঢের হয়েছে, এখন চল্ দেখি বাসর ঘরে। তোদের যুগলে দেখে নয়ন সার্থক করে বাড়ি যাই।

বাসর ঘরে ফুলের গহনা পরে ফুলপরী সেজে নতমুখে বসেছিল ক্ষণিকা। একটা বক্স-হারমোনিয়াম বাজিয়ে সুমিতা গাইছিল—

"প্রিয়, আজো নয় আজো নয়।"

দুই বন্ধু থমকে দাঁড়াল বাইরে। এত ভাল গাইতে পারে সুমিতা! অথচ এক সঙ্গে এতদিন কাটিয়েও এর সামান্য পরিচয়ও কেউ পায়নি।

গান থামতেই ঘরে ঢুকে তাপস বললে, ওরে দুষ্টু মেয়ে, শুধু রান্না করে ও চমৎকার চা তৈরি করে মিষ্টি হাতের পরিচয়ই দিয়ে এসেছ—এমন মিষ্টি গলা এত দিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে?

ক্ষণিকা বললে, ব্যারিস্টার মুখার্জির মেয়ে নিভাই পথ দেখালে। বললে, আপনারা জানেন না চমৎকার গাইতে পারে সুমিতাদি, বেথুনের একটা ফাঙশানে আমি শুনিছি। বাস আর যায় কোথা— পর পর তিনখানা গেয়ে তবে নিষ্কৃতি। ওরা চলে যেতেই আমি আর একখানা গাইতে বললাম। শুধু গানই নয় সমীদের মা আমার গলায় দামী জড়োয়া নেকলেশটা পরিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সুমিতা সেটা খুলে কেসের মধ্যে রেখে দিয়ে বললে, ফুলের সঙ্গে মানুষের তৈরি গহনা একদম বেমানান, ওটা আর একদিন পরো ক্ষণিকাদি।

প্রশংসা-বিস্ফারিত চোখে তাপস ও সমীদ সুমিতার দিকে চাইল। হারমোনিয়ামটা পড়ে আছে শুধু খাটের এক পাশে। সকলের অলক্ষ্যে এরই মধ্যে কখন সরে পড়েছে সুমিতা বাসর ঘর থেকে।

তাপসকে জোর করে ক্ষণিকার পাশে বসিয়ে দিয়ে সমীদ বললে, আজকের মধুযামিনীর মত সারা জীবনটা হয়ে উঠুক তোমাদের মধুময়। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

ক্ষণিকা ও তাপস নীরবে হাতের মধ্যে চেপে ধরল সমীদের হাতখানা।

সুনীল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বললে, সমীদদা, মাসিমা ও সুমিতাদি —এঁরা গাড়িতে বসে আছেন—রাত বারোটা বাজে।

নিঃশব্দে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স[illegible]।

অভিভূতের মত তাপস ও ক্ষণিকা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। ক্ষণিকা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে তাপসের হাত ধরে বললে, চল, ওপরে মাকে প্রণাম করে আসি।

॥ বারো ॥

সকাল দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে চক্রবর্তী সাহেবকে খাইয়ে-দাইয়ে কোর্টে পাঠিয়ে দিয়ে ক্ষণিকা চলে যায় তাপসের রায় স্ট্রীটের বাড়িতে। বিকেলে চক্রবর্তী সাহেবের কোর্ট থেকে ফেরবার আগে তাপসকে সঙ্গে নিয়ে আবার চলে আসে এ বাড়িতে। এই ভাবে ছ' মাস কাটল। সে দিন রবিবার। ক্ষণিকার ওপরের ঘরে চায়ের আসর বসেছে—ক্ষণিকা তাপস ও চক্রবর্তী সাহেব ব্রেকফাস্ট শেষ করবার আগেই সমীদ এসে হাজির।

চক্রবর্তী সাহেব বললেন, ভালই হল তোমরা সবাই আছ, আজই ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করে ফেলতে চাই।

—কিসের ব্যবস্থা বাবা? বেশ একটু অবাক হয়েই ক্ষণিকা বলে।

চক্রবর্তী—এভাবে তোমাদের বিবাহিত জীবন চলতে পারে না মা, চলা উচিতও নয়। তোমাদের জীবনে আমি একটা মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি। এ বাধা দূর করতে না পারলে তোমরাও সুখী হতে পারবে না—আমিও না। তাই আমি ঠিক করেছি বাড়ি টাকাকড়ি সব তোমাদের উইল করে দিয়ে –

বাধা দিয়ে ধরা গলায় ক্ষণিকা বলে, তুমি জান এসব কথায় আমি ব্যথা পাই। বাবা মা বলতে আমার সবই তুমি। আজ নিজের ব্যক্তিগত সুখটাকেই বড় করে যদি তোমায় অবহেলা করি সে যে আমার কত বড় শাস্তি হবে, তা কি তুমি বোঝ না বাবা?

—বুঝি মা, কিন্তু সত্যি যেটা, সেটাকেই বা অস্বীকার করবো কেন? যুক্তি বলে। আমার শেষ বন্ধন ছিলে তুমি। তোমার একটা ভাল ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমার চিন্তার অবধি ছিল না। আজ ভগবান্

যখন সব ভাবনার দায় থেকে মুক্তি দিলেন তখন তোমরা আর আমায় পিছু ডেক না। এইবার আমি বেরিয়ে পড়তে চাই দেশ ভ্রমণে। গুরুদেবেরও সেই আদেশ।

তিন জনেই চমকে চায় চক্রবর্তী সাহেবের দিকে।

ক্ষণিকা—তোমার গুরুদেব? কই তাঁর কথা ত কোনও দিন বলনি বাবা?

—বলতে নিষেধ ছিল মা। আমার গুরুদেব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আজ সংক্ষেপে বোলবো তোমাদের, বুঝতে পারবে কত বড় জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত লোক তিনি।

টি-পটে করে চা নিয়ে এল সুনীল। চা করতে করতে ক্ষণিকা বললে,—কোনও দিন তোমায় তীর্থ ভ্রমণ বা সাধু সঙ্গ করতে দেখিনি বা শুনিনি—এ গুরুদেবকে তুমি পেলে কোথায়?

—প্যারিসে! শুনে তোমরা একটু আশ্চর্যই হবে, আমিও হয়েছিলাম। বিলেতে ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দিয়ে দেশে ফেরবার তোড়জোড় করছি আমরা পাঁচ-ছটি ছেলে—সেন ধরে বসল, প্যারিস হয়ে তারপর দেশে ফেরা হবে। অরবিন্দ সেন কলকাতার নাম করা বংশের ছেলে, বাপের নাম বললে তোমরা চিনবে। ওর বাবা ছিলেন বিখ্যাত কবিরাজ হরবিলাস সেন। অঢেল পয়সা। সেন বললে, দুবার ইচ্ছে করেই পরীক্ষা দিইনি শুধু পাস করলেই দেশে ফিরতে হবে, এই ভয়ে। প্রতি বছর একবার করে প্যারিস ঘুরে না এলে আমার মনে হয় বিলেতে আসাই বৃথা। জুন ইন প্যারিস, আঃ লাভলি!

সবাই মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগলাম। সেন বললে,—এবার দেশে না ফিরলে আর উপায় নেই—বাবা টাকা পাঠান বন্ধ করে দেবে ভয় দেখিয়েছে। সুতরাং—ফেয়ার ওয়েল টু প্যারিস না করে দেশে ফেরা অসম্ভব।

লোভ কৌতূহল দুটোই ছিল। তাছাড়া লণ্ডনে এসে দুবচ্ছর

কাটিয়ে প্যারিসটা না ঘুরে গেলে সত্যিই একটা আফসোস থেকে যায়। সবাই মিলে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়লাম। রীজ হোটেল ছিল তখনকার দিনের সব চেয়ে ফ্যাসানেবল্ হোটেল। সেইখানে আস্তানা নিলাম। প্যারিসের পথ ঘাট হোটেল রেস্তরাঁ সব সেনের নখদর্পণে।

বিকেল বেলা আমাদের নিয়ে তুললো যকি (Jockey)তে। প্যারিসের প্রসিদ্ধ রাস্তা বুলেভার্ড মণ্টপারনেসি (Boulevard Montparnasse)র উপরে ছোট খাটো হোটেল। সেন বললে, বিশেষ জানাশুনা না থাকলে এখানে সবাই প্রবেশাধিকার পায় না। এই হোটেলের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—নাম করা আর্টিস্ট, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এদের সমাবেশ।

আমরা যখন পৌঁছলাম 'যকি' তখন প্রায় জনশূন্য। কয়েকজন ভিন জাতীয় খদ্দের বিক্ষিপ্ত টেবিলে বসে মদ্যপান করছে। মনে মনে বেশ দমে গেলাম। সেন বললে, একটু ধৈর্য ধর, সন্ধ্যাটা হয়ে যেতে দাও। সত্যিই তাই, সন্ধ্যার পর থেকে দু'একজন করে লোক আসতে আসতে এক ঘণ্টার মধ্যে ঘরে আর তিল ধারণের ঠাঁই রইল না। এ রকম বিভিন্ন জাতের একত্র সমাবেশ কদাচিৎ কোথাও দেখা যায়। অবাক হয়ে দেখছি, সেন বললে, একটু স্যাম্পেন চলবে? হেসে বললাম, ওটা না চালিয়েও যখন এতদিন চলে গেছে তখন আমার ওপর দিয়ে আর ওটা নাই বা চালালে।

সাম্পেনের বদলে এক পেয়ালা কফি খেলাম।

হঠাৎ দেখি হৈ হল্লা থামিয়ে সবাই সাগ্রহে দরজার দিকে চাইছে। ব্যাপার কি? একটু পরেই দেখি এক বিরাট পুরুষ—গেরুয়া রঙের সিল্কের আলখাল্লা পরে এক রাশ কালো বাবরি চুলের ওপর গেরুয়া পাগড়ি মাথায়—স্লিপার পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। টুকটুকে ফর্সা রং—দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামান—দীর্ঘ আয়ত চোখে

অভিজ্ঞ চাহনি। শান্ত সৌম্য মূর্তি—দেখলে ভক্তি হয়। সেন টেবিলে ঝুঁকে ফিস ফিস করে বললে,—অচলানন্দ স্বামী, আট দশটা ভাষায় অনর্গল কথা কইতে পারেন—অদ্ভুত লোক।

হোটেলের মালিক বা ম্যানেজার আর দু'তিনটি বয় ছুটে এসে পরম সমাদরে কোণের দিকে একটা টেবিল খালি করে বসাল। কসমোপলিটন হোটেল। বয়গুলো কেউ জার্মান কেউ ইতালিয়ান আবার ফ্রেঞ্চ ও ইংলিস ম্যানও আছে। দেখলাম অচলানন্দ এখানে সবাই-এর বিশেষ পরিচিত। যথারীতি কুশল প্রশ্নাদির পর মেনু কার্ড নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে হাত দিয়ে দেখিয়ে একটা ডিসের অর্ডার দিলেন। সেন বললে, ভেজিটেবল ডিস, উনি মাছ মাংস খান না। কেমন হাসি পেল আমার। প্যারিসে এসে একটা মাতালের আড্ডায় ঢুকে নিরামিষ খাওয়া! বেশ শৌখিন ও রসিক সন্ন্যাসী তো!

হলের অপর পাশে দুজন খদ্দেরের মধ্যে তর্ক বেধে গেছে, চিৎকার গণ্ডগোল, শেষে হাতাহাতি হবার যোগাড়। হাউ হাউ করে কি-সব বলছে ওরা, এক বর্ণও বুঝতে পারি না। অগতির গতি সেনের মনি চাইলাম। সেন বললে, এক ব্যাটা জার্মান অন্য লোকটা ফরাসী। দাঁড়াও ব্যাপারটা জেনে আসছি।

হেডবয়ের সঙ্গে একটুখানি কথাবার্তা কয়েই ফিরে এল সেন, বললে, ভারি মজা হয়েছে। ফরাসীটা বলছে কোনও মদেই স্বামীজীর নেশা হয় না—জার্মানটা কিছুতেই মানবে না। বলে, মদে নেশা হয় না? এ কথা মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারবো না। শেষকালে বাজী—হাজার ফ্রাঙ্ক। যে হারবে সে অপরকে হাজার ফ্রাঙ্ক আর মদের দাম দেবে। একটু চুপ করে দেখ না—ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে।

হলও তাই। একটু পরেই দুজনে উঠে এসে স্বামীজীর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে কি সব বলতে লাগল। প্রসন্ন হাসিতে

ছুজনের দিকে চেয়ে হাত ইশারায় বসতে বললেন। সমস্ত হলটা নিস্তব্ধ, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাকিয়ে আছে স্বামীজীর টেবিলের দিকে।

সীট ছেড়ে সবাই স্বামীজীর টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বুঝতেও পারি না কিছু, দেখতেও পাই না। উৎকণ্ঠায় উস খুস করতে থাকি, দেখি এরই মধ্যে কখন সেন উঠে চলে গেছে স্বামীজীর টেবিলের কাছে। ধৈর্য ধরে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল আমার পক্ষে। আস্তে আস্তে উঠে সবার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দেখলাম জার্মানটা উত্তেজিত ভাবে ভিতরের পকেট থেকে এক বাণ্ডিল ফরাসীনোট বার করে গুণে, কতকগুলো টেবিলের ওপর রাখলে। ফরাসীলোকটাও পকেট থেকে টাকা বার করে রেখে দিলে টেবিলের পাশে।

চা শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ ; খালি পেয়ালা হাতে করে ক্ষণিকা বো'াপস সমীদ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিল এই বিচিত্র অসাধারণ কাহিনী।

দাও' নড়ে চড়ে চেয়ারটায় পা ছুটো তুলে বাবু হয়ে বসে শুরু করলেন আসং ার্তী সাহেব। ছুপাশে নোটের বাণ্ডিলগুলো দেখে নিয়ে পরিষ্কার এ রব াসীতে স্বামীজী কি যেন বললেন। সমবেত দর্শক আনন্দে সমর্থন অব'ানিয়ে করতালি দিয়ে উঠল। আমার ঠিক সামনেই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভয়ে ভয়ে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে,—উনি কি বললেন দয়া করে বলবেন ?

ভাগ্য ভাল আমার, ভদ্রলোক ইংরেজ, হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি বুঝি ফ্রেঞ্চ একদম বোঝেন না ?

বললাম,—না।

ভদ্রলোক বললেন,—স্বামীজী ওদের ছুজনকে উদ্দেশ করে বললেন,—আমার শরীরের ওপর অমানুষিক একটা এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে বাজী জিতে টাকা পকেটে করে বাড়ি যাবে, সেটি হবে না।

যেই জিতুক,—টাকা জমা থাকবে এই হোটেলের ম্যানেজারের কাছে। আমি এদের খাতায় লিখে রেখে যাব, ভবিষ্যতে আমার স্বদেশী ইণ্ডিয়ান যদি কখনও পয়সার অভাবে এখানে বিপদে পড়ে। ঐ টাকা থেকে তার বিল মিটিয়ে দেওয়া হবে। এই শর্তে যদি তোমরা রাজি থাক তাহলে ম্যাজিক আমি দেখাতে পারি।

দেখলাম ওরা দুজনেই রাজি হয়ে ঘাড় নাড়ছে। স্বামীজী জার্মানটার দিকে ফিরে জার্মানীতে বললেন,—তুমিই অর্ডার কর।

চোখের নিমিষে এক বোতল কনিয়াক ব্রাণ্ডি ও একটা গ্লাস এনে রাখল বয় টেবিলের ওপর। বোতলের ছিপি খুলে ওদের দুজনকে পরীক্ষা করে দেখতে বললে বয়। একবার নাকের কাছে নিয়েই মুখ বিকৃত করে ওরা বললে—ঠিক আছে।

দেখলাম কৌতুকে স্বামীজীর চোখ দুটো হাসছে। বোতল থেকে আধ গ্লাসের ওপর ব্রাণ্ডি ঢেলে—গ্লাসটা হাতে করে দুমিনিট চোখ বুজে বসে রইলেন। বোধ হয় ইষ্টদেবকে নিবেদন করলেন। তারপর ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে গ্লাসটি খালি করে টেবিলের উপর রাখলেন। মানুষ যেমন তৃষ্ণা পেলে জল খায়—ঠিক তেমনি আনায়াস ভঙ্গিতে। শুনেছি কনিয়াক ফ্রান্সের সব চেয়ে নাম করা কড়া ব্রাণ্ডি। নীট কনিয়াক আধ গ্লাসের ওপর এক নিঃশ্বাসে খেতে কাউকে দেখিওনি—শুনিওনি কখনো। কয়েক মিনিট বাদে আবার ঢেলে নিলেন গ্লাসে, প্রায় এক গ্লাস—চোখের নিমিষে তাও শেষ হয়ে গেল। অবশিষ্ট খানিকটা মাত্র আছে বোতলে। চারদিকে তখন মৃদু গুঞ্জন উঠেছে।

বোতলটা গ্লাসের ওপর উপুড় করে ঢেলে স্বামীজী বললেন,—এনিথিং মোর? জার্মানটা উঠে দাঁড়িয়ে একবোতল রমের (Rum) অর্ডার দিলে। শুনেছিলাম রম রেসের আগে ঘোড়াকে খাওয়ায়। যুদ্ধক্ষেত্রে পরিখার মধ্যে যখন শীতে সৈন্যদের দাঁতে দাঁত লেগে যায়,

হাড়ের ভিতর কাঁপুনি ধরে তখন খানিকটা রম খেয়ে নেয়। অজ্ঞান্তে শিউরে উঠলাম। আরও আধ ঘণ্টার মধ্যে রমের বোতল শেষ। তারপর এল স্কচ্‌ হুইস্কি, জিন্‌ -সব ড্রিংক্স এক সঙ্গে মিশিয়ে মদের জগা খিচুড়ি ককটেল।

চেয়ে দেখি জার্মানটা ঘেমে উঠেছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে বাব বার চোখ মুখ মুছছে, টেবিলেব অপর ধারে বিজয় গর্বে ফ্রেঞ্চ ম্যানটা একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে হাসছে।

হঠাৎ জার্মানটা চেয়ার থেকে উঠে স্বামীজীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, আমি পরাজয় স্বীকার করছি। তারপর কোনও দিকে না চেয়ে সটান দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পানোন্মত্ত জনতা এক সঙ্গে চীৎকার করে হাত তালি দিয়ে উঠল।

বয় এসে টেবিলে স্বামীজীর ভেজিটেবল ডিস রেখে গেল। ম্যানেজারকে ডেকে টাকাটা তার হাতে দিয়ে—একটা মোটা খাতায় কি সব লিখে—খেতে শুরু করলেন স্বামীজী।

সম্বিৎ ফিরে এল। এতক্ষণ যেন বায়োস্কোপ দেখছিলাম।

সেন বললে, বছরে ছ'মাস স্বামীজী অজ্ঞাতবাস করেন, কোথায় থাকেন কেউ বলতে পারে না। আর বাকী ছ'মাস এদেশ সেদেশ ঘুরে বেড়ান।

সুনীল এসে বললে,—সুমিতাদি ফোন করছে হোস্টেল থেকে কণাদি। লাফিয়ে উঠে বললে ক্ষণিকা, ভালই হয়েছে, ওকেও দুপুরে খাবার নেমন্তন্ন করি। আজকের রবিবারের আড্ডা আমাদের সরগরম হয়ে উঠবে। আজ শুধু বাবার বিলেতের গল্প শুনবো। এখনি আসছি আমি। আমি এলে তারপর তোমার স্বামীজীর কাহিনী শুরু কোরো বাবা!

চক্রবর্তী সাহেব বললেন,—তারপর সুমীদ! প্রফেসারি লাগছে কেমন?

সমীদ,—মন্দ কি—সময়টা বেশ কেটে যায়।

তাপস বললে,—তুই তবুও সময় কাটাবার একটা রাস্তা পেয়েছিস। আমি কি করবো ভাবছি। ও সব মাস্টারি-টাস্টারি আমার ধাতে সইবে না। ভাবছিলাম একটা ব্যবসা-ট্যাবসা করলে কেমন হয়? আপনি কি বলেন?

চক্রবর্তী—কি রকম ব্যবসা?

—এই ধরুণ অর্ডার সাপ্লাই! আমার বৈমাত্র ভাই বিমলকে আপনি দেখেননি। ম্যাট্রিক পাস করে আর পড়েনি। মামার সঙ্গে অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজে ঢুকে পড়ে। অনেকগুলো টাকা লোকসান দিয়ে ব্যবসা তুলে দিলেন মামা। সেই থেকে বিমল বেকার। বাড়িতেও ভাই ভাই আলাদা—ওর অংশে বাড়ি ছাড়া নগদ টাকাকড়ি কিছু নেই। আজ কয়েক মাস ধরে বলছে আমায়—দাদা তুমি শুধু অফিসে বসে থেকে টাকাকড়ি আর মাল ঠিক মত ডেলিভারি হল কি না দেখে যাও। আর সব ভার আমার। অর্ডার সিকিওর করা, সস্তাদামে মাল কেনা, ডেলিভারি দেওয়া সব চোখ বুজে আমার ওপর ছেড়ে দাও। ছ'মাসের মধ্যে তোমায় আমি দেখিয়ে দেব—সেণ্ট পারসেণ্ট লাভ। ডাল-হাউসিতে একটা ঘরও প্রায় ঠিক করে ফেলেছে বিমল।

চক্রবর্তী সাহেব বললেন, এতদূর যখন এগিয়ে গেছ এ্যাডভাইস দেওয়া বৃথা। তবুও আমার মনে হয়—যে ব্যবসায় নিজের প্রত্যক্ষ কোনও অভিজ্ঞতা নেই ষোল আনাই যেখানে পরের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে—তাতে যোগ না দেওয়াই ভাল। তুমি কি বল সমীদ?

সমীদ,—আমি এসব ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ। তাছাড়া তাপসের কাছে ওদেয় বাড়ির ইতিহাস যা শুনেছি তাতে ওদের সঙ্গে কোনও রকম সংশ্রব না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ক্ষণিকা বললে, সুমিতা আসছে বাবা। আমায় কিজন্য ডাকছিল জান? আজ ওদের হোস্টেলে কি একটা

মিটিং, তাতে আমায় সভানেত্রী হতে বলে। প্রথমে রাজি হইনি। কিন্তু আরও দুতিনটি মেয়ে ধরে বসল বললে, সবার বিশেষ ইচ্ছা অগত্যা রাজি হতে হল। তবে একটা কনডিশান করে নিয়েছি সুমিতার সঙ্গে, আজ সারা দুপুর আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে এখানে খাওয়া দাওয়া করে বিকেলে এক সঙ্গে সভায় যাব। ছুতোয় নাতায় কাটাবার চেষ্টা করেছিল অনেক, কিন্তু আমি নছোড়বান্দা -শেষে রাজি হয়েছে। বৌবাজারে ওদের হেড মিস্ট্রেস গেছেন তাঁর বাবার কাছে দুতিন দিনের ছুটি নিয়ে। তাকে মিটিং-এর খবরটা দিয়ে সোজা চলে আসছে এখানে। এইবার বল বাবা। তোমার স্বামীজীর ভেজিটেবল ডিস এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে নিশ্চয়।

একটু হেসে চক্রবর্তী সাহেব আরম্ভ করলেন। ঘরসুদ্ধ লোক এই অলৌকিক ব্যাপার দেখে ভিড় করে অজস্র প্রশংসা ও কন-গ্রাচুলেশন জানিয়ে যে যার সীটে গিয়ে বসে খানা পিনা শুরু করে দিল। আমাদের টেবিলেও দেখি সেন ও আমার আর আর সঙ্গীরা আর এক বোতল স্যাম্পেন খুলে খেতে আরম্ভ করেছে। সবার আলোচনার বিষয় বস্তু হল স্বামীজী। স্বামীজীর খাওয়াও শেষ হয়ে গিয়েছিল—বিল মিটিয়ে দিচ্ছেন দেখে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ওঁর টেবিলের সামনে দাঁড়ালাম। মিনিট খানেক আমার দিকে চেয়ে বাংলায় বললেন,—বাঙালী? বোস।

পাশের খালি চেয়ারটায় চুপ করে বসলাম।

স্বামীজী হেসে বললেন, ম্যাজিক শিখতে এসেছ?

বললাম, না। আপনার সঙ্গে একটু নিভৃতে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। আবার মিনিট খানেক আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন স্বামীজী তারপর বললেন--কাল সকাল দশটা থেকে বারোটার মধ্যে আমার বাসায় এস। পরশু আমি এখান থেকে চলে যাব।

বললাম, আপনার ঠিকানাটা—

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে আলখাল্লার বুক পকেট থেকে ফাউন্টেন পেন নিয়ে ঠিকানা লিখে আমার হাতে দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

পরদিন সকালে কাগজখানা সেনের হাতে দিয়ে রাস্তাটা কোথায় জিজ্ঞাসা করলাম।

দেখলাম বেশ বিপদে পড়ে গেছে সেন। আমার কাছে সবজান্তা ভান করে চিনি না বলতেও মর্যাদায় বাধে। ভুরু কুঁচকে তিন-চার বার অনুচ্চস্বরে আউড়ে গেল রাস্তাটার নাম। ১১৭ নম্বর প্লেস ডি লা ব্যাসটিলি (Place De la Bastille) রুম নম্বর ৩৩, থার্ড ফ্লোর, একটু পরেই অকূলে কূল পেয়ে বললে সেন, সব চেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা হল—তুমি হোটেল থেকে একটা জানা ট্যাক্সি নিয়ে যাও—ঠিকানায় পৌঁছে ওকে রেখে দিও। স্বামীজীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনা শেষ করে আবার ওতেই ফিরে আসবে। ট্যাক্সির ব্যবস্থা তখনই করে দিল সেন।

ঠিক দশটার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম স্বামীজীর ঠিকানায়। পুরোনো সেকেলে বাড়ি, এককালে অভিজাত বংশের লোকের বাস ছিল। লিফ্‌ট নেই, সিঁড়ি ভেঙে চার তলায় পৌঁছলাম বাঁ দিকের চওড়া করিডরের শেষ প্রান্তে ৩৩ নং ঘর। দরজায় ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে স্বামীজীর গলা পেলাম—কাম ইন।

দরজা ভেজানই ছিল—একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। অত বড় ঘরে কোনও ফারনিচার নেই—মাঝখানে একটা কম্বলের বিছানায় বসে স্বামীজী কি একটা মোটা বই পড়ছিলেন। আমার দিকে না চেয়েই বললেন, এস পঙ্কজ, তোমারই প্রতীক্ষা করছিলাম।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। উনি আমার নাম জানলেন কি করে?

মনের কথা বুঝতে পেরেই বোধ হয় স্বামীজী বললেন, বেশ

অবাক হয়ে গেছ, না? এটা কিন্তু ম্যাজিকও নয় — অলৌকিক কোনও যোগবলও নয় সিম্পল ডিডাকসন, মাই ডিয়ার ওয়াটসন্‌। কাল যখন আমার টেবিলে এসে বসেছিলে তখন তোমার হাতের ঐ আংটিটার ওপর আমার নজর পড়েছিল—ওতে লেখা আছে ছোট্ট দুটি কথা—'পঙ্কজ মিনতি'। মিনতি তোমার স্ত্রীর নাম আর বিয়ের অল্প দিন পরেই বিলেতে এসেছ এটা বুঝতেও কষ্ট হয় না। বোসো—

কম্বলের এক পাশে জড়সড় হয়ে বসলাম।

ভয়ে ভয়ে বললাম—অভয় দেন তো একটা কথা নিবেদন করি।

হেসে স্বামীজী বললেন—নির্ভয়ে বলতে পার, যদিও জানি কি তোমার জিজ্ঞাস্য।

বললাম, সমুদ্র মন্থনের বিষ আকণ্ঠ পান করে মহাদেবের নাম নীলকণ্ঠ। পুরাণের কথা, বিশেষ করে দেবদেবীর কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু এই অবিশ্বাসী বিংশ শতাব্দীতে বিলাসের রাজধানী প্যারিস নগরীতে কাল আপনি অতগুলো বিষ হজম করলেন কি করে?

—তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। তবুও সংক্ষেপে একটু আভাষ দিচ্ছি। ভগবৎ প্রেমের নেশায় মানুষ যখন বুঁদ হয়ে যায়, পার্থিব নেশা তখন তার নাগাল পায় না। কঠোর সাধনা ইচ্ছা-শক্তি ও যোগবল—এগুলো দিয়েই ওটা সম্ভব হয়।

—আর একটি প্রশ্ন, অনেকদিন থেকেই একটা চিন্তা মনকে বিচলিত করে তোলে কিন্তু তার সদুত্তর আজও পাইনি। মৃত্যুর পর ইহলোকের সঙ্গে সব সম্পর্কে কি শেষ হয়ে যায়, না যোগ সূত্র একটা থেকেই যায়?

স্বামীজী বললেন—নিশ্চই থাকে, আত্মা অবিনশ্বর,—তাহলে প্রত্যহ যে অগুণতি লোক মরছে, এদের আত্মাগুলো যায় কোথায়? জন্ম মৃত্যুটা কি জান? শুধু খোলস পালটে আসা। ধর তুমি ও

তোমার স্ত্রী নিচে একতলায় থাক দোতলায় ছোট্ট একটি ঘর, সেখানে থাকে তোমাদের পোশাক পরিচ্ছদ, প্রসাধন সামগ্রী। হঠাৎ একদিন স্ত্রী বললেন, চল আজ সিনেমা দেখে আসা যাক, তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি কাপড় চোপড় বদলে তৈরি হয়ে আসি। কিছুক্ষণ বাদে স্ত্রী যখন সাজ সজ্জা করে নামলেন তখন তুমি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছ, একেবারে চেনবার উপায় নেই। মৃত্যুটাও তাই খোলস পালটে যখন এলো -কেউ আর চিনতে পারছে না।

বললাম, আমায় আপনি দীক্ষা দিন। হাত বাড়িয়ে পা ছুটো ধরতে গেলাম। চকিতে পা সরিয়ে নিয়ে স্বামীজী বললেন, পাগল আর কাকে বলে! ভগবানে মনপ্রাণ সঁপে দেবে কি করে? তোমার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে বসে আছেন তোমার স্ত্রী মিনতি। চেষ্টা করলেও পারবে না। সব বন্ধন মুক্ত হয়ে যেদিন শুধু ভগবানে নিজেকে সমর্পণ করতে পারবে বলে মনে হবে সেই দিন এস দীক্ষা দেব।

—যদি সত্যিই তেমন দিন আসে, কোথায় আপনার দেখা পাব? একটুকরো কাগজে লণ্ডনের একটা নাম করা ব্যাঙ্কের ঠিকানা লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন, যেখানেই থাকি, এদের কাছে আমার ঠিকানা পাবে।

শিয়রে ঝুঁকে হাত ঘড়িটা দেখে বললেন, সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। তোমার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা কইতে পারতাম কিন্তু উপায় নেই। বারোটার সময় ছুজন জার্মান বৈজ্ঞানিক আসবেন আমার কাছে।

জোড় হাতে মাথা ঠুকে প্রণাম করে উঠে চলে আসছি, স্বামীজী বললেন, সংসারে থেকেও মানুষ অনেক কিছু করতে পারে। মূল মন্ত্র হচ্ছে বিশ্বাস। তর্ক করে যুক্তি দেখিয়ে কোনও দিন ভগবানের নাগাল পাওয়া যায় না। বিশ্বাস আর ঐকান্তিক কামনায় মানুষ সব কিছুই পেতে পারে, তবে ডাকার মত ডাকতে পারা চাই।

চলে এলাম হোটেলে। এই হল আমার গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎকার।

অভিমান-ক্ষুণ্ন কণ্ঠে ক্ষণিকা বললে, এসব কথা এতদিন তুমি আমায় বলনি কেন বাবা ?

চক্রবর্তী সাহেব হেসে ক্ষণিকার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন - বললে তুমি বিয়ে করতে না, তাও কি আমি জানিনে মা ?

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত থমথমে মুখে শূন্যে দৃষ্টি মেলে ক্ষণিকা বলে যায় —আজ বুঝতে পারছি, মায়ের মৃত্যুর পর গভীর রাতে দরজা বন্ধ করে তোমার রহস্যময় আচরণের কারণ।

—হ্যাঁ মা। ভগবান পর্যন্ত পৌঁছুতে পারিনি কিন্তু দেখলাম ইহলোকের প্রিয় সঙ্গী পরলোকে গিয়ে সমস্ত সম্পর্ক নিঃশেষে মুছে ফেলে দিতে পারে না। ডাকলে না এসে থাকতে পারে না সে।

জলে ভরে উঠেছে দুচোখ। তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলে মুছে নিযে নিজেকে সামলে নিল ক্ষণিকা। উঠে গিয়ে চক্রবর্তী সাহেবের চেয়ারের হাতলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরে বললে, আমারই ভুল হয়েছে বাবা! আর আমি তোমায় বাধা দেব না। যাও তুমি তোমার অভীপ্সি পথে। তবে যাবার আগে আমার কয়েকটা আবদার তোমাকে পূরণ করে যেতে হবে।

সস্নেহে কাছে টেনে চক্রবতী সাহেব বললেন, কি আবদার মা!

—প্রথম কথা এই বাড়ি তুমি আমাদের দিতে পারবে না - এটা দিতে হবে দান পত্র করে দুঃস্থ অসহায় মেয়েদের ভদ্র ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকবার একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার জন্যে। পল্টুর মায়ের মত কত শত শত অসহায় মেয়ে তিলে তিলে অনাহারে মৃত্যু বরণ করছে-- কটা লোক তার হিসেব রাখে ? এখানে হবে 'মিনতি নারী-কল্যাণ আশ্রম।' আমার দ্বিতীয় কথা—টাকা কড়ি কিছুই আমাদের দেবে না— তোমার দেশ ভ্রমণের খরচা বাবদ একটা মোটা টাকা ব্যাঙ্কে

রেখে বাকীটা সব ট্রাস্টির হাতে উইল করে দিয়ে যাবে। সেই টাকা দিয়ে 'মিনতি নারী-কল্যাণ আশ্রম' চলবে।

সমীদ ও তাপস তুজনেই ক্ষণিকার কথায় আন্তরিক সমর্থন জানাল।

চক্রবর্তী সাহেব, বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে মা। আমি যত শীঘ্র পারি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে সুনীল বললে, সমীদদা—মেডিকেল কলেজের এমারজেন্সি ওয়ার্ড থেকে এই মাত্র ফোন করে জানালে, সুমিতাদি মোটর চাপা পড়েছে।

॥ তের ॥

হঠাৎ কি থেকে যে কী হয়ে গেল, প্রত্যক্ষদর্শীরাও ঠিক বলতে পারবে না। শ্যামবাজারের দিক থেকে যাত্রী বোঝাই ডবল ডেকার বাসটা বৌবাজারেব মোড়ের একটু আগে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থেমে আবার বেশ জোরে চলতে শুরু করে। এরই মধ্যে এই অঘটন। হৈ হট্টগোলের মধ্যে একটু গিয়েই বাসটা থেমে যেতেই দেখা গেল, রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি তরুণী মেয়ে। হাত দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড দামী প্রাইভেট গাড়ি। চোখের নিমেষে গাড়ি থেকে নেমে এসে ড্রাইভার পাঁজাকোলা করে মেয়েটিকে তুলল নিজের গাড়িতে তারপর মোড় থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে ফুল স্পীডে চালিয়ে ঢুকে পড়ল মেডিকেল কলেজের মেন গেটের মধ্যে।

চক্রবর্তী সাহেব ক্ষণিকা তাপস ও সমীদ যখন মেডিকেল কলেজে পৌঁছুল তখন এমারজেন্সি ওয়ার্ডের চওড়া বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল অরুণাংশু।

তাপস থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার? তুমি এখন এখানে?

—সুমিতা দেবী আমার মোটরেই চাপা পড়েছেন। ভুল বললাম, আমিই চাপা দিয়েছি।

বিস্ময়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল তাপসের— বললে, আইসি।

পিছনে চেয়ে দেখে চক্রবর্তী সাহেব ক্ষণিকা ও সমীদ বাঁ দিকের একটা ঘরে ঢুকে অ্যাটেণ্ডিং সার্জেনের সঙ্গে কথা কইছেন।

মুখ ফিরিয়ে দেখে ঠায় তেমনি চেয়ে আছে অরুণাংশু। তাপস বললে, কি হয়েছিল?

অরুণ—বাসটা প্রথম যেখানে থেমেছিল—সেটা স্টপেজ নয়,

সামনে একটা গরু পড়ায় কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে বাসটাকে থামতে হয়, সেই অবসরে সুমিতা দেবী নামতে গিয়েছিলেন। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বাস ছেড়ে দিতেই—টাল সামলাতে না পেরে উনি মুখ থুবড়ে পড়েন রাস্তার উপর। ঠিক পিছনে ছিলাম আমি—এ রকম একটা দুর্ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। ব্রেক কষে গাড়ি যখন থামালাম তখন টু লেট। ওঁর ডান পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে গেছে।

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চক্রবর্তী সাহেব বললেন, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল বলে মরফিয়া ইনজেকসন করেছে। এক্স-রে আজই করা হবে। ওঁরা বলছেন মেজর ফ্রাকচার বলেই মনে হচ্ছে, এক্স-রে প্লেট না দেখে সঠিক কিছুই বলতে পারবেন না।

ক্ষণিকা বললে, আমি সুমিতার কাছে থেকে যাই বাবা, তোমরা বাড়ি যাও।

চক্রবর্তী সাহেব বললেন, এখন থাকা না থাকা সমান। অজ্ঞান বেহুঁশ হয়ে আছে। পরে যদি দরকার হয় তুমি থেকো।

তাই ঠিক হল। যেতে গিয়ে থেমে দাঁড়িয়ে তাপস বললে, তোমার কাজ তো শেষ হয়ে গেছে অরুণ, এখানে থেকে আর কষ্ট পাও কেন—বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দাও।

বিস্ফারিত লাল চোখ দুটো দিয়ে যেন অগ্নিবৃষ্টি করতে চায় অরুণ। কষ্টে সামলে নিয়ে শুধু বলল, ধন্যবাদ।

বেলা চারটে নাগাদ জ্ঞান হলো সুমিতার। অসহ্য যন্ত্রণা, সেই সঙ্গে পিপাসা। নার্স একটা ডাব কেটে একটু একটু করে ফিডিং কাপে করে খাইয়ে দিতে লাগল। খবর পেয়ে হাউস সার্জেন এসে একটা ইনজেকসন দিয়ে বলে গেল—পাঁচটার সময় এক্স-রে করা হবে।

কাতরানির আওয়াজ পেয়ে ঘরে ঢুকে শুকনো পাংশুমুখে এক কোণে এসে দাঁড়াল অরুণ। চোখে চোখ পড়তেই জোর করে হাসবার

চেষ্টা করল যেন সুমিতা—পরক্ষণেই যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত ক'রে চোখ বুজে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ভয়ে ভয়ে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল অরুণ। চোখ মেলে হাত ইশারায় কাছে ডাকল সুমিতা। মাথার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল অরুণ।

সুমিতা বললে, কখন এলেন?

অরুণ—অনেকক্ষণ।

—সেই সকাল থেকে বাড়ি না গিয়ে এখানেই রয়েছেন? কেন?

—কেনর জবাব দিতে না পেরে মুখ নিচু করে থাকে অরুণ!

সুমিতা—ক্ষণিকাদি সমীদদা এঁরা এসেছিলেন?

—হ্যাঁ। জ্ঞান হলে ফোন করতে বলে গেছেন। খবর দেব ওঁদের?

—না থাক।

দুর্বল দেহে কথা কইতে কষ্ট হয়, তেষ্টাও পায়- হাঁফিয়ে ওঠে সুমিতা। নার্স তাড়াতাড়ি ফিডিং কাপটা মুখের কাছে ধরে বলে—ডাক্তার আপনাকে কথা কইতে মানা করে গেছেন। কথাটা সুমিতার কানে গেল কি না ঠিক বোঝা গেল না। জল খেয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজে চুপ করে রইল সুমিতা। একটু পরে অস্ফুট স্বরে বললে, এবার আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যান। যদি মরেও যাই—আপনার নামে গাড়ি চাপা দেওয়ার অভিযোগ আমি আনবো না।

এক ফোঁটা জল চোখের কোণ বেয়ে বালিশের ওপর গড়িয়ে পড়ল।

অরুণের মনে হল আঘাত, শুধু নির্মম আঘাত দিয়েই আনন্দ পেতে চায় মেয়েটা। কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে ধরা গলায় অরুণ বলে, অমানুষ, অপদার্থ আমি, এতে কোনও ভুল নেই কিন্তু সত্যি বিশ্বাস করুন—

কথা শেষ করতে পারে না অরুণ, কে যেন দুহাতে গলাটা টিপে ধরেছে।

অরুণের উদ্দেশে বাঁ হাতখানা মাথার দিকে বাড়িয়ে দেয় সুস্মিতা। পরম আগ্রহে দু'হাত দিয়ে হাতখানা ধরে মুখটা তার ওপর চেপে ধরে অরুণ।

দুষ্টু হাসিতে চোখ দুটো বড় হয়ে যায়। ওদের অজান্তে পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় নার্স।

দুপুরের আড্ডা মোটেই জমল না। সুমিতার কথা আলোচনা করতে করতেই দুটো বাজল, তারপর কোনও রকমে খাওয়াটা শেষ হতেই সমীদ বললে, আমি চলি, যাবার পথে সুমিতার বাবা মাকে একটা জরুরি টেলিগ্রাম করে হাসপাতালে যাব।

ক্ষণিকা বললে, ওরা ফোন করুক না করুক তোমার টেলিফোন পেলেই আমরা চলে যাব।

চক্রবর্তী সাহেব বললেন,— মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল কণা মা। তোমরা কথাবার্তা কও আমি একটু জিরিয়ে নিইগে।

চক্রবর্তী সাহেব চলে গেলে সটান শুয়ে পড়ল তাপস খাটের ওপর। পাশে এসে বসে ক্ষণিকা বললে, হাসপাতাল থেকে আসবার পর থেকে লক্ষ্য করছি তুমি কেমন যেন অন্যমনস্ক, ব্যাপার কি ?

—আমি শুধু ভাবছি অরুণাংশুর কথা।

—ভাবনার কি কারণ ঘটল ?

—আমার জানা অরুণাংশুর সঙ্গে আজকের অরুণের আকাশ পাতাল তফাত।

—এই অ্যাকসিডেণ্টটায় ও খুব দমে গেছে মনে হল।

চট করে উঠে বসল তাপস—বললে, তাতেই তো মনে খটকা

লাগছে। এরকম অ্যাকসিডেণ্ট ওর কাছে ডাল ভাত, তাছাড়া নিত্যি নতুন মেয়ের পিছনে যে ঘুরে বেড়ায় তার পক্ষে এতখানি বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক মনে হয় কি ?

তখনি জবাব দেয় না ক্ষণিকা, একটু চিন্তা করে বলে, অসম্ভব চাপা মেয়ে সুমিতা। অরুণের সঙ্গে এর আগে ওর দেখা শুনো হয়েছে কি না তাও বুঝতে পারছি না।

—হাজার বার দেখা হলেও ঐ ফপিশটাকে সুমিতার মত মেয়ে প্রশ্রয় দেবে, এ আমি দেখলেও বিশ্বাস করবো না। বেশ উত্তেজিত হয়েই বলে তাপস।

—মেয়েদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান থাকলে একথা তুমি বলতে না।

—তুমি কি বলতে চাও—

বাধা দিয়ে ক্ষণিকা বলে, বলতে এখন আমি কিছুই চাইনে। আর একটা দিন দেখি - পরে বলবো।

আবার শুয়ে পড়ে তাপস। আস্তে আস্তে ক্ষণিকাকে টেনে নেয় বুকের কাছে।

অপলক চোখে চেয়ে থাকে ক্ষণিকার লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা অপরূপ সুন্দর মুখের দিকে। একটু পরে বলে, আজ একটা সত্যি কথা বলবে খণা ?

ক্ষণিকাকে নিভৃতে আদর করে ডাকে তাপস খণা বলে। ক্ষণিকা আপত্তি করায় তাপস বলেছিল, কেন ? তোমার কণিকা আর ক্ষণিকার মধ্যেই রয়েছি আমি। তা ছাড়া খণা নামের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব জড়িয়ে আছে। শুনেছি খণা ছিলেন অপরূপ রূপসী আর বিদুষী। তোমার মধ্যেও ও দুটোর কমতি আছে বলে আমি মনে করিনি। আর আপত্তি করেনি ক্ষণিকা।

ক্ষণিকা বললে,—কি কথা ?

তাপস—আমার মধ্যে কি এমন গুণ দেখতে পেয়েছিলে তুমি—যার জন্যে— সমীদকে— ।

তাপসের মুখে হাত চাপা দিয়ে বাকি কথাটা বলতে দেয় না ক্ষণিকা।

কপট রাগে দুচোখ বিস্ফারিত করে বলে, আবার সেই কথা? কতদিন তোমায় বলেছি—ওকথা আমায় জিজ্ঞাসা করো না।

হাত দিয়ে আস্তে আস্তে মুখ থেকে ক্ষণিকার হাতখানা সরিয়ে নেয় তাপস, তারপর বলে, শূন্য ঘরে একা বাসর জাগিয়ে বসেছিলাম, —রবাহূত তুমি এলে বধূবেশে, মুখ তোমার স্বপ্নের মায়া জালে বোনা অবগুণ্ঠনে ঢাকা—চোখে তোমার বিশ্বের রহস্য জড়ানো! কিন্তু কেন? এই রহস্যের যবনিকা ভেদ করে সত্যিকার তোমাকে কি আমি পাব না কোনও দিন?

ক্ষণিকা বলে, না, তোমাকে আর ঠেকান গেল না—তুমি দেখছি সত্যিই কবি হয়ে উঠলে তাপস!

—বাজে কথায় ভোলাবার চেষ্টা করো না। উত্তর দাও।

চোখে মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের ছাপ টেনে এনে ক্ষণিকা বলে,—দেখ, ঐটেই হল আমাদের ট্রাম্প কার্ড, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ওটা দেখানো নিষেধ। তাছাড়া মেয়েদের মনের চোরা অলি গলির খবরগুলো তোমরা যদি জেনেই ফেললে—তাহলে আমাদের আর রইল কি? ওর সন্ধান পাওনি বলেই আজও তোমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত মেয়েদের পিছনে ঘুরে বেড়াও, গান গাও, কবিতা লেখ, দরকার হলে বিষ খেয়েও মর— ।

বাকি কথা আর বলা হল না। বাইরে থেকে চক্রবর্তী সাহেব ডাকলেন—কণা মা! দুজনেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। ক্ষণিকা দরজা খুলে দিতেই চক্রবর্তী সাহেব বললেন,—মেডিকেল কলেজ থেকে খবর এসেছে কণা মা। সুমিতা ভালই আছে এখন, যন্ত্রণাটাও

কমেছে। চল আমরা একবার ঘুরে আসি। তুমি চট্‌ করে কাপড় চোপড় বদলে নাও। গাড়ি রেডি আছে।

এমারজেনসি ওয়ার্ডের বারান্দাতেই ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চক্রবর্তী সাহেব ও তাপসকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গেলেন এক্স-রে সম্বন্ধে আলোচনা করতে। ক্ষণিকা ঢুকে পড়ল সুমিতার ঘরে।

রক্তহীন পাণ্ডুর মুখে চোখ বুজে শুয়ে ছিল সুমিতা। পাশ থেকে টুলটা টেনে নিয়ে খাটের কাছে এনে বসে পড়ল ক্ষণিকা। কিছুক্ষণ সুমিতার দিকে চেয়ে থেকে আস্তে ডাকল, সুমিতা।

চোখ মেলে চাইল সুমিতা। ক্ষণিকাকে দেখে হাসিতে ভরে উঠল মুখখানা, বললে, কতক্ষণ এসেছ দিদি ?

—এই মাত্র। সমীদকে দেখেছিলে, সে আসেনি ?

—এসেছিলেন মাসিমাকে নিয়ে, জান ক্ষণিকাদি এখানে এসে অবধি মাসিমা খালি কেঁদেছেন—কিছুতেই থামাতে পারি না। আচ্ছা ক্ষণিকাদি তুমি বল তো কাঁদবার কী হয়েছে। এইটেই সব দিক দিয়ে ভাল হয়েছে কি না বল তো ? আমার জন্যে আর কারও চিন্তার কোনও কারণ রইল না। মাসিমার কান্না দেখে আমার খালি হাসি পাচ্ছিল। সমীদদা অনেক বুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে গেল তাই রক্ষে।

আপন খেয়ালে অনর্গল বকে যাচ্ছে মেয়েটা—চুপ করে চেয়ে বসে রইল ক্ষণিকা। সুমিতা বলছিল, জান ক্ষণিকাদি, ছেলে বেলায় খোঁড়া লোক দেখলে আমার ভীষণ হাসি পেত। অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সুরে সুর মিলিয়ে ছড়া কাটতাম—খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং, কার গোয়ালে গিয়েছিলি, কে ভেঙেছে ঠ্যাং। হাঃ হাঃ হাঃ। হঠাৎ শিশুর মত হাসতে লাগল সুমিতা। চোখে জল মুখে হাসি, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সান্ত্বনা দিয়ে ক্ষণিকা বললে, রাম না হতে রামায়ণ গাইছ কেন সুমিতা ? আজ কাল সার্জারি এত ইমপ্রুভ করেছে যে হাত পা ভাঙা একটা প্রব্লেমই নয়।

—এক্স-রে প্লেট দেখে এখানকার সার্জেনরা কি বলেছেন শোননি বলেই ঐ কথা বলছ দিদি !

—কি বলেছেন সার্জেনরা।

—বলেছেন, এমন পিকিউলিয়র ফ্রাকচার সচরাচর দেখা যায় না—হাড় জুড়ে গেলেও ডিফেক্ট থেকে যাবে। স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারবে না কোনও দিন। এক মাত্র পথ অপারেশন কিন্তু ওঁরা কোনও গ্যারাণ্টি দিতে চান না।

বাইরে বারান্দায় চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন চক্রবর্তী সাহেব ও তাপস। ডাক্তার চৌধুরী বলছিলেন, এক মাত্র উপায় অপারেশান, তাও খুব ডিফিকাল্ট। গুঁড়ো হাড়গুলো বাদ দিয়ে অন্য হাড় জুড়ে দেওয়া। এখানে ও ধরনের অপারেশন এখনও সাকসেসফুল হয়নি।

—তাহলে উপায় ? মেয়েটা খোঁড়া হয়ে থাকবে সারা জীবন ? হতাশ ভাবে বললেন চক্রবর্তী সাহেব।

ডাক্তার চৌধুরী—ভাঙা হাড়গুলোর সঙ্গে কতকগুলো নার্ভ জড়িয়ে তালগোল পাকিয়ে গেছে। সেইটেই হচ্ছে ভাবনার কথা। কয়েক বছর আগে ঠিক সিমিলার একটি অপারেশন হয়েছিল লণ্ডনে। করেছিলেন ডাক্তার জোসেপ ভন কোহেন। ইনি জার্মান ইহুদী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে লণ্ডনেই আছেন। যদি পেসেণ্টকে কোনও রকমে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া যায়—তাহলে সব চেয়ে ভাল হয়। কিন্তু সেটা অনেক টাকার ব্যাপার, আর বাই এয়ার গেলেও সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ ফিজিশিয়ান থাকা দরকার।

—টাকার ভাবনাটা দয়া করে আপনি ভাববেন না—আনুষঙ্গিক অবশ্য করণীয় আর কি করা প্রয়োজন তাই বলুন।

দুজনে চমকে ফিরে দেখেন এরই মধ্যে কখন অরুণাংশু এসে দাঁড়িয়েছে।

নার্স একটা ইনজেকসন দিয়ে টেম্পারেচার চার্টে নোট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ক্ষণিকা বললে, অরুণবাবুকে দেখছিলে, এ বেলা আসেননি বুঝি ?

--গেছেই তো প্রায় চারটের সময়। এক রকম জোর করে পাঠিয়েছি। আচ্ছা ক্ষণিকাদি এরকম কখনও দেখেছ না শুনেছ—গাড়ি চাপা দিয়ে শাস্তি পাবার জন্যে ড্রাইভারকে মাথা খুঁড়ে মরতে ? কত করে বললুম—আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যান—আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। কে শুনবে সে কথা।

ক্ষণিকা, কি বলতে চান উনি ?

—কিছুই না : খালি ফ্যাল ফেলে চাউনি মেলে চেয়ে থাকে—অপমান করে কড়া কথা বললেও যে জবাব দেয় না, চটে না,--তার সঙ্গে কী করে পেরে উঠব বলতে পার ?

চোখ বুজে কতকটা নিজের মনেই বলে যায় সুমিতা—সেই প্রথম আলাপের দিন থেকে খালি আঘাতের পর আঘাত দিয়ে আসছি—কিন্তু ও যেন রক্ত মাংসের মানুষ নয়, পাথর দিয়ে গড়া।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে সুমিতা। খপ করে ক্ষণিকার হাতখানা ধরে বলে, এই নেমক হারাম পুরুষ জাতটাকে আমি চিনতেই পারলাম না ক্ষণিকাদি।

সান্ত্বনার ভঙ্গিতে মৃদু হেসে ক্ষণিকা বলে, ওরাও আমাদের সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলে বেড়ায় সুমিতা !

য়ালে
হাসতে
ান্ত্বনা
কাল
নয়।

পাশে বসে গড়-
ধোঁয়া ছাড়তে
া দাঁড়াচ্ছে

॥ চোদ্দ ॥

রায় বাহাদুর হিরণ্যকশিপু বোস। নামের সঙ্গে চেহারার ।· পার
চেহারার সঙ্গে নামের মিল সচরাচর চোখে পড়ে না। বরং বেশিঃ
ভাগ ক্ষেত্রে উলটোটাই দেখা যায়। রায় বাহাদুরকে দেখলে মনে
হবে পুরাণে বর্ণিত হিরণ্যকশিপু চরিত্র খেয়ালি বিধাতার একটা
এক্সপেরিমেণ্ট মাত্র, সেটা পূর্ণতা লাভ করেছে এই বিংশ শতাব্দীতে
কলকাতার বুকে। দীর্ঘ লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ দেহ, প্রকাণ্ড গোল মুখ,
মাথায় ঘন কাঁচা-পাকা কোঁকড়া চুলের উশৃঙ্খল সমারোহ। প্রশস্ত
ললাট, তার নিচে ঘন লোমশ ভুরু দীর্ঘ গোলাকার চোখ দুটোকে
বৃথাই দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। চওড়া উন্নত নাকের নিচে বিরাট
কাঁচা-পাকা গোঁফ জোড়াটা রাহুর মত, পুরু ঠোঁট দুটোর বারো আনা
গ্রাস করে বসে আছে।

প্রথম দর্শনেই ভয়ে আঁতকে উঠতে হয়, কিছু সময় বাদে ভয়
মিলিয়ে যায়—আসে বিস্ময় মেশানো শ্রদ্ধা। ঘণ্টা খানেক এই অদ্ভুত
মানুষটির সান্নিধ্যে টিকে থাকতে পারলে স্থান কাল বয়েস সব ভুলে
গিয়ে এই প্রৌঢ় শিশুকে ভাল বাসতেই হবে।

আমর্হাস্ট স্ট্রীটের ওপর প্রকাণ্ড অট্টালিকা বোস ভিলার নিচের
তলায় বাইরের ঘরে ঢিলে পায়জামা ও হাতকাটা ফতুয়া পরে অস্থির
ভাবে পায়চারি করছিলেন রায় বাহাদুর হিরণ্যকশিপু বোস। দূরে
খানা চেয়ারের পিছনে ভর দিয়ে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ছিল
াংশু। পশ্চিমের দেওয়ালে দীর্ঘ দেওয়াল-ঘড়িটায় তখন রাত
অব বেজে পাঁচ। লম্বা ও চওড়া বাইরের ঘরটি দেখলে পরিষ্কার
ঝা ধায় গৃহস্বামী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পুরোপুরি কোনও পন্থীই নন,
দুটোর চুলের মুঠি ধরে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন।

নার্স একটা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেই নজরে পড়বে' আধুনিক।
থেকে বেরিয়ে জা[illegible]র। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের চার পাশে
বেলা আ রয়ে সাজানো চেয়ার, তারি মাঝে কয়েকটি টিপয়, তার উপর
চীনে মাটির অ্যাশ-ট্রে। দেওয়ালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ, ভিক্টোরিয়া
পাথেকে শুরু করে নাম করা বিদেশী শিল্পীদের আঁকা অয়েল পেন্টিং।
দেখা শেষ হয়ে গেলে সামনে চাইলে চোখে পড়বে ঘরের মাঝখানে
পার্টিশনের মত একটা মোটা তারে দামী পুরু পর্দা। কাছে গিয়ে পর্দার
মাঝখানে হাত দিয়ে ফাঁক করে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, পশ্চিমের
দেওয়ালের গা ঘেঁষে প্রকাণ্ড ফরাশ, তার উপর ফর্সা ধবধবে চাদর
পাতা -তিন চারটে মোটা তাকিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো।
সামনের দেওয়ালের দুপাশে প্রকাণ্ড দুখানা লাইফ সাইজ অয়েল পেন্টিং
তার মাঝে দীর্ঘ দেওয়াল ঘড়িটা চকচকে পেণ্ডুলামের দোলায় চেপে
তালে তালে নিজের অস্তিত্ব জাহির করছে—দেখ-দেখ-দেখ। অন্য
দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী থেকে প্রায় সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় ভারতীয়
মনীষীদের ছবি।

সামনেটা অফিস ঘর, পর্দার এ পাশে রায় বাহাদুরের এজলাশ।
দরকার হলে মাঝের পর্দা দুপাশে গুটিয়ে রেখে ওপাশের চেয়ারগুলো
এনে ফরাশের চারদিকে পাতিয়ে দেওয়া হয়, মাঝখানে রায় বাহাদুর
প্রকাণ্ড তাকিয়ায় ঠেশান দিয়ে বসে নবাবী আমলের প্রকাণ্ড গড়গড়ার
নল মুখে দিয়ে লোকের অভাব অভিযোগ শোনেন—সম্ভব হলে সঙ্গে
সঙ্গে ম্যানেজারকে ডেকে প্রতিকারের ব্যবস্থাও বাতলে দেন।

এসব হোলো সকালের ব্যবস্থা। সকাল সাতটা থেকে বেলা দেড়টা
দুটো পর্যন্ত। সন্ধ্যের পর এ ঘরের চেহারা পালটে যায়। মাঝখানের
পর্দা দুপাশে গুটিয়ে রাখা হয়। বিষয় সংক্রান্ত কাজ কর্ম এবেলা হয়
না। রায় বাহাদুরের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব দু চারজন এলে—
ফরাশের ওপর তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে তাস, পাশা বা দাবা খেলা হয়।

পায়চারি করতে করতে ঝুপ করে ফরাশের একপাশে বসে গড়গড়ার নলটায় ঘনঘন কয়েকটা টান দিয়ে এক[illegible]মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রায় বাহাদুর বললেন, তাহলে? [illegible] ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কি? কী বলতে চাচ্ছে ওরা?

অরুণ বললে, কিছু বলতে চাইছে না বলেই তো চিন্তার ব্যাপার হয়ে পড়েছে।

—বুঝলাম না। ব্যাপারটা খোলশা করে আমায় বল আগে।

—কমপেনসেশনের টাকা ওরা নেবে না আর সে অফারও আমি করতে পারব না।

নলটা মুখ থেকে নামিয়ে হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন রায় বাহাদুর অরুণের দিকে। তারপর বললেন, তুই ব্যাটা আমায় আরব্যরজনীর আজগুবি কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করে দিলি যে! ওরা নিক না নিক, টাকা অফার করতে, তোর এত মর্ম পীড়ার কারণটা কি?

—আমি মানে—ওকে ভালবাসি বাবা?

—কা'কে?

—সুমিতাকে।

—সুমিতাটি আবার কে?

—যাকে মোটর চাপা দিয়েছি আমি।

সশব্দে হাত থেকে গড়গড়ার নল পড়ে গেল, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ভাঁটার মত গোল চোখ দুটো বিস্ময়ে আরও বড় করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন রায় বাহাদুর। অরুণের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, হয় আমার মাথা খারাপ হয়েছে নয়তো তোর, কোন্‌টা?

—তুমি বুঝতে পারছ না বাবা।

—আমি তো ছেলেমানুষ, আমার বাবা জয়গোবিন্দ বোস বেঁচে থাকলে তিনিও পারতেন না। বলে দেওয়াল ঘড়িটার বাঁ পাশে ফেড

হয়ে আসা প্রকাণ্ড অয়েলপেন্টিংটার দিকে বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন রায় বাহাদুর।

বাইরে বুদ্ধিমান চৌকস আখ্যা পেলেও এই মানুষটির কাছে চিরদিন কথার খেই হারিয়ে ফেলত অরুণ। যুক্তি-তর্ক দিয়ে কিছু বোঝাতে গেলেই সব এলোমেলো হয়ে একটা হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে পড়ত। হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভাবে চেয়ারটায় দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল অরুণ। অমোঘ মন্ত্র, কোনও দিন বিফল হয়নি, সব যুক্তি-তর্ক কোথায় ভেসে গেল। রায় বাহাদুরের চোখের সামনে ফুটে উঠল—মা হারা ছেলেটি দিশেহারা হয়ে তাঁরই কাছে ছুটে এসেছে আজ প্রতিকারের আশায়, তাকে বিমুখ করবেন তিনি কোন্ প্রাণে! ছেলেবেলা থেকে তার কত আব্দারই তো তাঁকে পূরণ করতে হয়েছে—ন্যায়-অন্যায়ের তুলাদণ্ড ঠেলে ফেলে দিয়ে।

সস্নেহে মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে রায় বাহাদুর বললেন, এ ব্যাপারে আমাকে কি করতে হবে একটু বুঝিয়ে বলতো বাবা?

মুখ তুলে তাকাল অরুণ বাবার দিকে—পরিশ্রান্ত চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। পাশ থেকে আর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে বসে পড়ে অরুণের মাথাটা বুকের ওপর টেনে নিলেন রায় বাহাদুর।

অরুণ বললে, দু' একদিনের মধ্যে বিলেতে নিয়ে গিয়ে অপারেশন না করলে মেয়েটা চিরজীবনের মত পঙ্গু হয়ে থাকবে।

—বেশ তো, এর জন্য এত ভাবনা কেন? বিলেতে নিয়ে গিয়ে অপারেশনের সমস্ত খরচা তুমি দিয়ে দাও ওদের।

—নেবে না বাবা!

ধৈর্যের বাঁধ বুঝি ভেঙে যায় আবার। কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন রায় বাহাদুর—তাহলে? তাহলে কী করতে চাস তুই?

—বিয়ে করতে চাই।

বাঁধ ভেঙে গেল। সশব্দে চেয়ারটা ঠেলে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন রায় বাহাদুর। চীৎকার করে ডাকলেন, জয়ন্ত, জয়ন্ত!

বাইরের পর্দা একটুখানি সরিয়ে উঁকি দিল একখানা মুখ।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে রায় বাহাদুর বললেন, ওখানে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে আছ কেন, ভেতরে এস।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল একটা মূর্তিমান গরমিল—চেহারায় ও নামে। বয়েস ষাটের কাছাকাছি, রায় বাহাদুরের সমবয়সী। ঘোর কালো রং, মাথার চুল সাদা, বড় গোঁফ দুটো সাদা। ডগা দুটো যেন রায় বাহাদুরের ভয়ে বেঁকে মুখের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছে, রোগা দোহারা চেহারা। পরনে মোটা থান-ধুতি তার উপর ফতুয়া। সেকেলে একটা বেমানান মানুষের একেলে সৌখিন নাম। দেখলেই মনে হবে হরিচরণ কিংবা কালীচরণ হলেই সব দিক দিয়ে মানানসই হত। ঘরে ঢুকে হাত যোড় করে দাঁড়াল জয়ন্ত।

—এই যে এসেছ! এই আড়ি পেতে কথা শোনার বদ অভ্যাসটা আজও ছাড়তে পারলে না জয়ন্ত! অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি পরদার ওপাশে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছ, কেন, কিসের জন্যে? এই সংসারে এতটুকু বেলা থেকে এসে চুল পাকালে, নাড়ি নক্ষত্র সব জান তুমি। এই অরুণকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছ তুমি—আর তুমি কিনা লুকিয়ে আড়ি পেতে—

সন্ত্রস্ত হয়ে জয়ন্ত বললে, আজ্ঞে না আমি—

--থাম। মিথ্যে কথা বলে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা কর না, পারবে না। কেন? আড়ি পাতবার দরকারটা পড়ল কিসে? শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় দাঁড়ালে আমার কথা শোনা যায়, আর তুমি কিনা—

—আজ্ঞে খাবার দেব কিনা—

—জানি একটা ছুতো মুখে করে আসবে তুমি। খাবার? খাবার মাথায় থাক, এখন এদিক সামলাই কি করে বল দেখি?

—আজ্ঞে, কী ব্যাপার?

—শোন কথা, এত কাণ্ডের পর তুমি বলছ কিনা কী ব্যাপার? বলি ব্যাপারটা কিছুই শোননি নাকি?

—আজ্ঞে, খোকা কোথায় একটা মেয়েকে গাড়ি চাপা দিয়েছে এইতো শুনলাম।

—ছাই শুনেছ। একটা মেয়েকে গাড়ি চাপা দিলে পাঁচশো থেকে পঁচিশ হাজারের মধ্যে রেহাই পেতাম, কিন্তু এ মেয়ে যে-সে মেয়ে নয়; আমার যথাসর্বস্ব দিয়েও পার পাব কিনা সন্দেহ!

—আজ্ঞে, বলেন কি কর্তাবাবু!

—বলছি, অমন গরুড়পক্ষীর মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো ঐ চেয়ারে—তারপর মাথা ঠাণ্ডা করে শোন আমার এই অকালকুষ্মাণ্ডের কাণ্ড।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি সামনের একটা চেয়ারে বসল। নীরবে মিনিট দুই পায়চারি করে জয়ন্তর সামনে এসে বললেন রায় বাহাদুর, মন দিয়ে কথাগুলো শোন। টাকায় কোনও কাজ হবে না।

—অ্যাঁ!

হ্যাঁ, তাইতো বলছি কথাটা মন দিয়ে শোন।' টাকা এখানে অচল। একে বিয়ে করতে হবে।

—আজ্ঞে বলেন কি?

প্রতিবাদে উঠে দাঁড়িয়ে অরুণ বললে, তুমি ভুল করছ বাবা! আমি বিয়ে করতে চাই, কিন্তু যেটুকু চিনেছি তাকে—রাজি হবে না।

—কে রাজি হবে না? হুঙ্কার ছাড়লেন রায় বাহাদুর।

অরুণ বললে, সুমিতা!

—ওর বাবা রাজি হবে। কি বল জয়ন্ত?

জয়ন্ত—আজ্ঞে তাতে আমাদের কিছু সুবিধে হবে কি ? আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন ; একটু স্থির হয়ে বসুন। আমি খোকা গায়ে থেকে জেনে নিচ্ছি ব্যাপারটা। ়ই বাড়ি,

—ওঃ, আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছি আর তুমি খুব ঠ ঝকঝকে গ্যাঁট হয়ে বসে আছ, না ? আমার অবস্থায় পড়লে ত্রের মেয়ে ব্যোম ব্যোম বলে শূন্যে তুড়িলাফ খেতে! বেশ, C মীমাংসা কর। ৷ কেড়ে নিয়ে

বলেই উত্তেজিত ভাবে ফরাশের ওপর তাকিয়াটা জয়ন্ত! ঘটকালি শুয়ে পড়ে গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে বেশ ামি। পরদিন দীনুর লাগলেন রায় বাহাদুর। ৬ঠা দূরে থাক, ভয়ে

অরুণের কাছে এসে সস্নেহে গেল দীনুর। বললাম, ব্যাপার হয়েছে খোকা ? ুর স্বয়ং যেচে আপনার দুয়ারে এসেছেন,

গড়গড় করে বলে। করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন! ভয়ে ভয়ে জয়ন্ত বললে, মেয়েশাবু নিজে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছেন

—বেথুন ককেত বড় সৌভাগ্য তা কথায় বোঝাতে পারবো না, বাপ মা কে কথা দিয়ে ফেলেছি।

—বেনা, কোথায় ? দীনু বললে, ভুগিলহাটের চৌধুরীদের বাড়ি।

—এই ভাবনার কথা। ভুগিলহাটের চৌধুরীদের সঙ্গে আমাদের —লের শত্রুতা। ধান কাটার সময় জমির সীমানা নিয়ে দু'পক্ষে ফ্যামিলিরি, খুন-জখম, মামলা-মকর্দমা লেগেই ছিল। বললাম, তাইতো —র মশাই, খুব ভাবনায় ফেলে দিলেন যে! যাই, গিয়ে বলি াকে। কিন্তু যা জেদী একগুঁয়ে লোক—শেষকালে একটা করলেঙ্কারি না করে বসেন।

রাত্রি চলে আসছিলাম। হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদ-কাঁদ গলায় দু বললে, আমায় বাঁচান। রাজাবাবুকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, ঠিকাধুরীদের দশ আনা অংশের নায়েব আমি আবার এদিকে রাজা

পরা এরকম রূপলাবাণ্যবতী মেয়ে এর আগে আর দেখিনি। আমাকে দেখতে পেয়ে লজ্জায় এতটুকু হয়ে তাড়াতাড়ি কাপড়খানা গায়ে জড়িয়ে জল নিয়ে মুখ গুঁজে চলে গেল মেয়েটি। কাছেই বাড়ি, মাটির দেওয়াল খড়ের চাল। সুন্দর ছবির মত পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে। খবর নিয়ে জানলাম আমাদেরই প্রজা দীনু মিত্রের মেয়ে পুষ্পলতা।...

এই পর্যন্ত বলা হলে, রায় বাহাদুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জয়ন্ত বলতে লাগল : বাড়ি এসে আমায় বললেন,--জয়ন্ত! ঘটকালি শুরু কর। ঐ মেয়েকেই বিয়ে কোরবো আমি। পরদিন দীনুর কাছে গিয়ে খবরটা পাড়তেই আহ্লাদে নেচে ওঠা দূরে থাক, ভয়ে মুখখানা ছাই এর মত সাদা হয়ে গেল দীনুর। বললাম, ব্যাপার কি মিত্তির মশাই? রাজপুত্তুর স্বয়ং যেচে আপনার দুয়ারে এসেছেন, আর তাঁকে অভ্যর্থনা না করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন! ভয়ে ভয়ে দীনু বললে, রাজাবাবু নিজে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছেন এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য তা কথায় বোঝাতে পারবো না, কিন্তু আমি যে কথা দিয়ে ফেলেছি।

বললাম, কোথায়? দীনু বললে, ভুগিলহাটের চৌধুরীদের বাড়ি।

সত্যিই ভাবনার কথা। ভুগিলহাটের চৌধুরীদের সঙ্গে আমাদের বহুকালের শত্রুতা। ধান কাটার সময় জমির সীমানা নিয়ে দু'পক্ষে মারামারি, খুন-জখম, মামলা-মকর্দমা লেগেই ছিল। বললাম, তাইতো মিত্তির মশাই, খুব ভাবনায় ফেলে দিলেন যে! যাই, গিয়ে বলি কর্তাকে। কিন্তু যা জেদী একগুঁয়ে লোক--শেষকালে একটা কেলেঙ্কারি না করে বসেন।

চলে আসছিলাম। হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদ-কাঁদ গলায় দীনু বললে, আমায় বাঁচান। রাজাবাবুকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, চৌধুরীদের দশ আনা অংশের নায়েব আমি আবার এদিকে রাজা

যাঁবুর জমিদারীতে বাস করি। এই উভয়সঙ্কটে কাকে ফেলি আর কাকে রাখি!

চুপচাপ ফিরে এসে সবই তো বললাম আপনাকে।

এরপর রায় বাহাদুর আবার বলতে আরম্ভ করলেন: শুনে প্রথমটা রাগে জ্বলে উঠলাম। পরে ভেবে দেখলাম যে না, রাগলে কাজ হবে না। ভেবে-চিন্তে এমন একটা ফন্দি বার করতে হবে, যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে। সারারাত ছটফট করে কাটালাম। ভোরের দিকে একটা চমৎকার ফন্দী মাথায় এসে গেল।—কি হে জয়ন্ত! এরকম ফন্দী তোমার ঐ নিরেট মগজ থেকে বেরুতো?

—আজ্ঞে কর্তাবাবু কি যে বলেন। তাও কি কখনো হয়? আপনি হলেন রাজা আর আমি একটা তুচ্ছ দাসানুদাস চাকর—পায়ের নীচে পড়ে আছি। বিনয়ে গলে পড়ল যেন জয়ন্ত।

বারুদে আগুন লাগার মত জ্বলে উঠলেন রায় বাহাদুর। বললেন, এই দেখ, আবার ধান ভানতে শিবের গীত শুরু করলে? বুড়ো হয়ে মরতে চললে বুকে হাত দিয়ে বলতো এ বাড়িতে কেউ কখনো তোমার চাকর বাকর মনে করেছে? কথায় কথায় দাসানুদাস, পায়ের নীচে, এসব কথা বলা তোমার একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে জয়ন্ত। ছোট কায়েত কিনা তাই ঐ দাসসুলভ মনোবৃত্তি। দেখ দিকি দিলে আমার সব গোলমাল করে।...

জয়ন্ত বললে, আজ্ঞে সারারাত না ঘুমিয়ে জবর ফন্দী বার করলেন। সেই পর্যন্ত বলেছেন।

—হুঁ। পরদিন দীনবন্ধু মিত্তিরকে কাছারীতে ডাকিয়ে এনে বললাম, আমি সব শুনেছি মিত্তির মশাই, আপনার ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ আমি করতে চাইনে। আমি বলছিলাম চৌধুরীদের নায়েবী আপনি ছেড়ে দিন। আমার জমিদারীতে আপনাকে আমি সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট করে রেখে দেবো। নায়েব গোমস্থা আর সব

কর্মচারী আপনার অধীনে থাকবে। ব্যস একচালে মাত। মহানন্দে রাজি হয়ে গেলেন মিত্তির মশাই। কয়েকদিন পরেই বিয়ে হয়ে গেল। বউ নিয়ে বাজি-বাজনা করে ফিরে এলাম বাড়ি। গেলাম একা জমিদারী দেখতে—ফিরলাম একেবারে গাঁট ছড়া বেঁধে, হাঃ হাঃ হাঃ।

জয়ন্তও নিঃশব্দে যোগ দিল সে হাসিতে।

হাসির তোড় কমে এলে রায় বাহাদুর বললেন, বাবা প্রথমটা খুবই চটে উঠলেন, পরে যখন শুনলেন চৌধুরীদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এসেছি, খুসী হয়ে পিঠ চাপড়ে বললেন, জীতা রহো বেটা!

—আর গিন্নীমা? বউ দেখে গিন্নীমা আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলেছিলেন— এতদিনে তুই একটা কাজের মত কাজ করলি হিরণ! আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে কর্তাবাবু!

—হুঁ, সে রামও নেই অযোধ্যাও নেই। যুগই পালটে গেছে। নইলে এমন কথা কখনও শুনেছ যে বিয়ের প্রস্তাব করতে হবে মেয়ের অভিভাবকের কাছে নয়, খোদ মেয়ের কাছে। তাঁর যদি পছন্দ হল—তবেই হ্যাঁ, নইলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উলটে গেলেও সেই-না।

ফিস ফিস করে জয়ন্ত বললে, মাথা খাটিয়ে একটা জবর ফন্দি বার করুন কর্তাবাবু নইলে খোকার দিকে আর চাওয়াই যায় না। একদিনের মধ্যে চোখ-মুখের চেহারা দেখেছেন?—লেখাপড়া শিখে ভেবেছিল বাবার ওপর টেক্কা দিয়ে যাবে—তাইতো প্রথম ধাক্কাতেই কুপোকাত।

নিভে আসা গড়গড়াটায় দু'তিনটে ফাঁকা টান দিয়ে রায় বাহাদুর ডাকলেন, খোকা!

তেমনি ভাবে মুখ গুঁজে চেয়ারে বসেছিল অরুণ। আস্তে আস্তে মুখ তুলে চাইল বাবার দিকে। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল।

—এদিকে আয়।

উঠে এসে ফরাসের এক পাশে জড়সড় হয়ে বসল অরুণ।

রায় বাহাদুর বললেন, কোন্ ব্যারিস্টারের নাম করছিলি! মেয়েটার অভিভাবক না আত্মীয়?

—ব্যারিস্টার পঙ্কজ চক্রবর্তী, কিন্তু তিনি সুমিতার আত্মীয় বা অভিভাবক নন, ওঁদের সঙ্গে খুব জানা-শুনা ও ঘনিষ্ঠতা আছে। বিশেষ করে ওঁর মেয়ে ক্ষণিকার সঙ্গে।

—এঁদের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা কি রকম?

জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে অরুণ!

রায় বাহাদুর। হুঁ, বুঝিছি, সে দিক দিয়ে কোনও সুবিধে হবে না। অন্য রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে।

সবাইকে সচকিত করে বড় দেওয়াল ঘড়িটায় রাত এগারটা বেজে গেল।

রায় বাহাদুর—ভেবে ভেবে মন মেজাজ খারাপ করে কোনও ফল হবে না—যাও খেয়ে দেয়ে কষে একটা ঘুম লাগাও। কাল সকালে এর একটা হেস্ত-নেস্ত আমি কোরবই!

॥ পনেরো ॥

সমীদের জরুরি টেলিগ্রাম পেয়েই সুমিতার বাবা মা আর চার-পাঁচটি ছেলে মেয়ে নিয়ে রাতের গাড়িতেই রওনা হয়ে পরদিন সকাল আটটার মধ্যেই কলকাতায় এসে হাজির হলেন। সমীদ প্রস্তুত হয়েই ছিল, তাড়াতাড়ি ওঁদের মুখ হাত ধুইয়ে ট্রেনের কাপড় বদলে জোর করে কিছু খাইয়ে ন'টার মধ্যেই সবাইকে নিয়ে হাসপাতালে সুমিতার স্পেশাল রুমে এসে পৌঁছে গেল। ঘরে ঢুকেই সুমিতার মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অনেক বুঝিয়েও শান্ত করতে না পেরে সুমিতা বললে, তোমার মড়া কান্না দেখে মনে হচ্ছে মা, আমি বোধ হয় মরে গেছি।

সুমিতার মা। সোমত্ত মেয়ে সারা জীবন খোঁড়া হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই যে শতগুণে ভাল, এটাও এত দিন বুঝতে পারিসনি হতভাগী ?

সুমিতার দগ্ধ অদৃষ্ট নিয়ে হা হুতাশ হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলতো যদি না চক্রবর্তী সাহেব, ক্ষণিকা ও তাপসকে নিয়ে ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকে পড়তেন।

পরিচয় পর্ব শেষ হতেই ক্ষণিকা বললে, সুমিতা লক্ষীটি ভাই অমত কোরো না—আমি আর তাপস তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে বিলেতে যাব।

সুমিতা—না দিদি, আমার এই ব্যর্থ জীবনটার ওপর আর ঋণের ভার বাড়িও না—আমি ঠিক করিছি—যা হয় হবে এখানেই থাকবো আমি।

তাপস ও সমীদ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে বোধ হয় এই বিষয়েই আলোচনা করছিল। ডাক্তার চৌধুরী ঘরে ঢুকে সুমিতাকে পরীক্ষা করে বললেন, ভালই তো আছেন, জ্বর নেই—ব্যথাও অনেক কম।

চক্রবর্তী সাহেবের দিকে চোখ পড়তেই বললেন, তারপর কি ঠিক করলেন? বিলেতে যাওয়া না এখানেই ট্রিটমেণ্ট করাবেন? যা করবেন চটপট করে ফেলুন, এ অবস্থায় পেসেণ্টকে বেশি দিন ফেলে রাখা চলবে না।

বাইরে রায় বাহাত্বরের হুঙ্কার শোনা গেল, কই, কোন্ ঘর? সিঁড়িও ভাঙতে পারবো না আর লিপটেও উঠব না—এ কথা আগেই বলে দিচ্ছি কিন্তু।

আস্তে কে যেন কি একটা বলল, আর কোনও কথা শোনা গেল না, শুধু বারান্দায় জুতোর আওয়াজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকলেন রায় বাহাত্বর। সবাই অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে দরজার দিকে মোটা ধুতির ওপর গলাবন্ধ ছিটের কোট, কাঁধের ওপর আড়াআড়ি করে ফেলা একটা সিল্কের চাদর, হাতে মোটা একটা লাঠি, মাথাটা রুপো দিয়ে বাঁধানো। ঠিক পিছনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে অরুণ, তার পিছনে রায় বাহাত্বরের অনুকরণে গলাবন্ধ কোটের ওপর পাতলা সাদা চাদর পাকিয়ে গলার তু'পাশে ঝুলিয়ে জয়ন্ত।

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন রায় বাহাত্বর। চারদিক এক নজর দেখে নিয়ে বেশ ঝাঁজালো গলায় বললেন, এত ভিড় কিসের? এখানে এত ভিড় কেন?

চক্রবর্তী সাহেব ও সমীদ তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে নমস্কার করে নিজেদের পরিচয় দিলে শান্ত হলেন রায় বাহাত্বর। বললেন, ওঃ আপনিই ব্যারিস্টার পঙ্কজ চক্রবর্তী?

চক্রবর্তী সাহেব কিছু বলবার আগেই তাড়াতাড়ি উঠে সামনে এসে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে ক্ষণিকা বললে, আর আমি ওঁর মেয়ে ক্ষণিকা।

রায় বাহাত্বর বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন। এ যুগের এম. এ. পাস করা মেয়ে অপরিচিত এক বৃদ্ধের পায়ের ধুলো নিচ্ছে—এ যে

অচিন্তনীয় ব্যাপার! আশীর্বাদ করতে ভুলে গিয়ে ক্ষণিকার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন রায় বাহাত্বর।

পরিত্যক্ত চেয়ারখানা সামনে এগিয়ে দিয়ে ক্ষণিকা বললে, বস্থন জ্যাঠাবাবু! দাম্ভিক দৃষ্টিটা এরই মধ্যে কখন স্নেহ করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠেছে বুঝতেই পারেননি রায় বাহাত্বর। নিঃশব্দে ক্ষণিকার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন স্থমিতার রোগ-পাণ্ডুর মুখখানির দিকে। সে দৃষ্টি বেশিক্ষণ সইতে পারে না স্থমিতা—চোখ বুজে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চুপ করে থাকে।

রায় বাহাত্বর। মুখ ফিরিয়ে নিলে তো চলবে না মা! অনেক আশা নিয়ে এসেছি, হতাশ হয়ে শুধু হাতে ফেরা আমার কুষ্ঠীতে নেই —তা কিন্তু প্রথমেই বলে রাখছি।

পরিচয় পেয়ে ডাক্তার চৌধুরী সামনে এসে নমস্কার করে দাঁড়ালেন।

ইশারায় ঘরের অপেক্ষাকৃত নির্জন কোণে ডেকে নিয়ে রায় বাহাত্বর বললেন, আমি সব শুনিছি ডাঃ চৌধুরী। এখন কথা হচ্ছে এক দিনের মধ্যে আপনাদের দিক থেকে সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন তো?

—নিশ্চয়, এ সব এমারজেনসি কেসে অনেক সময় দেখা গেছে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার দেরিতে সর্বনাশ হয়ে গেছে। সে দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আর একটা কথা ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে আমি কথা কয়েছি, উনি সঙ্গে থাকলে সব দিক দিয়ে স্থবিধা হবে! টাকাটা একটু বেশি চাইছেন—যাওয়া আসা এয়ার প্যাসেজ ছাড়া দৈনিক পাঁচ শো--

হাত তুলে বাধা দিলেন রায় বাহাত্বর—বললেন, ওটা নিয়ে দয়া করে মাথা ঘামাবেন না, আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনার দিক থেকে করণীয় যা তাই করে দিলে যথেষ্ট উপকার করা হবে।

সুমিতার খাটের চারপাশে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। রমা দেবীকে লক্ষ্য করে সুমিতার মা বললেন, যা শুনলাম তা যদি সত্যি হয়—সুমির ভাগ্যি বলতে হবে, কি বল গঙ্গাজল ?

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সোজা রাস্তায়, কোথায় যেন একটা কাঁটা আত্মগোপন করে আছে। জবাব না দিয়ে খাটের মাথার কাছে ঝুঁকে আঁচল দিয়ে সুমিতার চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগলেন রমা দেবী।

কই আমার বেয়াই-বেয়ান কোথায় ?

সবাই চমকে উঠে কয়েক পা সরে গিয়ে দাঁড়াল।

সুমিতার বাবা মিঃ নন্দী নমস্কার করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। রায় বাহাদুর পরম আগ্রহে হাত দু'খানা ধরে বললেন, মেয়ের বাপই চিরদিন নতি স্বীকার করে আসছে ছেলের বাপের কাছে—এইটেই প্রচলিত প্রথা। কিন্তু দিনকাল বদলে গেছে বেয়াই, তাই বলছি দয়া করে যদি—

বাধা দিয়ে মিঃ নন্দী বললেন, এ সব কি বলছেন, আপনি দয়া করে সুমিতাকে ঘরে নিলে আমরা কৃতার্থ হব।

সুমিতার খাটের কাছে এসে রায় বাহাদুর বললেন, অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে থেক না মা। আমার দিকে চেয়ে আমার এই হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটাকে তুমি ক্ষমা কর মা।

অবাক্ বিস্ময়ে রায় বাহাদুরের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল সুমিতা।

চেয়ারটা টেনে খুব কাছে নিয়ে বসে রায় বাহাদুর বললেন, তুমি ভাবছ তোমার এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে, দয়া অনুকম্পার আড়ালে আত্মগোপন করে খানিকটা আত্মপ্রসাদ ও বাহাদুরি নেবার জন্যে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। ভুল, মা ভুল—তুমি, শুধু তুমি কেন, বাইরে থেকে কেউ ধারণাও করতে পারবে না—কতখানি অশান্তি অতৃপ্তি আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে সব দিক মানিয়ে ঠাট বজায়

রেখে চলতে হয় আমাকে। সবাই ঈর্ষ্যা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলি প্রচুর টাকা রায় বাহাদুরের, ওর, মত ভাগ্যবান্ ও সুখী লোক খু-কমই আছে। হায় রে! টাকায় যদি সুখ শান্তি কিনতে পাওয়া যেত তাহলে আমি সর্বস্ব দিয়ে দেউলে হয়ে গাছ তলায় বাস করতাম।

শেষের দিকে গলাটা ভারি হয়ে আসে রায় বাহাদুরের। থমথমে নিস্তব্ধ ঘর, কথা কয়ে আবহাওটা হালকা করতে সাহস পায় না কেউ।

রায়বাহাদুর আপন মনেই বলে চললেন, অরুণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের লক্ষ্মী যেদিন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন-- ভেবেছিলাম সব শেষ হয়ে গেল, এইবার যেদিকে তু'চোখ যায় বেরিয়ে পড়ি। পারলাম না। ঐ এক ফোঁটা মা হারা ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে আবার সাহসে বুক বাঁধলাম। খোকা আমার বড় হবে, আবার সংসারে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা কোরবো—কত আশা কত স্বপ্ন। কলেজে ঢুকেই ছেলেটা যত আলক্ষ্মীর পেছনে ছুটে বেড়াতে লাগল। সব জানতাম আমি—ইচ্ছে করেই বাধা দিইনি। আমি জানি ও-বয়সে শাসন বা উপদেশ সত্যিকার কোনও সুফল হয় না। নিজে থেকে ধাক্কা খেয়ে যেদিন ও আসল নকলের পার্থক্য বুঝতে পারবে সেই দিনটির পানে চেয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করে বসেছিলাম। এলও সেদিন, কিন্তু আমার কল্পনার রঙিন স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে। খোকা কেঁদে এসে পড়ল, ঠিক অসহায় ছোট শিশুর মত। তাইতো বুড়ো ছেলেকে ছুটে আসতে হল— মায়ের দরবারে ভিখারীর মত। তুমি ভুল বুঝে অমত কোরো না মা। আমি লক্ষ্মীপুজোর আয়োজনে কোমর বেঁধে লাগি।

কম্পমান দুর্বল হাতখানা রায় বাহাদুরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অবসাদে চোখ বুঁজল সুমিতা।

সুসিপাহে উঠে দাঁড়িয়ে, চারদিক দেখে নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন লক্ষ্ম বাহাদুর, জয়ন্ত, জয়ন্ত !

বাইরে বারান্দা থেকে উত্তর আসে, আজ্ঞে কর্তাবাবু, আমি এখানে।

—কেন, ওখানে কেন ? বলে লড়াই করবে ? কাল, আমি যাব পরশু ! দরকারি কথা হচ্ছে এখানে—আর তুমি এক মাইল দূরে লুকিয়ে বসে আছ, কিসের জন্যে ? এদিকে এস।

সবার কৌতূহলী দৃষ্টির আঘাতে লজ্জায় এতটুকু হয়ে ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়াল জয়ন্ত।

সুমিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জয়ন্তকে দেখিয়ে রায় বাহাদুর বললেন, জান মা, লক্ষ্মী ছেড়ে গেছেন অনেক দিন—রেখে গেছেন এই বাহন-গুলো। এদের নিয়ে জ্বলে পুড়ে মলাম।

জয়ন্ত। আজ্ঞে আমাকে কিছু বলবেন কর্তাবাবু ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নইলে কি তোমার রমনীমোহন চেহারাটি এঁদের দেখাব বলে ডেকেছি ? অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাপা হাসিতে ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে সুমিতার।

রায় বাহাদুর। শোন, কাল গোধুলি লগ্নে বিয়ে, সব ব্যবস্থা এক দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে, পারবে না ?

—আজ্ঞে কাল ?

—হ্যাঁ কাল, কেন কাল কী অপরাধ করল শুনি ? একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে!

—মানে—আমি বলছিলাম, ভাল একটা দিনক্ষণ না দেখে—

—কালই ভাল দিন। তাছাড়া এটা কি তোমার নিরেট মাথায় ঢুকছে না—যে পরশু সকাল আটটার মধ্যে দমদম থেকে ওরা বিলেত রওনা হবে ?

পরিষ্কার কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মত হাঁ করে চেয়ে থাকে

জয়ন্ত। সাড়া না পেয়ে রায় বাহাদুরের গলা সপ্তমে চড়ে যায়. বলি জয়ন্ত! আমাকে কি তোমার মত নিরেট মুখ্যু ভাব, যে অদিনে-অখ্যানে আমার একমাত্র ছেলের বিয়ে দিয়ে—

একটা কথা মনে পড়ায় হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করেন রায় বাহাদুর, আজ হাসপাতালে আসবার সময় কে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে?

জয়ন্ত বলে, রায় সাহেব নলিনীমোহন ঘোষ।

—কেন এসেছিলেন?

—আজ্ঞে মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে।

—কবে বিয়ে?

—আজ্ঞে কাল। এবার জলের মত সব পরিষ্কার হয়ে যায়। এতগুলো লোকের সামনে লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায় জয়ন্ত। বলে, আমারই ভুল হয়েছে কর্তাবাবু—আমি এখনই যাচ্ছি, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে—সে দিক দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

যাবার জন্যে পা বাড়াতেই রায় বাহাদুর হুঙ্কার ছাড়লেন, দাঁড়াও। আর একটি বাহন কোথায়? অনুসন্ধানী চোখ দিয়ে ঘরের চারপাশে খুঁজতে থাকেন রায় বাহাদুর।

অবাক্ হয়ে জয়ন্ত বলে, আজ্ঞে কার কথা বলছেন!

—বলছি আমার অপোগণ্ড অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলে অরুণের কথা। কোথায় তিনি? সমীদ কাছে এসে বলে, অরুণ খানিকক্ষণ হল সুপারিণ্টেডেণ্ট মৈত্রের কাছে গেছে—দরকারি কাগজ-পত্র, এক্সরে রিপোর্ট, ডাঃ কোহেনের নামে পারসোনাল একখানা চিঠি, এই সব যোগাড় করতে। ডেকে আনব?

—না থাক। সারা মুখখানিতে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে রায় বাহাদুরের। সুমিতার দিকে চেয়ে বলেন, মুখে যাই বলি না কেন—ছেলেটার সত্যিই বুদ্ধি আছে, কি বল মা? নইলে ছাখ না,

মনে মনে বেশ জানত যে, চঞ্চলা লক্ষ্মীকে আমার আলক্ষ্মীর সংসারে বেশিদিন আটকে রাখা যাবে না। তাই ফন্দি করে চিরদিনের মতো অচলা করে আটকে রাখার ব্যবস্থা করেছে। ব্যাটা আমার ওপর দিয়ে যায়, হাঃ হাঃ হাঃ···

স্থান কাল ভুলে শিশুর মত হাসতে লাগলেন রায় বাহাদুর।

অরুণের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সুমিতার। বিয়ে কোথায় হবে এই নিয়ে প্রথমটা চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমীদের বাড়িতে স্থানাভাব। নতুন বাড়ি ভাড়া করে এত অল্প সময়ের মধ্যে বিয়ে দেওয়াও সম্ভবপর নয়। ক্ষণিকাই এর মীমাংসা করে দিলে। বললে, কেন মিছে ভাবছেন আপনারা। আমাদের বাড়িটা তো খালি পড়ে আছে। সেখানেই হবে।

হাসপাতাল থেকে ডাক্তারের নির্দেশ মত একখানা ইনভেলিড চেয়ার কিনে নিয়ে এসেছিল সমীদ। তাতেই সুমিতাকে চক্রবর্তী সাহেবের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল। এয়ারওয়েজ কর্তাদের সঙ্গেও কথাবার্তা কয়ে ঐ চেয়ারেই বিলেত পর্যন্ত যাবার ব্যবস্থা ঠিক করা হল। অবশ্য ঐ চেয়ারটির স্থান সঙ্কুলান করতে তু'টি সিটের ভাড়া দিতে হল।

বিকেলে কনে সাজাতে এসে ঠাট্টা করে ক্ষণিকা বললে, কি দিয়ে সাজাব? ফুল না হীরে মণি মুক্তোর গহনা দিয়ে? রাজার ঘরের বউ যা তা করলে তা চলবে না। সুমিতা কিন্তু সিরিয়াসলি জবাব দিয়েছিল,—দয়া করে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘাটা আর দিও না ক্ষণিকাদি! যেমন আছি এই ভাবেই বিয়ে হবে।

কি জানি কি ভেবে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেনি ক্ষণিকা।

ঠিক হয়েছিল বিয়ের পর সকালে এইখান থেকেই দমদম এরোড্রামে যাওয়া হবে। গোল বাধালেন রায় বাহাদুর। বললেন, তোমাদের

আক্কেলটা কি রকম শুনি? এত দম্ভ করে আমার ছন্নছাড়া লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন করলাম—আর তোমরা সেটা ভেস্তে দিতে চাও? হবে না। সকালে আমার বাড়িতে গিয়ে তারপর অন্য কথা।

সমীদ একটু ইতস্ততঃ করে বলেছিল—যদি দেরি হয়ে যায় তাহলে একটু মুশকিলে পড়তে হবে। সকাল ঠিক আটটায় প্লেন ছাড়বে, এই জন্যেই ঐ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রায় বাহাদুর। দেরি হবে না। যদি হয়ও, তাতেই বা মুশকিলটা কিসের? আমি অন্য প্লেন চার্টার করে ঐ দিনই সব ব্যবস্থা করে দেব।

দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ভর্তি। তারাই শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি করে বধূ বরণ করে নিল।

সুমিতার চোখ ফেটে জল আসছিল। এত বড় বিরাট বাড়ি খাঁ খাঁ করছে. সত্যিকার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। ওপরে রায় বাহাদুরের শোবার ঘরের দেওয়ালে শাশুড়ীর বিরাট তৈল চিত্র। অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখছিল সুমিতা। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে সবাইকে বেরিয়ে যেতে বললেন রায় বাহাদুর। সুমিতার হাত দু'টো ধরে অবোধ শিশুর মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, মনে কোনও অভিমান বা আক্ষেপ রেখ না মা—ভাল হয়ে ফিরে এসে তোমার সংসারের ভার তুমি হাতে তুলে নিয়ে, আমায় একটু নিষ্কৃতি দাও মা। বাইরে থেকে যাই শুনে থাক ছেলেটা আমার সত্যিই খারাপ নয় মা—তুমি ওকে মানুষ করে তোল।

সুমিতা বলল তাই হবে বাবা। আপনি শুধু আশীর্বাদ করুন আপনার বংশের সম্মান সুনাম আমি যেন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি।

কথা যোগায়নি, শুধু মাথায় হাত রেখে মনে মনে আশীর্বাদ করেছিলেন রায় বাহাদুর।

তাগাদা দিতে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল অরুণ—তারপর আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই নিঃশব্দে

মনে মহোতখানা নিয়ে সুমিতার হাতে চেপে ধরে অস্পষ্ট ধরা গলায় সংবলেন, এ হাত তুমি কোনও দিনই আলগা দিও না মা।

এক রকম ছুটে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন রায় বাহাদুর।

বাইরে থেকে জয়ন্ত বললে, যাবার সময় হয়ে গেছে একবার বাইরে আসুন কর্তাবাবু।

ঘরের মধ্যে থেকেই চীৎকার করে বললেন রায় বাহাদুর, আমার কাজ শূন্য ঘরে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করা, সে কাজ শেষ করিছি। বিদায় দেওয়া-নেওয়ার পালা তোমরাই সেরে নাও—ওর মধ্যে আমায় ডেক না।

॥ ষোলো ॥

তিন মাস পরের কথা। অনেক কিছুই ঘটে গেছে এর মধ্যে। মাসখানেক আগে মিনতি নারী-কল্যাণ আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন করে টাকা কড়ির ব্যবস্থার ভার ট্রাস্টির ওপর ছেড়ে দিয়ে, সবার কাছে বিদায় নিয়ে চক্রবর্তী সাহেব চলে গেছেন গুরু সন্দর্শনে। বিলেতে গিয়ে সুমিতা মাত্র দু'খানি পত্র দিয়েছিল—প্রথমটা অপারেশানের পর। লিখেছিল : ক্ষণিকাদি, এঁরা সবাই বলছেন অপারেশান খুব সাক্সেসফুল। তবে দু'মাস এখনও বিশ্রাম নিতে হবে। আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে আবার আমি তোমাদের মত চলে-ফিরে বেড়াতে পারবো। বাবার জন্যে এক এক সময় ভারী কষ্ট হয়—তোমরা ওঁকে একটু দেখো, আমরা চলে আসাতে সত্যিই উনি বড় একা হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় চিঠিখানা এসেছিল কিছুদিন আগে। তাতে লিখেছিল সুমিতা দিদি, সত্যিই আমি হাঁটতে পারছি, ডাক্তারের নির্দেশ মত আমরা কালই সুইজারল্যাণ্ডে যাচ্ছি বিশ্রাম নিতে। বাড়ি ফিরতে আরও তিন চার মাস দেরি হবে। বাবাকে সান্ত্বনা দিও।

সন্ধ্যার আসর এখন নিয়মিত বসে রায় বাহাদুরের বাড়িতে। যেতে একটু দেরি হলেই রায় স্ট্রীটের বাড়িতে জয়ন্ত গাড়ি নিয়ে হাজির। এদিক থেকে বেশিরভাগ দিন ক্ষণিকা একাই যায়। কলেজের ছুটির পর সমীদ সোজা চলে আসে। বেশিরভাগ দিনই তাপস আসে না—ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে প্রায়ই রাত নটা দশটা হয় বাড়ি ফিরতে। দৈবাৎ এক একদিন নটার পর রায় বাহাদুরের ওখানে এসে রাতের খাওয়া শেষ করে ক্ষণিকাকে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

নানা বিষয়ে আলোচনা চলে, তার মধ্যে ঘুরে-ফিরে অরুণের প্রসঙ্গটাই এসে পড়ে বার বার। ছেলেবেলায় কবে দুষ্টুমি করে মার

খেয়ে একবেলা না-খেয়ে, কেঁদে কাটিয়েছিল। যার জন্যে তু'দিন ধরে খেতে বা ঘুমুতে পারেননি রায় বাহাত্বর। এই সব বার বার বলা পুরোনো কথা।

এরই মধ্যে একদিন তাপস এল না। অথচ সকালে ক্ষণিকাকে এক রকম কথা দিয়েছিল সকাল সকাল রায় বাহাত্বরের বাড়িতে আসবে। রাত্রি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন তাপসের দেখা পাওয়া গেল না, তখন রায়বাহাত্বর বললেন, সমীদ তুমি বাবা কণা মাকে নামিয়ে দিয়ে যাও। জয়ন্তর অসুখ করেছে—সন্ধ্যা থেকে শুয়ে আছে নইলে তোমাকে কষ্ট দিতাম না।

যেতে যেতে সমীদ বললে ব্যাপার কি ক্ষণিকা! তাপস আজকাল যেন একটু তুর্লভ হয়ে পড়ছে—ঝগড়া-টগড়া করছ নাকি?

প্রথমটা চুপ করে রইল ক্ষণিকা, একটু পরে বললে, আমার চেয়ে আজকাল পয়সাটাই ওর বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছে। কি করে বড়-লোক হওয়া যায় রাতদিন সেই নেশায় মশগুল হয়ে আছে।

তু'জনেই চুপচাপ। জনহীন পথ বেয়ে একঘেয়ে মন্থর গতিতে মাঝে মাঝে হর্ন দিয়ে চলে শুধু মোটর।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসে সমীদের হাত ধরে ক্ষণিকা বলে, এক এক সময় কি ভাবি জান সমীদ? জ্যাঠাবাবু মানে রায় বাহাত্বরের সঙ্গে আলাপ না হলে আমি হয়তো পাগল হয়ে যেতাম। তোমরা পুরুষ মানুষ সময় এক রকম কেটে যায়, কিন্তু আমার কাটে না।

উত্তরে শুধু একটা হুঁ বলা ছাড়া আর কিছু কথা খুঁজে পেল না সমীদ।

গাড়ি রায় স্ট্রীটের বাড়ির সামনে এসে থামল। উপরে শোবার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে তু'জনেই চেয়ে দেখল সামনের বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তাপস।

সমীদ আর নামল না। ক্ষণিকাকে নামিয়ে দিয়ে সোজা

এসে ল্যান্সডাউন রোডে পড়ে গাড়ি চলল শ্যামবাজারে সমীদকে নামাতে।

বাইরের দরজা খোলাই ছিল। উপরে এসে তাপসকে ক্ষণিকা বলল, গেলে না কেন? টেবিলের ওপর থেকে প্যাকেটটা নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধূমপান করে তাপস বলল, বিমল পালিয়েছে।

কিছু বুঝতে না পেরে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে ক্ষণিকা বলে, ব্যাপারটা কি?

—জলের মত সোজা দিন কয়েকআগে একজন কনট্রাকটারের কাছ থেকে মোটা টাকার চেক্ পেয়ে ওর কাছে দিয়েছিলাম ব্যাঙ্কে জমা দিতে। কাল অনেকগুলো দরকারি পেমেন্ট করতে হবে বলে আজ একখানা বেয়ারার চেক কেটে ওকে টাকাটা তুলে আনতে দিলাম। ব্যস্—টাকা তুলে হাওয়া।

—ব্যাঙ্ক কি বলছে?

—ব্যাঙ্ক যা বলছে—তা কারুর কাছে বলবার নয়।

—তবু?

জ্বলন্ত সিগারেটটা অ্যাশট্রের ওপর ঘষতে ঘষতে তাপস কতকটা নিজের মনেই বলে, সবাই বারণ করেছিল—কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—

আস্তে আস্তে উঠে শোবার ঘরে ঢুকে বাইরের কাপড় চোপড় না ছেড়েই খাটের এক পাশে চুপ করে বসল ক্ষণিকা। সামনের দেওয়ালে মায়ের ছবিটা, মুখে সেই প্রসন্ন মিষ্টি হাসি। কতক্ষণ এই ভাবে বসেছিল খেয়াল নেই। বসবার ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটা একই সুরে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে চুপ করে যেতেই সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল ক্ষণিকা। উঁকি দিকে দেখে মাঝের ঘরে টেবিলের ওপর একরাশ কাগজ-পত্রের মাঝে চেয়ারটায় হেলান দিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে তাপস। নিজের ওপর রাগ হল ক্ষণিকার। অভিজ্ঞতার অভাবে বা বুদ্ধির

দোষে—যে কারণেই হোক—অতগুলো টাকা হারিয়ে লোকটার মানসিক অবস্থা কী হতে পারে এটা কল্পনা করে খানিকটা সমবেদনা ও সান্ত্বনা দেওয়া ক্ষণিকার খুব উচিত ছিল। চুপচাপ ওভাবে চলে আসাটা কোনও মতেই সমর্থন করা যায় না।

নিঃশব্দে তাপসের চেয়ারটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ক্ষণিকা। টেবিলটার উপর ঝুঁকে দেখল প্রায় সবগুলোই ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্তর। ওরই মধ্যে নজরে পড়ল পোস্ট আফিসের ছাপ না দেওয়া তাপসের নামে একখানা সাদা খাম; ওপরে এককোণে লেখা গোপনীয়। কৌতূহলী হয়ে খামখানা হাতে নিয়ে ভিতর থেকে চিঠি-খানা বার করে মনে মনে পড়তে লাগল ক্ষণিকা:

দাদা—

চিঠিটা পেয়ে খুব অবাক্ হয়ে যাবে—প্রথমটা রাগও হবে আমার ওপর, কিন্তু একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি তোমার উপকারই করিছি। বাবা মরবার সময় আমাদের সব ভাইয়ের ওপর সুবিচার করে যাননি, ফলে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট দাঁড়ি-পাল্লাটা তোমার দিকেই ভারী হয়ে উঠেছিল। তুমি বিদ্বান কৃতী ছেলে, তার উপর এক রকম একা বললেই হয়। নগদ টাকা গহনা প্রভৃতি কিছু কম দিলেও বিশেষ ক্ষতি হত না। যাক—বাবার সেই ইচ্ছাকৃত ভুলের খানিকটা সংশোধন করবার মতলব নিয়েই তোমাকে অর্ডার সাপ্লাই-এর ব্যবসায় নামাই। আমার ন্যায্য প্রাপ্য আমি সুদসুদ্ধ পেয়ে গেছি। ইচ্ছে করলে আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিতে পার; কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হবে না। টাকাকড়ি সব আমার স্ত্রীর নামে ট্রানস্ফার করে আটঘাট বেঁধে প্রস্তুত হয়ে আছি। শুধু জেল খাটাতে পার। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেদিক দিয়ে তুমি যাবে না। কেন না ঘরের কথা কোর্টে দশজনের সামনে আলোচনা করতে বা শুনতে তোমার রুচিতে বাধবে। সেইটুকুই ভরসা!

ছোট ভাই হলেও আজ একটা ছোট্ট উপদেশ দেবার লোভ স্মামলাতে পারছি না। দাদা, ব্যবসা তোমার জন্য নয়। কয়েকমাসের মধ্যে দেখলাম ঘরে-বাইরে তুমি দেউলে হতে চলেছ। আমার বৌদি, শিক্ষিতা, তার উপর ডাক-সাইটে সুন্দরী; ব্যবসা করে বড়লোক হবার নেশায় বেশিরভাগ সময় তুমি বাইরে কাটিয়ে দাও। কিন্তু ওদিকে তোমার অজ্ঞাতে বিষবৃক্ষ একটু একটু করে বাড়ছে তা দেখবার অবসর তোমার নেই। সেই অবসর নেবার সুযোগ করে দিয়ে গেলাম আমি। বাইরে বিছানো লোভাতুর দৃষ্টিটা গুটিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে দৃষ্টিপাত করো, সব দিক রক্ষা হবে।

আমি সমীদবাবুর কথা বলছি।

পারো তো ক্ষমা কোরো—হাজার হোক ভাই তো, নাই বা হলাম এক মায়ের পেটের! ইতি—

উপকৃত
তোমার ছোট ভাই
বিমল

পড়া হয়ে গেলেও অনেকক্ষণ নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণিকা।

তেমনি ভাবে চোখ বুজে শুয়ে তাপস বললে, ওর ভাগ্যি ভাল আজ আমার সামনে পড়েনি? পড়লে কুকুরের মত গুলি করে মারতাম।

বলতে বলতে সোজা হয়ে বসে পকেট থেকে রিভালভারটা বার করে টেবিলের ওপর রাখলো তাপস।

অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ কাঁচা পয়সার ব্যাপার। অনেক টাকা নিয়ে চলা-ফেরা করতে হয় তার উপর ডাকাতি রাহাজানি প্রায় রোজই হচ্ছে। রায় বাহাদুর ও চক্রবর্তী সাহেব, পুলিশ কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে একটা রিভলভারের পারমিট তাপসের নামে বার করে দেন।

রিভালভারটার দিকে চেয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠে দু'হাত দিয়ে তাপসের কাঁধে ভর দিয়ে নিজেকে সামলে নিল ক্ষণিকা।

তাপস বললে, চিঠিটা পড়ে মাথায় খুন চেপে গেল। বিকেল থেকে সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু রাস্কেলটার দেখা পেলাম না।

নিজের অজ্ঞান্তে মুখ থেকে বেরিয়ে যায় ক্ষণিকার—ভালই হয়েছে।

—ভালই হয়েছে? তুমি বলছ কি কণা? উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকার দিকে চেয়ে তাপস বলে।

নিচু হয়ে টেবিলের ওপর থেকে রিভলভারটা তুলে নিয়ে ক্ষণিকা বলে, ঠিকই বলছি।

—তুমি বুঝতে পারছ না কণা, টাকার জন্যে আমার দুঃখ নেই, নিজের বোকামির প্রায়শ্চিত্ত করতে ওটার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জানোয়ারটার এতবড় দুঃসাহস যে তোমাকে সমীদকে লক্ষ্য করে এত বড় একটা নোংরা ইঙ্গিত করতে সাহস পায়? সেইটেই আমার অসহ্য।

একটু চুপ করে থেকে বলে, লজ্জায় ঘেন্নায় তোমাদের কাছে মুখ দেখাবার সাহস পেলাম না বলেই আজ রায় বাহাদুরের ওখানে ইচ্ছে করেই যাইনি কণা!

পরম যত্নে হাত দিয়ে তাপসের কপালের উচ্ছৃঙ্খল চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে ক্ষণিকা বলে, আমি হলেও যেতে পারতাম না তাপস! একটু থেমে আবার বলে ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবে, বিমলের ওপর রাগ করার কোনও যুক্তিই খুঁজে পাবে না তুমি।

কথা না কয়ে বিস্ময়ে ক্ষণিকার মুখের দিকে চেয়ে থাকে তাপস। ক্ষণিকা বলে যায়: কলেজ থেকে ঘনিষ্ঠ আলাপ হবার'পর আজ

পর্যন্ত যে ভাবে আমরা চলে ফিরে বেড়াই তাতে চেনা-অচেনা সবার মনেই বিরূপ সমালোচনার স্পৃহাটা প্রবল হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। বিমল তাদেরই একজন। সুতরাং ওকে সেদিক দিয়ে খুব বেশি দোষ দেওয়া চলে কি? রাত অনেক হল—চল, শোবে চল। টাকাটা ত গেছেই রাত জেগে ঐ সব বাজে আলোচনা করে মনের শান্তিটুকুও নষ্ট করা ঠিক হবে না।

বলতে বলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ক্ষণিকাকে জড়িয়ে ধরে তাপস বলে, সত্যি বলছি কণা, এই রকম চরম মুহূর্তে তুমি পাশে এসে না দাঁড়ালে কি যে—

বাকিটা বলতে দেয় না ক্ষণিকা। মুখে হাত চাপা দিয়ে ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দেয়।

কণ্টক শয্যা। শুয়ে ছটফট করে, ঘুম আসে না। চোখ বুজলেই ক্ষণিকার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বলে, তোমরা পুরুষ, সময় একরকম কেটেই যায়। আমার কাটে না। কেন কাটে না? কী তোমার দুঃখ? তাপস কি তোমায় অবহেলা করে? এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন গলার কাছে ভিড় জমিয়ে বাইরে আসবার পথ খুঁজে বেড়ায়। শুয়ে থাকা অসম্ভব। উঠে পড়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দেয় সমীদ। টেবিলের ওপর ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাসটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে পাশের বুক কেস থেকে একটা বই টেনে নিয়ে আনমনে পাতা ওলটাতে থাকে। হঠাৎ একটা লাইনের ওপর দৃষ্টিটা সজাগ ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

"Love's mystries in soul do grow; Yet body is the book." মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বলে, মিথ্যা কথা! দৈহিক লালসাটাই যদি সব চেয়ে বড় হত, তাহলে মমতাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট সাজাহান উপে গিয়ে ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যেতেন

অনেক আগেই। আসঙ্গ লিপ্সাটাকেই যদি প্রেমের ওপরে স্থান দিতেন, তাহলে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস, সমাজ-সংস্কার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে অস্পৃশ্যা রজকিনীর প্রেমের বাণী দিকে-দিকে প্রচার করতে সাহস পেতেন না। বাশুলী মন্দিরের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সে প্রেমের সমাধি বহু পূর্বেই রচনা হয়ে যেত। সর্বকালে সর্বদেশে এর অসংখ্য নজির আজও অবিনশ্বর হয়ে আছে। সে সবই কি মিথ্যা? সত্য শুধু স্বার্থপর দেহ সর্বস্ব মুষ্টিমেয় কয়েকটা মানুষের বিকৃত মস্তিষ্কের প্রয়াস? পরক্ষণেই স্পষ্ট অনুভব করে সমীদ অন্ধকার গাড়ির মধ্যে ক্ষণিকার নিকট সান্নিধ্য, ওর হাতের মদির স্পর্শটুকু। শত যুক্তিতর্কের পুরু প্রলেপ দিয়েও সেটুকু চাপা দিতে পারে না, মনে হয় কোনও দিন পারবেও না। তাহলে? মন চোখ রাঙিয়ে তিরস্কার করে ওঠে, ভীরু! চিরন্তন সত্যকে কতকগুলো অসার যুক্তি তর্কের হালকা আবরণে ঢেকে রেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চাও? আগুনকে ঢেকে রাখতে চাও কতকগুলো শুকনো খড় চাপা দিয়ে? কাপুরুষ! সমীদের মনে হয় দেহের সমস্ত রক্ত এক সঙ্গে বিদ্রোহ করে শিরাপথে মাথায় এসে তাণ্ডব নাচ শুরু করে দিয়েছে।

টেবিলের ওপর দু'হাতের ওপর মাথাটা কাত করে চোখ বুজে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে সমীদ।

শহুরে পাখী রাত্রি শেষে কলকাকলিতে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে প্রভাতের আগমন ঘোষণা প্রথমে করে না। করে ঘোড়ায় টানা ময়লা ফেলা বিকট বিশ্রী আওয়াজ করা গাড়িগুলো। এরা যেন পাখীদের ঘুম ভাঙানোর এলার্ম বেল। ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেলে জেগে উঠে খানিকটা পারিবারিক কলহে সময় কাটিয়ে উড়ে যায় যে বার পেটের ধান্দায়।

মাথা তুলে বাইরে চাইল সমীদ। ভোর হয়ে গেছে। ডান দিকের ঈষৎ খোলা জানালা দিয়ে চাইলে নজরে পড়ে রমা দেবীর ঘরের

সামনে বারান্দার খানিকটা অংশ। সমীদ দেখল পাথরের মূর্তির মতো এই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রমা দেবী। উঠে আলো নিবিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সমীদ।

মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে রমা দেবী বললেন, কাল সারারাত ঘুমোসনি—অসুখ-বিসুখ করেনি তো খোকা?

কি জবাব দেবে? ভোরবেলা মায়ের কাছে একরাশ নির্জলা মিথ্যা বলতেও প্রবৃত্তি হয় না। একটু ইতস্ততঃ করে প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে সমীদ বলে, অনেক দিন কাশীতে যাওনি—চল না মা, দিন কতক ঘুরে আসবে!

তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন রমা দেবী। সে দৃষ্টি সইতে পারে না সমীদ, তাড়াতাড়ি ঘরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

॥ সতেরো ॥

আরও তিনমাস পরের কথা। নদীর ঢেউএর মত একঘেয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে সময়।

গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়েই রায় বাহাদুরের তর্জন-গর্জন শুনে তাপস, সমীদ ও ক্ষণিকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রায় বাহাদুর বলছিলেন, কোনও কথা শুনতে চাইনে, তিন দিনের মধ্যে বাড়ি মেরামত চুনকাম সব শেষ করা চাই।

আস্তে কে যেন কি বললে, শুনতে পাওয়া গেল না, গেল রায় বাহাদুরের বাজখাঁই আওয়াজ। তুমি বলছ কি রহমৎ? মিস্ত্রিগিরি করে চুল পাকালে আর তুমি বলছ কি না এতবড় বাড়ির কাজ শেষ করতে সাতদিন লাগবে? এটা কলকাতা শহর, পয়সা দিলে এখানে বাঘের দুধ পাওয়া যায়। বেশ, লোক বাড়িয়ে দাও। দশজন বিশজন দরকার হয় পঞ্চাশজন লোক লাগাও। মোদ্দা কথা তিন দিনের বেশি সময় আমি দেব না।

হাসি মুখে তাপস ও সমীদকে নামতে ইশারা করে এগিয়ে চলল ক্ষণিকা বাইরের ঘরের দিকে। দরজার সামনে লুঙিপরা কয়েকজন মুসলমান মিস্ত্রি ক্লাসের লোক দাঁড়িয়ে আছে। কিছু দূরে ফরাসের সামনে ঢিলে পায়জামা পরে খালিগায়ে হাত দু'টো পিছনে দিয়ে খাঁচার বাঘের মত পায়চারি করছেন রায় বাহাদুর।

রহমৎ বললে, তাই হবে কর্তাবাবু আপনার হুকুমের নড়চড় যে হবে না, তা তো আমার জানাই আছে। কাল সকাল থেকেই কাজ আরম্ভ করে দিয়ে দিনরাত খেটে আপনার হুকুম মত কাজ শেষ করে দেব। খোকাবাবু কবে আসবেন বড়বাবু?

পায়চারি থামিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন রায় বাহাদুর। একটা বিশেষ

গোপনীয় কথা বলার ভঙ্গিতে গলাটা যথাসাধ্য খাটো করে বললেন, তোমার কাছে সত্যি কথাটা বলেই ফেলি রহমৎ। ওদের আসতে এখনও দশ বারো দিন দেরি হবে। কিন্তু তার আগে সব কাজ শেষ করে আমাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে তো! খদ্দের এলে দোকান সাজাব বলে বসে থাকা চলে কি?

আজ্ঞে তা কি চলে বড়বাবু!

---তাছাড়া খোকা একা এলে। কথা ছিল না, কিন্তু সঙ্গে আসছে আমার মা। ভারী কড়া মেয়ে—আমাকে খোকাকে ফাঁকি দিয়ে যা-তা বুঝিয়ে দিতে পার। কিন্তু তার কাছে তোমার চালাকিটি চলবে না তা কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি রহমৎ।

শশব্যস্তে রহমৎ বলে, আজ্ঞে বলেন কি কর্তা, কাজে ফাঁকি দেব আমি?

—দাওনি, কিন্তু দিতেও তো পার, তাই আগেই সাবধান করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আর দেখো রহমৎ, খোকা আর বউমার শোবার ঘরটা বেশ ভাল করে ডিস্‌টেম্পার কোরো। ঐ যে—উপরের পুব দিকে বড় ঘরটা। আজকালকার ছেলেমেয়ে তার উপর বিলেতে নানান দেশ ঘুরে আসছে---তোমার-আমার পছন্দ ওখানে অচল, এইটে বুঝে কাজ কোরো।

বাইরে বারান্দায় ক্ষণিকাকে দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে বললেন, এই যে এসে গেছ মা? তোমার কথাই ভাবছিলাম। তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এস।

তিনজনে ঘরে ঢুকে ফরাশের এক পাশে বসে পড়ল। রায় বাহাদুর রহমৎকে বললেন, শোন রহমৎ, এই আমার আর একটি মেয়ে। আর যে-সে মেয়ে নয় একেবারে এম. এ. পাস। এঁর পছন্দ মত ঘরের রঙ ডিস্‌টেম্পার সব করতে হবে। ভেবেছিলে যা-তা একটা করে আমাকে বোকা বুঝিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে সরে পড়বে, তা হচ্ছে

না। সব সময় এইটে মনে রেখে কাজ করবে, আমাদের সেকেলে পছন্দর সঙ্গে এদের পছন্দর আকাশ-পাতাল তফাত।

একগাল হেসে রহমৎ বলে, সে জন্যে আপনি ভাববেন না কর্তাবাবু।

কথা শেষ করেও লোকজন নিয়ে রহমৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে রায় বাহাত্বর বললেন, কথা তো পাকাপাকি হয়ে গেল, আর কিছু বলবে আমায় রহমৎ ?

রহমৎ কিছু বলবার আগেই ক্ষণিকা উঠে দাঁড়িয়ে কানে কানে কি একটা বলতেই হো হো করে হেসে উঠলেন রায় বাহাত্বর। বললেন বুঝলে রহমৎ, এই জন্যেই বলে লক্ষ্মীছাড়ার সংসার। রঙ দড়ি বাঁশ কেনবার জন্যে তোমাকে যে আগাম টাকা দেওয়া দরকার এই কথাটাই ভুলে বসে আছি, কণা মা সেইটেই মনে করিয়ে দিলেন। জয়ন্ত, জয়ন্ত!

ভিতর থেকে আওয়াজ এল' আজ্ঞে যাই কর্তাবাবু।

বাঘ ডেকে উঠল রায় বাহাত্বরের গলায়ঃ বলি রাত-দিন ভিতরে বসে কর কি ? দরকার হল এখানে, আর তুমি গা-ঢাকা দিয়ে ভিতরে বসে আছ কিসের জন্যে ? এই ফাঁকি দেওয়া অভ্যাসটা ছাড় জয়ন্ত। ভাল মানুষ পেয়ে আমাকে যা খুসী একটা বুঝিয়ে রেহাই পেয়ে যাচ্ছ, কিন্তু তোমাকে বধিবে যে বিলেত থেকে আসছে সে। এখন থেকে একটু হুঁশিয়ার হয়ে কাজ কোরো জয়ন্ত!

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জয়ন্ত বললে, আজ্ঞে—আমি তো এতক্ষণ এইখানেই ছিলাম। ক্ষণিকা দিদিমণিদের আসতে দেখে ঠাকুরকে লুচি ভাজতে বলে এলাম।

—ঢের হয়েছে, এই চাবি নাও—উপরে আমার শোবার ঘরের সিন্দুক খুলে একশো টাকা এনে রহমৎকে দিয়ে দাও। তাকিয়ার নিচে থেকে বড় চাবির গোছাটা নিয়ে জয়ন্তর দিকে ছুড়ে দিলেন রায় বাহাত্বর।

সঙ্গের লোকগুলোকে ডেকে নিয়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল রহ্‌মৎ।

ফরাশের ওপর বসে একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে রায় বাহাত্বর বললেন, তোমরা এলে কিসে কণা মা? গাড়ির আওয়াজ পাইনি তো।

সমীদ বললে,—আমরা ট্রামে এসেছি জ্যাঠামশায়।

—ট্রামে কেন? উত্তেজিত হয়ে সোজা উঠে বললেন রায় বাহাত্বর। —তিন তিনখানা গাড়ি আমার, গ্যারেজে পড়ে থেকে কলকব্জায় মরচে ধরে যাচ্ছে, আর তোমরা এলে কি না ট্রামে! নাঃ, এই জয়ন্ত আমায় পাগল না করে ছাড়বে না। হাজার বার বলেছি, দেখ জয়ন্ত, সমীদ কলেজ থেকে সোজা এখানে চলে আসবে—অল্প পথ, ওকে গাড়ি না পাঠালেও চলবে। কিন্তু আমার কণা মা তাপস আসবে ভবানীপুর থেকে, ওদের গাড়ি পাঠাতে যেন ভুল না হয়। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

আরও অনেক কিছুই বলে যেতেন রায় বাহাত্বর। বাধা দিয়ে ক্ষণিকা বললে, ওঁর কোনও দোষ নেই জ্যেঠাবাবু,—আজ সমীদের কলেজ বন্ধ। আমাদেরও ত্বপুরটা কাটতে চাইছিল না—তাই তিনটের শোতে সমীদকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেট্রোয় সিনেমা দেখছিলাম।

একটা হিন্দুস্থানী চাকর এসে তাওয়া বসানো প্রকাণ্ড কলকেটা গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে দিয়ে গেল। পরম তৃপ্তিতে নলটা মুখে দিয়ে তাকিয়ায় কাত হয়ে বসলেন রায় বাহাত্বর। ক্ষণিকা বললে, বিলেতের চিঠি পেয়েছেন জ্যাঠাবাবু?

—হুঁ। খোকা লিখেছে' বৌমা এখন খুব ভাল আছে। ইটালি, জার্মানী; প্যারিস সব দেশ কটা ঘুরে আসছে। খুব দেরি হলেও দিন পনেরোর মধ্যে ওরা লণ্ডনে পৌঁছে যাবে।

—আমাকেও সুমিতা ঐ কথাই লিখেছে। প্রতি চিঠিতে আপনার

কথা, বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা কথায় গল্পে গানে—

হঠাৎ থেমে গিয়ে চুপ করে যায় ক্ষণিকা।

উৎসাহে সোজা হয়ে বসে রায় বাহাদুর বললেন, সত্যি কখনও গোপন থাকে না—একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বেই। তোমাকে প্রথম দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম তুমি গান গাইতে পারো। কিন্তু এই অরসিকের কাছে রস পরিবেশন করতে তোমার প্রবৃত্তি হয়নি আর না হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমার এই কাটখোট্টা উগ্রচণ্ডাল মূর্তির ত্রিসীমানায় গান বা কবিতা আসতে ভয় পায় এইটেই সবাই জানে, কিন্তু মা বর্ণচোরা আমের মত আমার এই বাইরের খোলসটা ভেদ করলে বুঝতে পারতে কত বড় অবিচার আমার ওপর করা হয়। তখন গহরজানের নাম হাটে মাঠে ঘাটে। একদিন জয়ন্তকে ডেকে বললাম—জয়ন্ত!

ঘরের চারদিকে চেয়ে চীৎকার করে উঠলেন রায় বাহাদুর,—জয়ন্ত, জয়ন্ত! বাইরে থেকে আওয়াজ এল,— আজ্ঞে যাই কর্তাবাবু।

পরমুহূর্তে ঠাকুরের সঙ্গে দু'খানা ট্রেতে লুচি তরকারি মিষ্টি প্রভৃতি নিয়ে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল জয়ন্ত।

রায় বাহাদুর বললেন, দরকারি কথাগুলোর সময় কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে থাক বলো তো?

—আজ্ঞে দাঁড়িয়ে থেকে খাবারগুলো তৈরি করিয়ে আনছিলাম।

—একটা না একটা মোক্ষম কৈফিয়ৎ ঠোঁটের ডগায় লেগে আছেই। দেখ দিখিনি সব গুলিয়ে দিলে আমার!

ঈষৎ হেসে জয়ন্ত বললে, আজ্ঞে সেবার গহরজান বাঈজীকে বাড়িতে এনে গান শুনে খুসী হয়ে গিন্নীমার জড়োয়া নেকলেশ একটা আর পাঁচশো টাকা দিয়েছিলেন সেই কথাই তো বলতে চাইছেন?

মনে মনে খুসী হলেও তার আমেজটা রূঢ় কণ্ঠের আবরণে যথাসাধ্য চেপে রায় বাহাদুর বললেন, ঢের হয়েছে। এখন যাও ওপরে খোকার ঘরটা খুলে দাও আর অর্গানটা একটু ঝেড়ে পুঁছে পরিষ্কার করে রাখ, আমরা উপরে যাচ্ছি কণা মার গান শুনতে।

---আজ্ঞে রোজ আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খোকার ঘর পরিষ্কার ফিটফাট করে রাখি' এক কুচি ধূলোও জমতে পারে না।

---এখানে দাঁড়িয়ে কথার তুবড়ি না ছুটিয়ে কাজ কর জয়ন্ত, কাজ।

হতাশ করুণভাবে একবার ক্ষণিকার দিকে চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় জয়ন্ত।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই প্রকাণ্ড চওড়া বারান্দা। তেল চকচকে পরিষ্কার ঝকঝকে মোজেইক মেজেতে ছায়া পড়ে। বারান্দা বেয়ে বরাবর গিয়ে পুব দিকের ঘরটা অরুণাংশুর। মেজেয় দামী কার্পেট পাতা পুবের দেওয়াল ঘেঁষে বহুমূল্য পালঙ্ক। মধ্যস্থলে কয়েকটি গদীমোড়া চেয়ার। একপাশে মেহগনির বুককেশ বাংলা ইংরেজী বইয়ে ভর্তি। দেওয়ালে অরুণাংশুর মায়ের একখানা তৈলচিত্র। অপর দিকের দেওয়ালে অরুণের বাল্য বয়সের একখানা এনলারর্জড ফটোগ্রাফ। পশ্চিমের দেওয়াল ছুঁয়ে ডোয়ার্কিনের একটা দামী অর্গান সামনে গদীমোড়া একটা টুল। অর্গানের উপরে একটা ফুলদানি তাতে তাজা সুগন্ধি ফুলের মোটা স্তবক।

ঘরে ঢুকে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে রায় বাহাদুর বললেন, খোকা বিলেত যাবার পর আর এ ঘরে ঢুকিনি মা। শূন্য বাড়িতে মনটা খাঁ খাঁ করে।

সবাই বসলে রায় বাহাদুর বললেন, তুমি একটা গান শোনাও মা।

ভাল গাইতে পারে না, তার উপর নিয়মিত অভ্যাসের অভাব, তবুও আপত্তি না করে নিচু টুলটায় বসে অর্গানের ঢাকনিটা তুলে গান ধরে ক্ষণিকা---

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

দিনক্ষণ আর মেজাজের ওপর বোধ হয় গান গাওয়াটা অনেকখানি নির্ভর করে, নইলে বার বার শোনা গানটা সেদিন এত ভাল লাগত না তাপস আর সমীদের কাছে। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন রায় বাহাতুর, বললেন, এতদিন বুড়ো ছেলেকে বঞ্চনা করে এসেছ মা, আর তোমাকে ছাড়ছিনে।

অনেকগুলো গান পর পর গাইল ক্ষণিকা। রবীন্দ্র-সঙ্গীত থেকে রামপ্রসাদের দেহতত্ত্ব পর্যন্ত। থমথমে নিস্তব্ধ ঘরে বেরোবার পথ খুঁজে না পেয়ে সুর ঘুরে বেড়ায়। কথা কইতে সাহস পায় না কেউ, চুপ করে বসে থাকে।

জয়ন্ত দরজার কাছ থেকে ভয়ে ভয়ে জানায় দৌলৎরাম বলে একটা ধনী মাড়োয়ারি তাপসকে খুঁজতে গাড়ি নিয়ে এসেছে।

সুর কেটে যায়। অবাক্ হয়ে তাকায় ক্ষণিকা আর সমীদ তাপসের দিকে। অতগুলো কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে যেন তাপস। মামুলি কৈফিয়তের সুরে বলে—একটা নতুন বিজনেসের ব্যাপারে এসেছে বোধ হয়।

সমীদকে লক্ষ্য করে বলে, তুই ক্ষণিকাকে পৌঁছে দিস—আমার ফিরতে হয় তো রাত হবে।

কোনোদিকে না চেয়ে কারও উত্তরের অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তাপস।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সবাই।

রায় বাহাতুরই প্রথমে কথা বলেন, ব্যবসা-ভূতে তাপসকে পেয়ে বসেছে। তুমি একটু রাসটা কষে ধর কণা মা।

উত্তরে ম্লান হাসি হাসে ক্ষণিকা, জবাব দেয় না।

গান গল্প কিছুই আর জমে না। রাত বেড়ে যায়। ক্ষণিকাকে নিয়ে সমীদ গাড়িতে ওঠে।

সারা পথটা চুপচাপ কেটে যায়। কথা যেন বাইরে আসবার পথ হারিয়ে মনের গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরপাক খেয়ে মরে।

ক্ষণিকার বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামল। নেমে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকা বললে, পাঁচ মিনিটের জন্য নামবে?

ইতস্ততঃ করে সমীদ।

—ভয় নেই হরিকাকা এখনও জেগে আছে। ক্ষণিকার গলায় পরিহাসের তরল সুর। গাড়ি থেকে নেমে সমীদ ড্রাইভারকে চলে যেতে বলে। বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ড্রাইভার রামসহায় বলে, আপনি ঘুরে আসুন দাদাবাবু। যত রাতই হোক আপনাকে পৌছে দিয়ে না এলে কর্তাবাবু আমাকে আস্ত রাখবেন না।

নিঃশব্দে ক্ষণিকার সঙ্গে উপরে উঠে যায় সমীদ।

উপরের ঘরের দরজা খুলে দিয়ে হরিরাম বললে, একটু আগে খোকাবাবু ফোন করেছিলেন বৌমা—তোমাকে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তে বললেন—ওর ফিরতে রাত হবে।

হরিরাম চলে গেলে ক্ষণিকা বললে,—এই রকম রোজই হয় আজকাল।

কোনও জবাব না দিয়ে চেয়ারটায় গুম হয়ে বসে পড়ে সমীদ।

পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে কোনও রকম ভূমিকা না করে ক্ষণিকা বললে, আগের মত আজও আমায় ভালবাস সমীদ?

অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত প্রশ্ন। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে সমীদ।

ক্ষণিকা। খুব অবাক্ হয়ে গেছ, না? আজ এটা ঝালিয়ে নেবার প্রয়োজন হয়েছে।

সমীদ। বাসি।

—তাহলে তোমার বন্ধুকে বাঁচাও। পয়সা রোজগারের নেশায় উন্মাদ হয়ে আজ ও জাহান্নামের পথে ছুটে চলেছে। নগদ টাকা-কড়ি যা ছিল ব্যবসা করতে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে শুধু আমার শাশুড়ীর হাজার পনেরো টাকার গহনা, তাও যে কতদিন থাকবে বলতে পারি না। শুনছি আজকাল রেস খেলতেও শুরু করেছে।

—সে কি? তুমি বাধা দাও না কেন? বিস্ময় ও উত্তেজনায় গলা কেঁপে যায় সমীদের।

—লাভ কি? ওকে জানতো—ভীষণ জেদী ও একগুঁয়ে। যা একবার মাথায় ঢুকবে ন্যায় হোক অন্যায় হোক নিজে থেকে ধাক্কা না খেলে থামবে না। এখনও খানিকটা ভয় করে তোমাকে, তাই বলছিলাম—।

—তাপস আছ হে! বাইরে রাস্তা থেকে কে ডাকল।

সমীদ ও ক্ষণিকা দুজনেই উঠে এসে জানালায় দাঁড়াল। পরিষ্কার দেখা যায় না—কে একজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। সমীদ বলে,—কে?

—আরে সমীদ যে! চাইলাম দুধ পেলাম ঘোল! ভাল, ভাল। তা তোমাকেই বলি—দয়া করে তাপসকে একবার নিচে পাঠিয়ে দাও বড্ড দরকার।

লোকটার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে সমীদ বলে, কে আপনি?

—ও হরি! চিনতেই পারলে না? তা পারবে কি করে। গরীব দুঃখীকে আজকাল কেই-ই বা চিনতে পারে। আমি সন্তোষ। আপনাদের সঙ্গে দু'বছর এম. এ. পড়বার সৌভাগ্য 'হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্য মন্দ পাস করতে পারলাম না' এবার অধীনকে চিনলেন কি?

সমস্ত ক্লাসের মধ্যে এ রকম নীচ ও জঘন্য মনোবৃত্তি সম্পন্ন ছেলে

আর ত্রুটি ছিল না। অধিকাংশ ছেলে, বিশেষ করে সমীদ তাপস ও ক্ষণিকা সযত্নে সন্তোষের সান্নিধ্য পরিহার করে চলতো। তাপসের এতখানি অধঃপতন কল্পনাও করতে পারেনি সমীদ। ইচ্ছে হচ্ছিল জানলাটা হতভাগার মুখের ওপর বন্ধ করে দিতে, কিন্তু তাতে ফল আরও খারাপ হতে পরের মনে করে সংযত কণ্ঠে বললে, তাপস একটা বিশেষ কাজে বেরিয়ে গেছে, ফিরতে দেরি হবে। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে কি দরকার আমাদের কাছে বলতে পার।

এতটা কুৎসিত হাসিতে নির্জন রাস্তাটা সচকিত করে সন্তোষ বলে, ঐ যে কথায় বলে না -অনেক মেয়ে সতী আছেন ধরা পড়েছেন রাধা। তাপস রাত্তির করে বাড়ি ফিরলে—সেটা হয় বিশেষ কাজ। আর আমরা —যাগগে, কথাটা বলেই যাই। তাপসকে বলাও যা তোমাকে বলাও তা। নির্লজ্জ রসিকতায় আবার খানিক হেসে নেয় সন্তোষ। তারপর বলে, বোলো—রেসের মাঠের ঋণ তাগাদা না করতে দিয়ে দেওয়াই নিয়ম। হয়তো নিয়ম-কানুনগুলোতে এখনও পাকা-পোক্ত হয়ে ওঠেনি, তাই মনে করিয়ে দিতে এলাম। পরশু মানে শনিবারে মাঠে যেন টাকাটা না চাইতেই পাই। চললাম ভাই, অসময়ে তোমাদের ডিস্টার্ব করার জন্য দুঃখিত।

জানলার গরাদে ধরে বাইরের অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিল ক্ষণিকা। ওর মুখের দিকে চাইতেও সাহস হচ্ছিল না সমীদের। হাত ঘড়িটার ওপর চোখে বুলিয়ে বললে, রাত প্রায় বারোটা বাজে। তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় ক্ষণিকা। আমি ভেবে দেখি কি করা যায়।

রায় -স্ট্রীট ছেড়ে ল্যান্সডাউন রোডে পড়বার বাঁকের মুখে গাড়ি থেকে উঁকি দিয়ে দেখল সমীদ—ছায়া মূর্তির মত তখনও জানলায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ক্ষণিকা।

॥ আঠারো ॥

শনিবার। শোবার ঘরে টেলিফোনটার সামনে একখানা চেয়ারে বসে রেসিং গাইডের পাতা ওলটাচ্ছিল তাপস আর মাঝে মাঝে ফোনে অব্যর্থ টিপ সংগ্রহ করে বইটায় লাল পেনসিলের দাগ টেনে, পরম তৃপ্তিতে চায়ের কাপটায় চুমুক দিচ্ছিল।

পাশে বসবার ঘরে একলা বসে সেদিনকার দৈনিক সংবাদ পত্রটির মোটা হেডলাইনগুলোর ওপর নির্লিপ্ত চোখ বোলাচ্ছিল ক্ষণিকা। ভ্রাম্যমাণ চোখ দুটো এক জায়গায় এসে স্থির ও বিস্ফারিত হয়ে গেল। ক্ষণিকা পড়ল মোটা মোটা হরফে লেখা,—

মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা

লণ্ডন হইতে ভারতগামী ডাকোটা বিমান করাচীর কিছু দূরে ভস্মীভূত।

একটি প্রাণীও রক্ষা পায় নাই।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়ে গেল ক্ষণিকা বিস্তৃত বিবরণ—

'বৃহস্পতিবার লণ্ডনের ক্রয়ডেন বিমান ঘাঁটি থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার যাত্রী বোঝাই বিমানখানি রওনা হইয়া নিরাপদে নির্দিষ্ট সময়ে তেহারান বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছে। রাত্রিটা তেহারান এয়ারোড্রাম হোটেলে কাটিয়ে পরদিন প্রত্যুষে যাত্রী লইয়া করাচী অভিমুখে রওনা হয়। মধ্যপথে হঠাৎ এঞ্জিনে আগুন লাগিয়া এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রী ও কর্মচারী লইয়া সর্বসমেত প্রায় আশিটি নরনারী শিশু এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছে। কেহই রক্ষা পায় নাই। লণ্ডন অফিস হইতে প্রাপ্ত তালিকায় নিম্নলিখিত নিহত যাত্রীদের পরিচয় জানা যায়।

১। মেজর কুন্দন সিং

২। মিঃ ও মিসেস টি. আর. আহমেদ

৩। .মিসেস রোজি ম্যাকডোনাল্ড।

৪। মিস লিলি (ঐ কন্যা)

৫। মিঃ ও মিসেস এ. বসু।

নিচে কলম ভর্তি অসংখ্য বিভিন্ন জাতীয় হতভাগ্য যাত্রীদের নাম। কিন্তু পড়বার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ক্ষণিকার পঞ্চম সংখ্যার নাম দুটির ওপর দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই, মিঃ ও মিসেস এ. বসু! সারা দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল ক্ষণিকার। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়াল ক্ষণিকা—হাত থেকে কাগজগুলো ছড়িয়ে পড়লো নিচে কার্পেটের ওপর। পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে তাপস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক্ হয়ে কিছুক্ষণ ক্ষণিকার দিকে চেয়ে বলল—কি হল?

হাত দিয়ে কাগজগুলো দেখিয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল ক্ষণিকা। পিছন থেকে ধরে ফেলে আস্তে আস্তে চেয়ারটায় বসিয়ে দিয়ে তাপস ডাকল, হরি কাকা!

সিঁড়ির পাশে ছোট্ট ঘরটায় হরিরাম থাকে। তাপসের আর্তকণ্ঠ স্বরে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললে, ব্যাপার কি খোকাবাবু?

—শিগগির এক গ্লাস জল নিয়ে আসুন।

পাখা খুলে দিয়ে চোখে মুখে জলের ছিটে দেবার কিছু পরে চোখ মেলে চাইল ক্ষণিকা। তাপস বললে, চল তোমায় শুইয়ে দিয়ে আসি।

ক্ষীণ-কণ্ঠে প্রতিবাদ করে ক্ষণিকা বললে, সুমিতা—অরুণাংশু এরা—

কথা. শেষ করতে পারে না। কান্নায় কণ্ঠ রোধ হয়ে যায়।

কিছুই পরিষ্কার বুঝতে না পেরে উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করে তাপস, সুমিতা অরুণের কি হয়েছে? অতিকষ্টে ক্ষণিকা বলে, কাগজের ফ্রণ্ট পেজটা ছাখো!

সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে তাপস বলে, কী সর্বনাশ !

হাতের ওপর ভর দিয়ে অতিকষ্টে সোজা হয়ে বসে ক্ষণিকা বলে, তুমি হরি কাকাকে একটা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠাও। এখুনি একবার জ্যাঠা মশায়ের কাছে যাওয়া দরকার।

আদেশের অপেক্ষা না করেই হরিরাম ছুটে যায় ট্যাক্সি আনতে।

চেয়ারের হাতার ওপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে ক্ষণিকা। সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায় না তাপস। বিমূঢ়ের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

তখুনি এসে যায় ট্যাক্সি। উঠে দাঁড়িয়ে চলতে গিয়ে তাপসের কাঁধে মাথা দিয়ে অশ্রু সজল চোখ তুটো ওর মুখের ওপর ফেলে শুধু বলে, কী করে এই নিদারুণ সংবাদ আমি জ্যাঠাবাবুকে দেব—তুমি বলে দাও।

জবাব না দিয়ে ক্ষণিকার কম্পমান দেহটাকে তুহাতে জড়িয়ে ধরে নীরব সান্ত্বনা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে তাপস।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের 'বোস ভিলায়' পৌঁছে ক্ষণিকা ও তাপস দেখল, নিচে চওড়া বারান্দার মেজেতে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে জয়ন্ত, পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বিবর্ণ মুখে চুপ করে বসে আছে সমীদ।

ক্ষণিকাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল জয়ন্ত, বললে, দিদি-মণি, এসেছ তুমি ? কর্তাবাবুকে বাঁচাও।

অনেক রকম প্রশ্নকরে জয়ন্তর কাছে মোটামুটি ব্যাপারটা যা জানা গেল তা এই।—

রোজ ভোরে উঠে বাড়ির সামনে বাগানে পায়চারি করা রায় বাহাতুরের বহুদিনের অভ্যাস। আধ ঘণ্টা পায়চারির পর বাইরের ঘরের ফরাশের ওপর বসবার সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজটা এনে দেয়

জয়ন্ত। . হিন্দুস্থানী চাকর রামধনিয়া প্রকাণ্ড কলকেতে সুগন্ধি তামাক সেজে এনে গড়গড়ায় বসিয়ে নলটা তুলে দেয় রায় বাহাদুরের হাতে। কলকের আগুন নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাগজ পড়াও শেষ হয়। প্রাতকৃত্য ও পূজা শেষ করতে উপরে উঠে যান রায় বাহাদুর। কোন দিনও এর ব্যতিক্রম হবার যো নেই। আজও নিয়ম মত প্রাতঃভ্রমণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা খবরের কাগজটা এনে দেয় জয়ন্ত। কয়েক দিনের ছুটিতে রামধনিয়া দেশে গেছে—তামাক সাজার ভারও জয়ন্তর ওপর পড়েছে। একটু পরে তাওয়ায় ফুঁ দিতে দিতে ঘরে ঢুকে দেখল জয়ন্ত ফরাশের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন রায় বাহাদুর। হাতের মুঠোর মধ্যে খবরের কাগজটা দলামলা পাকানো। প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে কি করবে না করবে ভেবে পায় না জয়ন্ত। হাতের মুঠো থেকে অতি কষ্টে কাগজটা বার করে প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়েই ব্যাপারটা অনুমানে বুঝে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঠাকুর দারোয়ান ড্রাইভার এদের ডেকে এনে কর্তাবাবুকে সুস্থ করবার চেষ্টা করে। জ্ঞান ফিরে এলে নিজেই উঠে বসেন রায় বাহাদুর। তারপর ওদের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। বলা শেষ করে আবার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে জয়ন্ত। একটু সামলে নিয়ে বলে, জ্ঞান হবার পর একটি কথাও বলেননি কর্তা-বাবু—আর চোখেও এক ফোঁটা জল দেখতে পেলাম না। আমি যে বাবুকে চিনি দিদিমণি। তোমরা এখুনি একটা উপায় কর নইলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে।

জয়ন্তকে মৌখিক সান্ত্বনা দিয়ে তিনজনে সেজা উঠে আসে উপরে। রায় বাহাদুরের ঘরের বন্ধ দরজার এপাশ থেকে ক্ষণিকা ডাকে, জ্যাঠা-বাবু! আমি ক্ষণিকা!

কোনও সাড়া পাওয়া যায় না।

সভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সমীদ এগিয়ে এসে

দরজায় মৃদু করাঘাত করে বলে,—জ্যাঠামশাই দোর খুলুন, ক্ষণিকা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় !

দরজার ওপাশ থেকে ধীর শান্ত কণ্ঠে জবাব আসে,—কণা মা—তোমরা আজ ফিরে যাও। ভয় নেই, আত্মহত্যা বা ঐ রকম একটা কিছু কোরবো না আমি। শুধু কয়েকটা দিন একা থাকতে দাও আমায়। জীবনে অনেক ধাক্কাই সামলে নিয়েছি—কিন্তু এ বয়সে এরকম একটা ধাক্কা—তাই একটু বেশি সময় চাইছি তোমাদের কাছে।

নিঃশব্দে নিচেয় নেমে আসে তিনজনে। জয়ন্ত সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, কি হল দিদি ? ক্ষণিকা বলে, ভয় নেই, তবে উনি নিজে থেকে দরজা না খুললে—সাধ্য সাধনা বা কান্না-কাটি করে খোলান যাবে না।

আর এখানে অপেক্ষা করা বৃথা। তিনজনে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

ট্রাম স্টপেজে এসে সমীদ বললে, আমি আর এখন তোমাদের ওখানে যাব না। মাকে খবরটা না দিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম ; তাঁকে বোঝাব কি করে তাই ভাবছি।

ভগবান আঘাত যেমন দেন—সইবার ক্ষমতাও সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেন, নইলে এতদিনে মানুষ হয় পাগল নয়তো মরে ভূত হয়ে যেত।

ঠিক তিন দিন বাদে রায় বাহাদুর দরজা খুলে বাইরে বেরুলেন। এই ক'দিন দুবেলা ক্ষণিকা, সমীদ ও তাপস এসে খোঁজ নিয়ে গেছে। জয়ন্ত বললে, অনেক কান্না-কাটি করে কিছু ফল দুধ আর মিষ্টি খাইয়েছি এ কদিন। তাও আমাকে ঘরে ঢুকতে দেননি—বাইরে রেখে যেতে বলেছেন। কর্তাবাবুর কাছে গালাগাল না খেলে আমার মনে হয় দিনটাই বিফলে গেল। তোমরা বোসো দিদিমণি, কর্তাবাবু এখনই নিচে নামবেন।

একটু বাদে একটা মোটা লাঠি হাতে ধীরে মন্থর ভাবে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন রায় বাহাদুর পিছনে জয়ন্ত। এ যেন অন্য মানুষ।

মাত্র তিন দিনে দৈত্যের মত মানুষটার এরকম পরিবর্তন চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে মন চায় না। চুল থেকে শুরু করে ভুরু গোঁফ সব পেকে দুধের মত সাদা হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড নিটোল গোল মুখটায় বার্ধক্যের কয়েকটা রেখা এরই মধ্যে কায়েমী আসন পেতে নিয়েছে। নদীতে পরিপূর্ণ জোয়ার দেখার পর নির্দয় ভাঁটায় তার নিঃশেষিত দীন মূর্তি দেখলে মনের অবস্থা যা হয়—দুর্দণ্ডপ্রতাপ রায় বাহাদুর হিরণ্যকশিপু বোসকে দেখলেও অকারণ মনটা হু হু করে কেঁদে ওঠে।

কথা যোগায় না। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে পরম যত্নে ফরাশের ওপর অভ্যস্থ আসনে বসিয়ে দেয় ক্ষণিকা।

সবাই চুপ করে থাকে। জয়ন্ত এসে ভয়ে ভয়ে গড়গড়ার নলটা এগিয়ে ধরে। ম্লান হেসে সেটি হাতে নিয়ে রায় বাহাদুর বললেন, ঠাকুরকে বলে দাও কণা মাদের চা জল খাবার এখানেই পাঠিয়ে দিতে।

জয়ন্ত চলে যাচ্ছে দেখে বললেন, আর রহমৎকে বলে দাও বাড়ি রঙ্ করার আর দরকার হবে না। ওর যা পাওনা হয়েছে মিটিয়ে দাও।

ক্ষণিকা বললে, আমি আপনার অনুমতি না নিয়েই রহমৎকে আসতে মানা করে দিয়েছি জ্যাঠামশায়! নিঃশব্দে খানিকক্ষণ ধুমপান করে কতকটা আত্মগত ভাবেই রায় বাহাদুর বললেন,—আর জন্মে কত লোককে মর্মান্তিক আঘাত দিয়ে এসেছি—তারই শোধবোধ হয়ে গেল এবার।

একটু থেমে বলেন,—ঠিক করেছি এ বাড়িটা বিক্রি করে দেব কণা মা। বরানগরে গঙ্গার ধার ঘেঁষে একটা বাড়ি আছে আমার, সেইখানে গিয়ে থাকবো। কিন্তু তোমরা কি কষ্ট করে অতদূরে এই ভূষণ্ডি কাককে দেখতে যাবে মা?

রায় বাহাদুরের হাতখানা ধরে কেঁদে ফেলে ক্ষণিকা, বলে,—

ও কথা বলবেন না জ্যাঠাবাবু! যতদিন বেঁচে থাকবেন—আপনার সেবা করতে পেলে আমি ধন্য হয়ে যাব জ্যাঠাবাবু!

চোখ বুজে ক্ষণিকার মাথায় হাত রেখে মনে মনে বোধ হয় আশীর্বাদ করেন রায় বাহাদুর। সমীদ বললে, আমি কালকে মাকে নিয়ে কাশী যাচ্ছি জ্যাঠামশায়।

—যাওয়া খুবই দরকার, ওঁরও তো আঘাত কম লাগেনি। কতদিন থাকবে?

একটু ইতস্ততঃ করে সমীদ বলে, ঠিক বলতে পারছিনে।

—কলেজ থেকে কদিনের ছুটি নিয়েছ?

—চাকরী আমি ছেড়ে দিয়েছি।

শুধু রায় বাহাদুর নয়, তাপস ও ক্ষণিকা অবাক হয়ে তাকায় সমীদের দিকে।

অন্য কোনও প্রশ্ন আসবার আগে সমীদই বলে যায়,—মাকে কাশীতে রেখে দিন কতক ঘুরে বেড়াব! তারপর, একদিন আসব ফিরে।

উৎসাহ-বর্জিত নির্জীব কথা—সত্যের স্বাক্ষর নেই।

হাত ঘড়িটা দেখে তাপস বলে, ঠিক দশটায় আমার একটা জরুরি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। আমি উঠছি, তুমি পরে এস ক্ষণা।

দরজার কাছ বরাবর যেতেই ক্ষণিকা ডেকে বলে,—দুপুরে বাড়ি ফিরবে না নিশ্চয়ই।

—না মানে—হয়তো।—

—তাই জেনে নিলাম। আমি এ বেলা বাড়ি ফিরবো না—নিজে হাতে রান্না করে জ্যাঠাবাবুকে খাইয়ে রাত্তিরে ফিরবো।

রাত্রে রায় বাহাদুরকে খাইয়ে শোবার ঘরে বিছানায় শুইয়ে জয়ন্তকে নিয়ে ক্ষণিকা যখন বাড়ি ফিরল—রাত তখন এগারটা বেজে গেছে। উপরের দরজা খোলাই ছিল। সিঁড়ির মাথায় একটা ভাঙা চেয়ারে

বসে হরিরাম ঘুমে ঢুলছিল। সাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়াতেই ক্ষণিকা বললে, বাবু ফেরেননি এখনও ?

—না মা।

আর কোনও কথা না কয়ে সোজা শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল ক্ষণিকা। কাপড় ছাড়তে গিয়ে দীর্ঘ আয়নাটায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল ক্ষণিকা। মাত্র এই কয়েকদিনে দেহের কী অদ্ভুত পরিবর্তন। আগে যেটা সন্দেহের অন্ধকারে আত্ম-গোপন করেছিল, মাত্র ক'টি দিনের অবহেলার সুযোগ নিয়ে আজ সেটা যেন নগ্ন-সত্যের রূপ ধরে দেহের আনাচে কানাচে নির্লজ্জের মত দাঁত বার করে হাসছে।

স্থান কাল পাত্র ভুলে আয়নায় নিজের অর্ধ নগ্ন দেহটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে স্থাণুর মত বসে রইল ক্ষণিকা!

মাতালরা বলে—মদ কখনও বেইমানী করে না। কথাটা ষোলো আনা সত্যি নয়। দুঃখ শোক চাপা দেবার জন্যে মানুষ যখনই ঐ সর্বগ্রাসী দেবতাটির আরাধনা করে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উনি তখন সাড়া না দিয়ে লুকোচুরি খেলতে থাকেন। তাপসের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হল না। রেসের মাঠে অর্ধেক দামে মায়ের গহনা বিক্রির টাকাগুলো যখন এক এক করে উধাও হয়ে গেল, তখন খানিকটা চৈতন্য ফিরে এল তাপসের। কোটের চোরা পকেটটায় হাত পড়তেই হঠাৎ আবিষ্কার করল গোটা পঞ্চাশেক টাকা শনির দৃষ্টি এড়িয়ে তখনও অবশিষ্ট আছে। কাল বিলম্ব না করে সোজা পথে এসে দ্বিগুণ ভাড়ায় একটা ট্যাক্সি রফা করে নিয়ে চৌরঙ্গির মোড়ে নেমে পড়ল তাপস।

কাছাকাছি ছোট বড় অনেকগুলো বার। সব কটাই প্রায় খালি মৌতাতের সময় হয়নি বলে। ওরই একটায় ঢুকে পড়ল তাপস। প্রকাণ্ড লম্বা ঘর—মাঝখানে সারবন্দী টেবিল চেয়ার পাতা। দুধারে

কাঠের পার্টিশন করা ছোট ছোট খুপরি কেবিন। স্ত্রীলোক সঙ্গে এনে মদ খেয়েও যারা চরিত্র ও সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে চায় বোধ হয় তাদের জন্যে। ওরই একটার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাপস অর্ডার করল—হুইস্কি।

হুইস্কির পর হুইস্কি পেগের পর পেগ। সময়ের সঙ্গে নেশার পাল্লা। তবুও বিস্মৃতি আসে না আসে অবসাদ দুঃখ।

পাশের কেবিনে কারা হৈ হল্লা করে ঢুকে পড়ল। একটু পরেই পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে আসতেই তাপস সোজা হয়ে বসল।

—সত্যি করে বলতো সন্তা—আজ মাঠে কত জিতলি ?

সন্তোষ পকেট ভর্তি এক তাড়া নোট গুণে নিয়ে বললে,—গেল হপ্তার হার মেক আপ হয়ে গোটা পঞ্চাশ টাকা হবে।

বয় ট্রেসুদ্ধ গ্লাসগুলো টেবিলের ওপর রাখলো—ফটাফট শব্দ করে কয়েকটা সোডা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর শুরু হল গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে স্বাস্থ্যপান। কে একজন বলে উঠলো—লঙ্ লিভ্—

সুরে সুর মিলিয়ে সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল,—মডার্ণ ইভ্, হিপ হিপ হুররে···মডার্ণ ইভ্। সেদিনকার মাঠের জ্যাকপট ঘোড়া। অনেক আদমকেই জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইয়েছে।

সন্তোষ বললে,—'মডার্ণ ইভ্' আজ আমার বড় মুরুব্বিকে মাঠে শুইয়ে দিয়েছে।

—কে ?

—কার কথা বলছিস সন্তা ? দু তিনজন একসঙ্গে প্রশ্ন করে ওঠে।

সন্তোষ কিছু বলবার আগেই একজন বললে,—কে এখনও বুঝতে পারিসনি ? সন্তোষের ক্লাসমেট—অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, স্ত্রী ভাগ্যে ভাগ্যবান্ রায় শ্রীতাপস চৌধুরী বাহাদুর।

সমবেত হাসির দাপটে কেবিনটা থর থর করে কাঁপতে থাকে। বয় এসে আবার খালি গেলাসগুলো ভর্তি করে দিয়ে যায়।

সন্তোষ বললে, সত্যি বলছি নেপাল, এম. এ. পাস করে মানুষ যে এমন গবেট হতে পারে বিশেষ করে এই ফোর-টোয়েন্টির যুগে। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। শুধু যদি এম. এ. টা পাস করতে পারতাম, তাহলে দেখতিস সেরেফ তোদের মা বাপের আশীর্বাদে তু একটি শক্ত খুঁটো পাকড়ে --মোটা মাইনেতে একটা দায়িত্বপূর্ণ পোস্টে ঢুকে পড়ে টেবিল চেয়ারে বসে সবার নাকের ওপর দিয়ে লাখ লাখ টাকা কামাতাম। কি করব বরাত মন্দ, তাই তো পেটের দায়ে এইসব ছিঁচকেমি করতে হয়।

মদও বিস্বাদ লাগে তাপসের মুখে। কোনও রকমে মুখ বিকৃত করে কয়েক সিপ খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকে।

নেপাল বলে, যাই বল ভাই ওর বউটাকে দেখলে ঈর্ষা হয়।

সন্তোষ বললে, সেদিক দিয়েও তাপসের মত অত বড় আহম্মক তুনিয়ায় নেই। আমার ওরকম একটা বউ থাকলে এ যুগে চাকরির ভাবনা?

গলা খাটো করে কে একজন বললে, শুনতে পাই বউটার স্বভাব চরিত্রও ভাল নয়।

সন্তোষ প্রসঙ্গটা চাপা দেবার ভঙ্গিতে বলে, যেতে দাও ভাই ওসব ঘরের কথা হাটে-মাঠে আলোচনা না করাই ভাল।

মদের মুখে সুন্দরী স্ত্রীলোক ঘটিত পরচর্চা সোনায় সোহাগা, জেদ আরও বেড়ে যায় সবার। নেপাল উত্তেজিত ভাবে টেবিলে ঘুষি মেরে বলে—কার মুখ চাপা দিবি রে সন্তা? কে না দেখেছে বউটাকে রাতদিন ঐ সমীদ ছোঁড়াটার সঙ্গে, সিনেমা রেস্তরাঁ, নিউ মার্কেটে—মানিক জোড়ের মত বেপরোয়া ঘুরে বেড়াতে? আগে তিন জনকে এক সঙ্গে দেখা যেত। ইদানিং দেখছি স্বামীটাকে ছেঁটে দিয়েছে বউটা। হাজার হোক শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে তো!

সন্তোষ বললে, তোরা আর কি দেখেছিস, আমি নিজের চোখে

যা দেখেছি। রহস্যের আভাষটুকু দিয়ে ধীরে সুস্থে গ্লাসটা তুলে নিয়ে খেতে শুরু করে সন্তোষ। কথা না কয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করে থাকে সবাই।

খালি গ্লাসটা নামিয়ে রেখে অনুযোগের ভঙ্গিতে সন্তোষ বলে, তোদের কাছে সব কথা বলিনে কেন জানিস? পেটে কথা থাকে না বলে, বিশেষ করে যখন এক ফোঁটা মদ পড়ে। এই যে আমি—কত মাথা খেলিয়ে তাপসের মায়ের গহনাগুলো আমারই বিশেষ জানা জুয়েলারের কাছে প্রায় জলের দামে বিক্রি করে ওকে রেস খেলতে নামালাম। জানতে পেরেছিস কিছু? ভেতরের কথা জানি বলেই তো অত সহজে ওকে কুপোকাত করতে পারলাম।

অপরাধীর মত নেপাল বলে, সেই জন্যেই তো তোকে আমরা মানি—আপদে-বিপদে তোর কাছেই ছুটে আসি।

একটু থেমে ইতস্ততঃ করে বলে, তা তাপসের বউ সম্বন্ধে কি বলছিলি বল না ভাই! আমরা মা-কালীর নামে দিব্যিগালছি—কোন কথা এই কেবিনের বাইরে বেরোবে না কোনও দিন। কি রে?

পানোন্মত্ত গলায় সবাই এক সঙ্গে সায় দিয়ে ওঠে, কখনও না!

খুসি হয়ে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে গলা খাটো করে সন্তোষ বললে, সেদিন রাত তখন অনেক—বারোটা বেজে গেছে। ভাবলাম একবার তাপসের বাড়ি হয়ে যাই, কিছু টাকাও পেতাম তাছাড়া শনিবারের মাঠের রসদ কতদূর যোগাড় করল জেনে যাই। উপরের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে দেখে ভাবলাম ও এখনও শুয়ে পড়েনি। হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখি ঘরের মাঝখানে বউটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে, ভাবলাম নিশ্চয়ই তাহলে মোটা টাকা যোগাড় করেছে কোথা থেকে। ডাকলাম, তাপস আছ নাকি হে! চমকে চেয়ে দেখি তাপস নয়—বন্ধু সমীদ।

—অ্যাঁ, বল কি দাদা? অত রাত্রে?

—তবে আর বলছি কি। ডাক শুনে দুজনে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াল। তাপসের নাম করে আবার ডাকলাম। দুজনে এসে জানলার রেলিং ধরে দাঁড়াল। সমীদ বললে, কে আপনি? কাকে চান?

—তারপর?

—তারপর আর কি? পরিচয় দিতেই দুজনে চিনতে পারলে -কিন্তু কি আশ্চর্য দু'জনে এমনভাব দেখালে যেন কিছুই হয়নি।

ওদিকে জ্বলন্ত সিগারেটটা অবহেলার অভিমানে পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে আঙুলে ছ্যাঁকা দেয়। তাড়াতাড়ি সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে দুহাতে মাথার রগ দুটো চেপে ধরে তাপস।

সন্তোষ বলে যায়, তাপসটার জন্যে এক এক সময় সত্যিই দুঃখ হয়—বেচারার ঘরে বাইরে শনি. কোন্ দিক সামলাবে।

নেপাল বললে, শুনতে পাই বাড়িটাও নাকি মরগেজ।

—হ্যাঁ মাত্র কুড়ি হাজার টাকায়। গম্ভীরভাবে কথাটা বলে আরও পেগের জন্য শূন্য গেলাসটা টেবিলে ঠুকতে থাকে সন্তোষ।

সঙ্গে সঙ্গে সবার গ্লাস হুইস্কি ও সোডায় ভরতি হয়ে পড়ে।

নেশা চলে গেলে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে নেপাল বলে, বল কি হে, অত বড় বাড়িটা মাত্র বিশ হাজার টাকায়--

কথা শেষ করতে দেয় না সন্তোষ, বলে, ওরে আহম্মক, কম টাকা না বললে মরগেজ দিতেই রাজি হত না। ওকে জলের মত বুঝিয়ে দিলাম আজ তোমার টাকার দরকার, ভাবনা কি? অল্প টাকায় বাড়িটা মরগেজ রাখ- শনিবারে মাঠে দুটো অব্যর্থ আপসেট বলে দেব। রাত্রে এসে বুলাকিলালের নাকের ওপর টাকাটা ছুড়ে ফেলে দিও।

—বুলাকিলালের কাছে মরগেজ? তবেই আর বাড়ি উদ্ধার হয়েছে!

সন্তোষ অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, ঐ দেখ, নামটা কিছুতেই বলব না ভেবেছিলাম. মদের দোষই এই। যাগগে তোমরা এসব নিয়ে যেখানে সেখানে আলোচনা কর না।

—কত.

ইচ্ছে হচ্ছিল পার্টিশনের এপাশ থেকে একটা ঘুষি মেরে পাতলা তক্তা ভেদ করে সন্তোষের নাকটা ভেঙে চুরমার করে দিতে—অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল তাপস। বার বন্ধ হবার প্রথম ঘণ্টা হয়ে গেছে। বিল নিয়ে বয় এসে দাঁড়াল। পকেটে হাত দিয়ে অবশিষ্ট নোটগুলো দলা পাকিয়ে না গুনেই ট্রের ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়ল তাপস। পিছনের কেবিন থেকে এক সঙ্গে অনেকগুলো পানোমত্ত গলার বিকট হাসির আওয়াজ তেড়ে এল। তাপসের মনে হল আজ সবার বিদ্রূপের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হল ও নিজে।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা—সারা দেহে এক অস্বস্তিকর জ্বালা। এক রকম ছুটে বাইরে এসে ফুটপাতের ওপর বারান্দার একটা মোটা থামে হেলান দিয়ে কোটের সব কটা বোতাম খুলে ফেলে চোখ বুজে দাঁড়াল তাপস।

বদ্ধ গুমোট ঘর থেকে বাইরের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসে শরীর ও মন জুড়িয়ে যায় যেন। বেশ কিছুক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তা ক্রস করে গড়ের মাঠের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে লাগল [illegible] মাত্র রাত্রি দশটা; বাড়ি গেলে ক্ষণিকার চোখের সামনে পড়তে হবে। কী জবাব দেবে তাপস? তার চেয়ে অন্ধকারে অনিশ্চিত পথ বেয়ে চলা ঢের বেশী নিরাপদ। ক্ষণিকা আর সমীদ, সন্তোষ যা বললে তা কি সত্যি? কিছুদিন আগে বিমলও চিঠিতে এই ইঙ্গিতই দিয়েছিল! জীবনের হাটে বেচাকেনার মূলধন বিশ্বাসটাই যদি হারিয়ে গেল কি নিয়ে বেঁচে থাকবে মানুষ? মীমাংসা হয় না, প্রশ্নটাই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

সামনে মাত্র কয়েক হাত দূরে দুটি ছায়ামূর্তি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তাপস। পাশ কাটিয়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতে [illegible] এল—কে, তাপসবাবু না?

মাড়োয়ারি বুলাকিলালের গলা! একবার ভাবল তাপস উত্তর না দিয়ে চলে যায়। পরক্ষণেই মনে হল সেটা ঠিক হবে না, বাড়ি ছাড়াও কয়েক হাজার টাকা হ্যাণ্ডনোটে ধার নিয়েছে তাপস বুলাকির কাছে। এগিয়ে কাছে এসে দেখল বুলাকির গা ঘেঁষে বসে রয়েছে একটি তরুণী মেয়ে।

বুলাকি পরিচয় করিয়ে দিলে—মীরা দেবী। আমাদের সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার ক্লাবের একজন বিশিষ্টা সভ্যা। আর ইনি তাপস চৌধুরী। আমার বিশেষ বন্ধু।

পরস্প· নমস্কার বিনিময়ের পালা শেষ হলে মেয়েটি বললে, বসুন তাপসবাবু। আপনার আর আপনার স্ত্রীর কথা এত শুনেছি বুলাকিবাবুর কাছে যে দেখবার প্রবল কৌতূহল ছিল।

ঘাসের ওপর বসে পড়তেই ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিয়ে বুলাকি বললে, অন্ধকারে হন হন করে চলেছেন কোথায়?

—মাথাটা ধরেছিল তাই বেড়াচ্ছিলাম। নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয় তাপস।

বুলাকি বললে, মাঠে আজকের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি একেবারে থ হয়ে গেছি তাপসবাবু। ঘা খেয়ে খেয়ে আমাদের চামড়া গণ্ডারের মত শক্ত হয়ে গেছে, সইতে পারি। আমার ভীষণ দুঃখ হয়েছে আপনার জন্যে। অলরাইট, এরজন্যে আপনি ভাববেন না, মেকআপ আমি করে দেব এই মাসের মধ্যেই।

চুপ চাপ সিগারেট টানে তাপস।

বুলাকি। ক্ষণিকা দেবী ভাল আছেন?

—হ্যাঁ।

—কতদিন মনে করি গিয়ে আলাপ করে আসি—সুযোগ-সুবিধা হয়ে ওঠে না। বুলাকিলাল তাপসের সমবয়সী। মনে-প্রাণে আচারে-

ব্যবহারে পোশাকে-পরিচ্ছদে ষোলো আনা বাঙালী। বিশেষ করে শিক্ষিতা বাঙালী তরুণী মেয়েদের সঙ্গে মেশবার একান্ত বাসনা। শুধু পৈতৃক নামটা এখনও কেন বদলায়নি এ নিয়ে তার বন্ধু মহলে জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই।

তাপস চুপ করে আছে দেখে বুলাকি বললে, আপনি বিশ্বাস করুন তাপসবাবু, আমি আপনার ওয়েল উইশার, বন্ধু। আপনার এই দুঃসময়ে আমি সাহায্য করতে চাই। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেও শান্ত গলায় তাপস বলে, কি ভাবে?

একটু যেন সঙ্কোচে ইতস্ততঃ করে বুলাকি, তারপর এক নিঃশ্বাসে বলে যায়, আপনার স্ত্রীকে আমাদের ওয়েল ফেয়ার ক্লাবে দিন না তাপসবাবু! ওঁকে আমরা সেক্রেটারি করে নেব—আর এর জন্যে মাসে পাঁচশো টাকাও—

কথার মধ্যেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় তাপস। রক্তলোলুপ খুনেটা এতক্ষণ মাথার মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল—আবার জেগে উঠতে চাইছে। তার আগে সরে পড়া দরকার। প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করে গম্ভীর ভাবে বলে, যাবার আগে শুধু একটা কথা বলে যাচ্ছি বুলাকি-লাল। মানুষের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে যারা নিজেদের হীন স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায় তাদের আমি ইতর মনে করি।

কথা শেষ করে উত্তরের অপেক্ষা না করেই জোরে পা চালিয়ে দক্ষিণ মুখো হাঁটতে শুরু করে তাপস।

বিদ্রূপের হাসিতে ফেটে চৌচির হয়ে মীরা দেবীকে জড়িয়ে ধরে ঘাসের ওপর গড়াগড়ি যায় বুলাকিলাল।

দখিনা হাওয়া, উজান বেয়ে সে আওয়াজ তাপসের কানে পৌঁছে দিতে পারে না।

হাসিটা মাঠেই মারা যায়।

॥ উনিশ ॥

অনেক সময় দেখা যায় বৈচিত্র্যহীন এক ঘেয়ে সময় দীর্ঘতর হয়ে ওঠে, কাটতেই চায় না। আবার কারও কারও জীবনে একটার পর একটা ঘটনা ঘটেই চলে, সামলে ওঠবার সময় না দিয়েই। ক্ষণিকা ও তাপসের গত ছয় মাসের পারিবারিক জীবন পর্যালোচনা করলে এই সত্যটা আরও প্রকট হয়ে উঠবে।

মাস চারেক আগে ক্ষণিকার একটি মেয়ে হয়েছে। ফুটফুটে ফুলের মত সুন্দর। খবর পেয়ে বরানগর থেকে রায় বাহাদুর ছুটে এসেছিলেন। এক থালা মোহর দিয়ে মেয়ে দেখে খুসী হয়ে নামকরণ করেছেন—মিনতি। তাপস ও ক্ষণিকা মৃদু আপত্তি তুলেছিল। রায় বাহাদুরের অকাট্য যুক্তির কাছে টেকেনি। তিনি বলেছিলেন, কণা-মা, মায়ের চিন্তা রাতদিন তোমার মনটাকে আচ্ছন্ন করে আছে—তোমার আকুল আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তিনি কি থাকতে পারেন? তোমার গরীয়সী মা আর আমার সুমিতা মা এক হয়ে মিশে গিয়ে আমাদের সান্ত্বনা দিতে তোমার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। এ যে হতেই হবে, নইলে ভক্তি বিশ্বাস এগুলো এতদিনে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যেত।

ছ-মাস আগে মাকে নিয়ে সেই যে সমীদ কাশী চলে গেছে—আজও ফেরেনি বা কোনও চিঠি-পত্র দেয়নি।

পাওনাদারের ভয়ে সব সময় লুকিয়ে বেড়ায় তাপস—দৈবাৎ এক-দিন দেখা হয়ে গেলে তারা যা তা অপমান করে যায়। ঐ এক ফোঁটা মেয়ে মিনুকে বুকে চেপে ধরে নীরবে চোখের জল ফেলে ক্ষণিকা।

অনেক চেষ্টা করে একটা বিদেশী ফার্মে সেলসম্যানের চাকরী পেয়েছে তাপস—মাইনে আড়াই শ টাকা। সম্প্রতি নতুন উপসর্গ জুটেছে তাপসের। জুয়োর আড্ডায় নিয়মিত হাজরে দেওয়া।

প্রতিমাসে পাওনাদারদের কিছু কিছু দিয়ে জুয়োর খরচ যুগিয়ে আবার নতুন করে দেনা করতে হয়। গভীর রাত্রে ক্ষণিকা ঘুমিয়ে পড়লে বাড়ি ঢুকে কোনও রকমে রাতটুকু কাটিয়ে সকালে উঠে স্নান করে বেড়িয়ে পড়ে তাপস! কোথায় যায় কি খায় কয়েকবার জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পায়নি ক্ষণিকা। আজকাল আর জিজ্ঞাসা করে না।

গত কয়েক দিন ধরে একটা জিনিস লক্ষ্য করে তাপস ও ক্ষণিকা অবাক্ হয়ে গেছে। পাওনাদারের দল আর আসে না। ওরা যেন এক সঙ্গে জোট বেঁধে তাপসকে বয়কট করেছে। এই নীরবতা ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ মনে করে তাপস ও ক্ষণিকা প্রতি মুহূর্তে আদালতের শমনের প্রতিক্ষা করে বেশ খানিকটা উৎকণ্ঠার সঙ্গে কাটাল কিছুদিন। কিন্তু দিন পনরো এইভাবে কাটবার পরও যখন বুলাকি, সন্তোষ বা অন্য পাওনাদারের টিকি পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল না এবং কোর্ট থেকে শমন নিয়ে আদালতের পেয়াদাও এল না তখন মনে মনে বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেও কাঁটার মত একটা অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠা জেগে রইল মনের মধ্যে।

মেয়ে মিনতির ভূমিষ্ঠ হবার দিন পনরো আগে হরিরামের কাছে খবর পেয়ে 'মিনতি নারী-কল্যাণ আশ্রম' থেকে পল্টুর মা এ বাড়িতে চলে এসে সংসারের সব ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। ক্ষণিকা কয়েকবার আপত্তি করেছিল, পল্টুর মা বললে, কৃতজ্ঞতা জিনিসটা এখনও পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যায়নি দিদি। আমি সর্বহারা উদ্বাস্তু হলেও কী করে এরই মধ্যে ভুলে যাব যে তোমাদের জন্যই আজ মান মর্যাদা বজায় রেখে মানুষের মত বেঁচে আছি। পল্টু আমার স্কুলে পড়ছে—হয়তো একদিন দশজনের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আজ এই দরকারের সময় যদি তোমার সামান্য কাজেও না লাগতে পারি তাহলে বৃথাই আমার বেঁচে থাকা। তাছাড়া এ সময়ে মেয়ে-ছেলে ছাড়া চলে? আর আপত্তি করেনি ক্ষণিকা। সেই থেকে পল্টুর

মা এই ছন্নছাড়া সংসারটা আবার জোড়া লাগাবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে গেছে।

একদিন বিকেলে বরানগর থেকে গাড়ি নিয়ে জয়ন্ত এসে হাজির। কী ব্যাপার? জয়ন্ত বললে—তুমি এখুনি একবার চল দিদি।

—ব্যাপার কি জয়ন্তদা?

—আর ব্যাপার। কোত্থেকে এক দল ভণ্ড সন্ন্যাসী এসে কর্তার ঘাড়ে ভর করেছে। রাতদিন চব্য-চোষ্য গিলছে আর ছাই ভস্ম উপদেশ দিচ্ছে কর্তাকে। আজ সকালে দেখি ঘরের মধ্যে বসে ফিসফিস করে কি সব কথা কইছে নিজেদের মধ্যে। দরজার বাইরে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে শুনি—ওরা কর্তাকে ভুজুং দিয়ে হরিদ্বারে একটা মঠ খোলবার ফন্দি আঁটছে।

মিণ্টুকে পল্টুর মার কাছে রেখে ক্ষণিকা তখুনি রওনা হয়ে পড়ল জয়ন্তর সঙ্গে।

বরানগরে গঙ্গার তীরে শান বাঁধানো ঘাটের উপরের চত্তরটায় তখন সন্ন্যাসীদের কোরাস ভজন শুরু হয়ে গেছে। একধারে কম্বলের আসনে বসে তাকিয়া হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে ধূমপান করছিলেন রায় বাহাদুর।

ক্ষণিকাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললেন, এস্ছে কণা-মা? কই আমার মা জননী কোথায়? তাকে আননি? কি জানি কেন আজ সকাল থেকে খালি তোমাদের কথাই মনে হাচ্ছল মা।

সব প্রশ্ন এড়িয়ে ক্ষণিকা বললে, এঁরা কারা জ্যাঠাবাবু?

—এঁরা হরিদ্বার থেকে এসেছেন। একটা মঠ প্রতিষ্ঠা করবেন বলে সাহায্য প্রার্থনা করতে বেরিয়েছেন। পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছি আম কিন্তু এঁরা বলছেন আরও কিছু বেশী না হলে—

সবটা না শুনেই গিয়ে দাঁড়াল ক্ষণিকা সন্ন্যাসীদের কাছে।

ক্ষণিকাকে দেখেই তাদের গান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোনও রকম ভূমিকা না করেই ক্ষণিকা বললে, চাঁদার টাকা পেয়েছেন আপনারা?

—হাঁ মাজী।

—তাহলে আর দেরি করবেন না আজই বেরিয়ে পড়ুন এখান থেকে। কাল সকালেই আমরা ছেলেপিলে নিয়ে চলে আসছি এখানে।

জয়ন্ত এসে বললে, দয়া করে উঠুন সাধুবাবারা। আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে। আর কোনও আশা ভরসা নেই বুঝতে পেরেই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাধুর দল রণে ভঙ্গ দিলেন।

শান বাঁধানো চত্তরটার ওপর বসে ক্ষণিকা বললে, এ সব কী হচ্ছে জ্যাঠাবাবু?

—কি করে সময় কাটাই বলতো মা? আগে তবু তোমরা রোজ একবার আসতে কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে সব ওলট পালট হয়ে গেল। একা থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব কণা-মা!

চট করে জবাব দিতে পারে না ক্ষণিকা। গঙ্গায় পরিপূর্ণ জোয়ারের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে।

রায় বাহাদুর বলে যান, সবই বুঝি কণা-মা—এরা যে টাকাটা ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেল তাও জানি কিন্তু একটা সৎকাজের অজুহাত দেখালে বলেই দিলাম। তাছাড়া এত টাকা নিয়ে আমি কি করব বলতে পার মা?

ক্ষণিকার মনে হল শেষের দিকে রায় বাহাদুরের গলাটা ধরে এল যেন।

ঠিক হল রোজ বিকেল বেলা জয়ন্তকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন রায় বাহাদুর। খুব অসুবিধা না হলে মিনুকে নিয়ে ক্ষণিকা রোজ একবার এসে ঘুরে যাবে। তাপসের দেনার ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করি করি করেও শেষ পর্যন্ত করল না ক্ষণিকা—কেমন একটা সঙ্কোচ ও লজ্জা এসে বাধা দিল।

রাত্রি দশটার আগেই বাড়ি পৌঁছে গেল ক্ষণিকা। উপরে বসবার ঘরে কতকগুলো কাগজপত্তর নিয়ে চুপ করে বসে ছিল তাপস। বেশ একটু অবাক্ হয়ে গেল ক্ষণিকা, দশটার আগে বাড়ি ফেরা ইদানিং কালে তাপসের পক্ষে অসম্ভব ঘটনা। লম্বা খাম ও কাগজপত্তরগুলো দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণলো ক্ষণিকা, ভাবল, যে আশঙ্কা এতদিন মনের কোনে লুকিয়ে ছিল - আজ সেটা রূঢ় সত্যের রূপ ধরে আত্ম-প্রকাশ করেছে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে তাপসের চেয়ারটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ক্ষণিকা। খামসুদ্ধ কাগজগুলো ক্ষণিকার হাতে দিয়ে নিঃশব্দে উঠে শোবার ঘরে ঢুকল তাপস। মোটা দলিলটা বাড়ি মরগেজের। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ক্ষণিকা পিছনে 'সুদসুদ্ধ সব টাকা বুঝিয়া পাইলাম' এই এই মর্ম্মে স্ট্যাম্পের ওপর সই করে দিয়েছে বুলাকিলাল। অন্য কাগজগুলো হ্যাণ্ডনোট, সবগুলোর পিছনে টাকা পরিশোধের স্বীকৃতি।

নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে তাপস বললে, জ্যাঠামশায়কে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করেছিলে?

'না, কেমন লজ্জা হল।

—হুঁ। গুম হয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে সিগারেট ধরাল তাপস। তারপর কতকটা আত্মগত ভাবে বললে, বর্তমান ছুনিয়ায় এমন নিঃস্বার্থ দরদী বন্ধু আমার কে আছে -উপযাচক হয়ে এক রাশ দেনা শোধ করে অপরিচয়ের অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকতে পারে?

কোনও জবাব না পেয়ে ক্ষণিকার দিকে ফিরে তাকিয়ে তাপস বলে, এক এক সময় মনে হয়—সমীদ।

অপলক চোখে তাপসের দিকে চেয়ে ক্ষণিকা বলে, কথাটা আমারও মনে হয়েছিল, কিন্তু সমীদ এত খবর রাখবে কী করে। তা ছাড়া সে অনেক দিন কলকাতা ছাড়া।

—তাও তো বটে। যাক একটা দিক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

দেখ—আমার অফিসের একটা পার্টি আছে—আজ হয়তো রাত্রে ফেরা সম্ভব হবে না। হরিকাকাকে জেগে থাকতে বারণ কোরো।

কোনও রকম উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল তাপস।

ল্যান্সডাউন রোডে একখানা চলমান ট্যাক্সি হাত ইশারায় থামিয়ে উঠে পড়ে বললে —বউবাজার। বউবাজার স্ট্রীটের ওপর হাতখানেক চওড়া একটা এঁদো গলির সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ভাড়া দিয়ে নেমে পড়ল তাপস।

নোংরা অন্ধকার গলি। সোজা হয়ে ঢুকতে গেলে দু'পাশের দেওয়ালে গা ঠেকে যায়। খাবারের ঠোঙা, ভাঙা দেশী মদের বোতল, গেলাস চারদিক ছড়ানো। পচা ভাপসা একটা দুর্গন্ধ গলিটায় মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসে আছে। উত্তর দিকে বেশ খানিকটা এঁকে বেঁকে গিয়ে সামনে পড়ে একটা জরাজীর্ণ পাঁচিল -- আর বেরুবার পথ নেই। ডানদিকে একটা পাঁচ ফুট উঁচু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সতর্ক ভাবে পিছনে দেখে নিয়ে আঙুল দিয়ে তিনটে টোকা দেয় তাপস। দরজার মাথায় ছোট্ট এক ফালি তক্তা সরে গিয়ে দুটো চোখ উঁকি মারে। তাপসকে দেখে আবার ফুটো বন্ধ হয়ে যায় এবং একটু পরে দরজা খুলে যায়। ভিতরে ঢুকতেই আবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

কৌটোর মত ছোট্ট চৌকো ঘর। দরজা জানলা নেই। অন্ধকার কোনটায় রঙিন লুঙ্গি পরা কালো মিশমিশে একটা লোক চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তাপস বললে, ফড়িং, ওস্তাদ কোথায়?

উত্তর না দিয়ে দক্ষিণের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করান ভাঙা কাঁচের আলমারিটা দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে কোমর থেকে এক গোছা চাবি বার করল ফড়িং। হাতের টর্চটা জ্বেলে দক্ষিণের দেওয়ালে ফেলতেই ছোট একটা গর্ত দেখা গেল। চাবি লাগিয়ে একবার ঘোরাতেই খট করে

একটা শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের মাঝখানের খানিকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই জায়গায় দেখা গেল ফুট দেড়েক লম্বা আর এক ফুট চওড়া একটা ফোকর বা চোরা দরজা যেন হাঁ করে আছে। ফড়িং আগে ঢুকে টর্চটা বাইরে ফেলতেই গুঁড়ি মেরে ভিতরে ঢুকে পড়ল তাপস। বাইরের গলিটার মত ভিতরেও অপরিসর একটা করিডর বা বারান্দা। দুধারে ছোট ছোট খুপরি ঘর—লোক ভরতি। সবাই জুয়ো খেলায় উন্মত্ত। কোনও ঘরে খেলা হচ্ছে ফিস, কোথাও পোকার, আর বেশীরভাগ লোক খেলছে তেতাসা বা ফ্লাস। ঘরের মাঝখানে উঁচু গদির ফরাশ –উপরের নোংরা দুর্গন্ধ চাদরটায় বসলে ঘেন্নায় পেটের বত্রিশ নাড়ি পাক দিয়ে ওঠে। সেইটে কাটাবার জন্যেই বোধ হয় প্রত্যেক জুয়াড়ির হাতের কাছে একটা করে দেশী মদের পাঁট, ছোট কাঁচের গ্লাস একটা, আর কলাই ওঠা গোল টিনের প্লেটে ভিজে ছোলা, আদার কুচি ও নুন।

চাপা গুঞ্জন মুখরিত দুধারের ঘরগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল তাপস ফড়িং-এর সঙ্গে। সামনে শেষের ইঙ্গিত যবনিকার মত একটা বন্ধ দরজা। একটা বিশেষ ভঙ্গিতে টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। ওস্তাদের খাস কামরায় তাপসের এই প্রথম পদার্পণ। অবাক্ হয়ে চারদিক দেখতে লাগল তাপস। অন্যান্য ঘরের তুলনায় এ ঘরটা একটু বড় আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে ভিন দেশীয় সুন্দরীদের বিশেষ ভঙ্গিমায় অর্ধ উলঙ্গ ও উলঙ্গ ছবি। একপাশে উঁচু গদির ফরাস—উপরের চাদরটা ধবধবে সাদা পরিষ্কার, গোটা তিনেক তাকিয়া ইতস্ততঃ ছড়ানো। ঘরের অন্য পাশে একটা চৌকো পুরোনো টেবিল—তার চার পাশে খান চারেক টিনের চেয়ার। মাঝখানের কাঠের চেয়ারটায় বসে নিবিষ্ট মনে পেসেন্স খেলছে ওস্তাদ পীর মহম্মদ বক্স। পরিচিত ও অপরিচিত মহলে গলাকাটা পীরু নামেই সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

না চেয়েই হাত ইশারায় তাপসকে বসতে বলে ফড়িংকে বললে, পেগ বানাও। টেবিলের নিচে থেকে আনকোরা নতুন একটা জনি ওয়াকারের বোতল, দুটো কাঁচের গ্লাস ও সোডা নিয়ে টেবিলটার ওপর রাখল ফড়িং। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোতল ও সোডা খুলে দুটো গ্লাসে বেশ খানিকটা করে হুইস্কি ঢেলে সোডায় গ্লাস ভরতি করে এগিয়ে দিল।

পীরু ওস্তাদের সঠিক পরিচয় নিতান্ত অন্তরঙ্গ মহলও জানতো না। সম্ভব-অসম্ভব নানা উদ্ভট রটনা, বিকৃত দর্শন ক্ষুদ্রামতি এই মানুষটাকে নিয়ে লোকের মুখে-মুখে ফিরত। ইংরাজি বাংলা তামিল তেলেগু উর্দু ফারশি ছাড়াও আরও অনেকগুলো ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতো ওস্তাদ। কি করে শিখলো জিজ্ঞাসা করলে পীরু বলতো, ক্রাইম জিনিসটা খুব সোজা নয়, বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে হলে রীতিমত স্টাডি করা দরকার। ভিন দেশের ক্রাইমের পদ্ধতিও ভিন্ন রকমের। ভাষা আর ক্রাইম এ দুটো শেখবার সব চেয়ে সহজ উপায় হল সেই দেশের ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে জেল খাটা।

ছোরা ছুরির অসংখ্য দাগে ওস্তাদের মুখখানা ক্ষত-বিক্ষত। পীরু বলতো, লড়াই করবো অথচ দেহ অক্ষত থাকবে, তা কি হয়?

ওস্তাদের সঙ্গে তাপসের আলাপ হওয়াটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। সন্তোষই প্রথমে এই আড্ডায় নিয়ে আসে। রোজ হেরে হেরে তাপস মরিয়া হয়ে উঠল। দুখানা একখানা করে ক্ষণিকার বাবার দেওয়া গহনাগুলোও যখন তিন তাসের ভেল্কিতে উধাও হয়ে গেল, জীবনের ওপর ধিক্কার এসে গেল তাপসের। ঠিক করল জীবনের সব কটা জুয়ো খেলায় হেরে গিয়ে এ ঘৃণ্য জীবন ধারণের কোনও মানেই হয় না।

আড্ডা থেকে বেরিয়ে সোজা মাঠের পথ ধরলো তাপস। রাত তখন গভীর, দুটো বেজে গেছে। অত রাত্রে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়াও

নেই অগত্যা মামুলি পন্থা— গঙ্গায় ডুবে মরা। একটা আঘাটা দেখে জলে নেমে পড়ল তাপস। কয়েক পা এগুতেই পিছন থেকে কে ডাকল, তাপসবাবু!

চমকে ফিরে দেখল তাপস। রোগা দোহারা লুংগিপরা একটা মানুষ জলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। বাধা পেয়ে রাগ বেড়ে গেল। বেশ চড়া গলায় তাপস বললে, কে আপনি?

হো হো করে বিকট হেসে উঠে লোকটা বললে, আমার ওখান থেকেই আসছেন অথচ আমায় চেনেন না? আমি ঐ আড্ডার মালিক, নামটাও শুনেছেন বোধ হয়, পীরু ওস্তাদ! কে না শুনেছে? এক বুক জলে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তাপস।

পীরু বললে, জুয়োয় হেরে আত্মহত্যা! আপনি হাসালেন মশাই। শুনতে পাই এম. এ. ও পাস করেছেন। ছিঃ! উঠে আসুন।

সে আদেশ অবহেলা করতে সাহস পায় না তাপস, মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে আসে জল থেকে।

পীরু বললে, গোড়া থেকে সব খুলে বলুন তো?

প্রথমটা ইতস্ততঃ করে তাপস, তারপর একে একে সব বলে যায়। ব্যবসা থেকে শুরু করে রেস খেলা পর্যন্ত— সব।

সব শুনে পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা হুইস্কির ফ্লাস্ক বার করে ঢক্ ঢক করে খানিকটা খেয়ে তাপসের হাতে দিয়ে বললে, আগে খেয়ে নাও।

খালি ফ্লাস্কটা তাপসের হাত থেকে নিয়ে গঙ্গায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে পীরু বললে, খুনের বদলে খুন! দাঁতের বিনিময়ে দাঁত। এই হচ্ছে পীরু ওস্তাদের মটো। যারা তোমায় ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করেছে আগে তাদের সঙ্গে বোঝা-পড়া করার দরকার। এই তো? সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়ে তাপস।

পীরু বলে যায়, আজ থেকে তোমাকে সাকরেদ করে নিলাম। তালিম নিতে মাস দুই লাগবে। তারপর তাসের খেলায় একমাত্র আমি

ছাড়া তোমাকে হারাতে পারবে না কেউ। সবাই জেনে গেছে, আমার সঙ্গে খেলতে চায় না কেউ। কিন্তু তুমি নতুন, জানাজানি হবার আগেই কাজ ফতে হয়ে যাবে। খেলার টাকা আমি দেব। জিতের বখরা আধা-আধি। কেমন রাজি তো?

নিঃশব্দে পরম আগ্রহে ওস্তাদের প্রসারিত দীর্ঘ হাতখানা চেপে ধরেছিল তাপস।

সেই থেকে নিয়মিত আড্ডায় আসতে লাগল তাপস। মাস তিনেকের মধ্যে তাসের সব রকম খেলায় প্রকাশ্যে ধোঁকা দিয়ে মানুষকে ঠকাবার কারসাজিগুলো রীতিমত আয়ত্ত করে ফেললো। ওস্তাদের উপদেশ প্রথম কয়েক বাজি ইচ্ছে করে প্রতিপক্ষকে জিতিয়ে দেবে। লোভ বেড়ে গিয়ে জুয়োর নেশায় যখন ওকে পেয়ে বসবে, তখন শুরু করবে ভানুমতীর খেল, আর দেখতে হবে না।

তাপসের হাতে প্রথম বলি—সন্তোষ। উপর্যুপরি কয়েকদিন গোহারাণ হেরে আড্ডায় আসা ছেড়ে দিয়েছে সন্তোষ। তারপর ছোট বড় অনেকগুলো জুয়াড়ী তাপসের সাফাই হাতের কারসাজিতে পকেট সাফ করে সরে পড়েছে। ওস্তাদ পিট চাপড়ে একদিন বললে, সাবাস সাকরেদ! শিক্ষিত জুয়াড়ী কি না!

আজ খোদ ওস্তাদের খাস কামরায় চরম পরীক্ষা। আগের দিন ওস্তাদ বলে দিয়েছিল রাত বারটায় খেলা আরম্ভ হবে। খুব সাবধান, একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে সব বরবাদ হয়ে যাবে।

পেসেন্স খেলা শেষ করে তাসগুলো ড্রয়ারে তুলতে তুলতে পীরু বললে, সাড়ে এগারটা বাজে, ফড়িং—বাইরের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা কর। মক্কেল এসে গেলে আমায় খবরটা দিয়ে তবে এখানে আনবে।

সেলাম করে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ফড়িং।

তাপস বললে, আচ্ছা ওস্তাদ তোমার ঐ ফড়িং চেলাটি কি বোবা? আজ পর্যন্ত ওর গলার আওয়াজ শুনতে পাইনি।

হুইস্কির পেগটা এক চুমুকে শেষ করে পীরু বললে, একবার আমার সঙ্গে বেইমানি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। আমার নাড়ী-নক্ষত্র জানে ঐ ফড়িং তাই ওর জীবটা কেটে দিয়েছি। লেখা পড়াও জানে না যে লিখে কাউকে জানাবে। হাঃ হাঃ হাঃ।

উপরের কাটা দু'খণ্ড ঠোঁটটা ধবধবে দাঁতের ওপর থরথর করে কাঁপে। হাসলে ওস্তাদকে আরও ভয়ানক দেখায়।

ড্রয়ার থেকে মোটা এক বাণ্ডিল নোট বার করে তাপসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, একশ টাকা আর দশ টাকার নোটে পাঁচ হাজার আছে, গুণে পকেটে রেখে দাও। দরকার হলে আরও দেব। তবে মনে হয় ওতেই হবে।

বোতল থেকে আরও খানিকটা মদ গ্লাসে ঢেলে নিয়ে ওস্তাদ বললে, তুমি আর খেও না সাকরেদ। একটা কথা সব সময় মনে রাখবে, কিছুতেই উত্তেজিত হবে না বা রাগবে না। ও দুটো, জুয়াড়ীর পক্ষে মরাত্মক দুর্বলতা।

হাত ঘড়িটায় পৌনে বারোটা বাজে। চেয়ারটায় নড়ে চড়ে বসে একটা সিগারেট ধরালো তাপস। ওস্তাদ বললে, তাস যদি ওরা নিয়ে আসে ভয় পেও না। ফড়িংকে দিয়ে সেই ব্রাণ্ডের তাস আমি আনিয়ে দেব। তারপর সিগারেট দেবার অছিলায় দরকারি তাসগুলো পাসিং করে দেব।

দেওয়ালে ছোট্ট একটা সবুজ রঙের বালব জ্বলে উঠল। টেবিলের নিচে একটা বোতাম টিপতেই দরজা খুলে গেল! ফড়িং ঘরে ঢুকে সেলাম করে দাঁড়াল। ইশারায় ওদের নিয়ে আসতে বলে চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করতে লাগলো ওস্তাদ।

প্রথমে ফড়িং পিছনে আর তিন জন এক রকম গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ল ঘরে। সামনে এগিয়ে দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে ওস্তাদ বললে, আইয়ে শেঠজী, আইয়ে, সেলাম আলাকুম!

—সেলাম ওস্তাদজী!

পিছন ফিরে বসেছিল তাপস। গলা শুনে চমকে চেয়ে দেখল দু'জন মোসাহেব ক্লাসের লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসছে মাড়োয়ারি বুলাকিলাল।

বুলাকি বললে, কই, আপনার চৌকশ খোলোয়াড় প্রফেসরটি কোথায়?

উঠে দাঁড়াল তাপস। পীরু ওস্তাদ আলাপ করিয়ে দিলে, ইনি আমার পুরোনো মক্কেল ধনকুবের বুলাকিলাল আগরওয়ালা। আর ইনি হচ্ছেন প্রফেসর টি. চৌধুরী।

ব্যঙ্গের হাসিতে চোখ দুটো ছোটো হয়ে যায় বুলাকির। চেষ্টা করেও বিদ্রূপের লোভ সামলাতে পারে না, বলে—আই সি! এখন বুঝতে পারছি মরগেজের টাকা কি করে শোধ হল। তা তাপসবাবু, প্রফেসারি শুরু করেছেন কবে থেকে?

প্রচ্ছন্ন কৌতুকে চোখ দুটো হেসে ওঠে তাপসের বলে, যেদিন থেকে লোককে শিক্ষা দেবার ক্ষমতা অর্জন করেছি।

জবাব না দিয়ে ফরাশের একপাশে বসে মোসাহেব দুটিকে বসতে ইশারা করল বুলাকি।

পীরু বললে, ড্রিঙ্ক!

—শিওর! ওস্তাদের টেবিলের ওপর জনি ওয়াকারের বোতলটা দেখে নিয়ে বলল, আমারও ঐ (still going strong) স্টিল গোয়িং স্ট্রং ব্রাণ্ড, তবে লেবেলটা অন্য। আপনাদের ঐ রেড লেবেল চলবে না, ব্লাক লেবেল থাকে তো এক বোতল দিন।

ড্রয়ার থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে তাতে কি লিখে ফড়িং-এর হাতে দিয়ে ওস্তাদ বললে—বনোয়ারিলাল!

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে নিমেষে ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ফড়িং।

ড্রয়ার থেকে নতুন দুজোড়া তাস বার করে ফরাসের ওপর ছুড়ে ফেলে দিল পীরু। একটা প্যাক হাতে নিয়ে, অদরকারি তাসগুলো বাদ দিয়ে নিজের মনে বাঁটতে লাগল তাপস। মদ এসে গেল। বেশ কড়া পেগ গ্লাসে ঢেলে সোডা মিশিয়ে দিল ফড়িং। একটা গ্লাস হাতে করে তাপসের দিকে এগিয়ে ধরলো বুলাকি। তাপস বললে, ধন্যবাদ, আমার চলবে না।

ঠাট্টা করে বুলাকি বললে, বলেন তো ধান্যেশ্বরী এক বোতল আনিয়ে দিই!

হেসেই জবাব ছ্যায় তাপস, আপনি হয়তো জানেন না বুলাকি-বাবু প্রফেসরি নেবার পর একটু আধটু স্যাম্পেন মাঝে মধ্যে খাই তাও রোজ নয়। দরকার বুঝলে সেটা আমি নিজে আনিয়ে নিতে পারবো।

মুখের মত জবাব খুঁজে না পেয়ে নিজের গ্লাসটাই এক চুমুকে শেষ করে বুলাকি :

ওস্তাদ বললে কি খেলবেন, পোকার না ফ্লাস?

নিঃশব্দে গ্লাস ভরতি করে হাতের কাছে এগিয়ে দেয় ফড়িং। গ্লাসটা হাতে নিয়ে বুলাকি বলে—ফ্লাস! কিন্তু খেলা শুরু করবার আগে আমার কয়েকটা কথা আছে।

কথা শোনবার জন্য সবাই চুপ করে থাকে।

বুলাকি বলে, আজকের খেলায় ধার বা বাড়ি মরগেজ চলবে না! নগদ টাকা বার করতে হবে।

—তাই হবে। বলে পকেট থেকে পাঁচ হাজার টাকার নোটের তাড়াটা বার করে ফরাশের ওপর রেখে দিয়ে তাপস বলে, আমারও একটা ছোট্ট কথা বলবার আছে বুলাকিবাবু। টাকার অভাব পড়লে আপনি যদি বাড়ি মরগেজ রাখতে চান আমি কিন্তু আপত্তি করবো না। হ্যারিসন রোডের উপর আপনার ঐ চারতলা বাড়িটার

ওপর আমার রীতিমত লোভ আছে। ওটা পেলে চারতলায় একটা ক্লাস খোলবার বাসনা আছে।

রাগে কালো মুখ বেগুনে হয়ে ওঠে বুলাকির। কম্পমান হাতে দ্বিতীয় পেগটি শেষ করে বেশ রেগেই বলে, মাত্র কয়েক মাসে অনেক উন্নতি করে ফেলেছেন দেখছি। কিন্তু আপনাকে আর কষ্ট করে তাস সাফল করতে হবে না—ও তাসে আমরা খেলবো না।

ডান পাশে বসা মোসাহেবটিকে ইশারা করতেই সে পকেট থেকে তু-প্যাক নতুন তাস বার করে বুলাকির সামনে রেখে দিল।

তাসগুলো প্যাকেটে পুরে ওস্তাদের টেবিলের ওপর ছুড়ে দিল তাপস। সেগুলো ড্রয়ারে রাখতে রাখতে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার ফড়িং-এর দিকে চাইতেই, নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল ফড়িং।

যথারীতি টসের পর ডিল করবার ভার পড়ল বুলাকির ওপর। নিজের হাতে বেশ ভাল করে তাস ফেঁটিয়ে নিয়ে রেখে দিতেই তাপস কেটে দিল।

খেলা শুরু হল। পাঁচ টাকা মিনিমম্ --লিমিট হাজার টাকা।

জুয়োর একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে। সূচনা থেকেই চুম্বকের মত টেনে ধরে, আসে পাশে চাইবার অবকাশ দেয় না। ভাগ্যলক্ষী সেদিন বুলাকির মাথায় চেপে বসেছেন। পর পর তিন চারটে দানে প্রায় হাজার খানেক টাকা জিতে মনটা খুসীতে ভরে ওঠে বুলাকির। খালি বোতলটা হাতে নিয়ে ওস্তাদের দিকে চেয়ে বলে, মেহেরবানি করে আর একটা আনিয়ে দিন ওস্তাদজী। ব্লাক লেবেল যদি না মেলে অগত্যা রেড লেবেলই সই?

ট্রে-ভরতি পান আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে ফড়িং ঢুকল। ওর হাত থেকে সেগুলো নিয়ে একটা ছোট চিরকুট দিয়ে ওস্তাদ বললে—বনোয়ারিলাল।

একটা লিমিট বোর্ডে দারুণ হারল তাপস। তাপসের হাতে

তিনটে গোলাম— বুলাকির তিনটে বিবি। এক গাল হেসে টাকাগুলো তাচ্ছিল্যভরে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বুলাকি বললে, সরি তাপসবাবু! কেন জানি না বিবিরা বরাবরই আমার ওপর একটু বেশী প্রসন্ন। তাপসের গা ঘেঁষে পান সিগারেটের ট্রেটা ফরাসের মাঝখানে রেখে দিয়ে হেসে জবাব দেয় ওস্তাদ, ঐ বিবিরাই আবার সব অনর্থের মূল একথাটাও ভুলবেন না বুলাকিবাবু।

বুলাকিকে হাসতে দেখে কিছু না বুঝেই মোসাহেব দুটো হেসে গড়িয়ে পড়ে ফরাসের ওপর। নতুন বোতল খুলে নতুন করে মদ পরিবেশন করে ফড়িং। আবার খেলা শুরু হয়।

ফিরে গিয়ে টেবিলে বসে নিজের বোতল থেকে বেশ খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিয়ে শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওস্তাদ ফরাশের দিকে।

কথা জড়িয়ে যায় বুলাকির, তাস দিতে গিয়ে হাত কাঁপে। বেড়ালের মত চোখ দুটো জ্বলে ওঠে পীরু ওস্তাদের।

আরও কয়েকটা দান জুয়ালক্ষ্মী হাত দিয়ে ঠেলে দেন বুলাকির দিকে। 'তারপর শুরু হয় ভানুমতীর খেল।

মোসাহেব দুজন দু-এক রাউণ্ড ব্লাইণ্ড দিয়ে হাত তুলে ফেলে ছায়। খেলা চলে বুলাকি আর তাপসের মধ্যে। কয়েক দান খেলার পর দেখা যায় নোটের তাড়াগুলো পাহাড়ের মত জমে উঠেছে তাপসের কোলের কাছে। ফতুয়ার পকেট থেকে নতুন নোটের তাড়া বার করে বুলাকি। আধ ঘণ্টার মধ্যে তাও নিঃশেষ হয়ে আসে। হেরে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে বুলাকি। হীরের আংটি, ঘড়ি খুলে ছুড়ে দেয় ফরাশের ওপর। হাত দিয়ে ঠেলে সেগুলো বুলাকির দিকে সরিয়ে দিয়ে বিদ্রূপের সুরে তাপস বলে, উঁ হুঁ, নগদ টাকা চাই আর এক উপায় হ্যারিসন রোডের বাড়িটা বাঁধা রাখা।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চোরা দরজা দিয়ে ঝড়ের মতন ঘরে

ঢুকে পড়ে ফড়িং আর কুড়ি একুশ বছরের একটা মুসলমান ছেলে ওস্তাদের দিকে চেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, পুলিস !

নিমেষে ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বার করে দৃঢ় মুষ্ঠিতে চেপে ধরে পীরু উঠে দাঁড়িয়ে সাপের মত চাপা গর্জনে বলে, বেইমান !

মুসলমান ছেলেটা বাধা দিয়ে বলে, এরা থানা থেকে আসেনি ওস্তাদ। লালবাজারের এসপেস্থাল পুলিস। নিশ্চয় কোনও তুষমন বেইমানি করে খবর দিয়েছে।

ওস্তাদের গলা গর্জন করে ওঠে, বলে, বেইমানির সাজা পরে, এখুনি গিয়ে ঘর থেকে পিছনের চোরা দরজা দিয়ে লোকগুলো সরিয়ে দাও, ঘর সাফ করে ফেল। পুলিসকে বলবে পীরু ওস্তাদ দিন চারেক হল বাইরে চলে গেছে, আড্ডা বন্ধ।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ওস্তাদ দেখল মোসাহেব তুটোকে ধরে জড়াজড়ি করে বলির পাঁঠার মত থর থর করে কাঁপছে বুলাকিলাল।

নিমেষে তাস, নোটের কাঁড়ি, মদের বোতল, গ্লাস এক কোণে জড় করে পীরু বললে, পালাও। টেবিলে বসে একটা অদৃশ্য বোতাম টিপতেই পিছন দিকে একটা চোরা দরজা খুলে গেল। আলো নিবিয়ে টর্চ জ্বেলে সুড়ঙ্গ পথে ফেলে ওস্তাদ বললে, দেরি কর না, এই পথ দিয়ে গেলে পড়বে একটা কাঠের কারখানায়। এখন কেউ নেই সেখানে। গেট খুলে পড়বে একেবারে মেডিক্যাল কলেজের দক্ষিণের রাস্তায়।

জান ও মান বাঁচাতে বুলাকির দল এক রকম পড়ি কি মরি করে ছুটে চলল সেই সুড়ঙ্গ পথে। পিছনে জামায় টান পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ল তাপস। পীরু ওস্তাদ ফিস ফিস করে বললে, খুসী সাকরেদ ? কৃতজ্ঞতায় ওস্তাদের হাত তুটো চেপে ধরে তাপস বললে, তোমার মেহেরবাণীর কথা কোনও দিন ভুলব না ওস্তাদ ! একটু থেমে বলে, সত্যিই কি বাড়ি ঘিরে ফেলেছে পুলিসে ?

তাচ্ছিল্য ভরে হেসে ওঠে ওস্তাদ—বলে, পাগল! ওটা করলাম শুধু তোমাকে বাঁচাতে।

—আমাকে? অবাক্ হয়ে বলে তাপস।

—হ্যাঁ। বুলাকির একটা অনুচর, যে ব্যাটা মদ একদম ছোঁয়নি গোড়া থেকেই তোমার ওপর নজর রেখেছিল। দেখলাম শালা তোমার কারসাজি প্রায় ধরে ফেলেছে। আর একটু দেরি হলেই তোমাকে সার্চ করতো তারপরই শুরু হত গণ্ডগোল খুন খারাপি। তার চেয়ে এটা মোক্ষম চাল—সাপও মল—লাঠিও ভাঙল না। হাঃ হাঃ হাঃ—

আবার সেই বুকের রক্ত হীম হয়ে যাওয়া হাসি।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললে ওস্তাদ, এখন বেশ দিন কতক আড্ডার ছায়াও মাড়িও না সাকরেদ। বুলাাক টাকা খাইয়ে গুণ্ডা লাগিয়ে একটা গোলমালের চেষ্টা করবে নিশ্চয়ই। তোমার বখরার টাকাটা। বাধা দিয়ে তাপস বলে, ওটা তোমার কাছেই থাক ওস্তাদ। অনেক মেহেরবাণী করেছ আর একটু কষ্ট করে ঐ হারামী বুলাকির কাছ থেকে আমার মায়ের আর স্ত্রীর বন্ধকী গহনা-গুলো যদি ছাড়িয়ে এনে দাও। পীরু ওস্তাদ বললে, বুঝেছি ব্যাটা তোমাকে কায়দায় পেয়ে জলের দামে গহনাগুলো হাতিয়েছে। ঠিক আছে দিন চারেকের মধ্যেই গহনা তোমার বাড়ি পৌঁছে যাবে।

॥ কুড়ি ॥

বৌবাজার থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়ি এল না তাপস। মাঝ পথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নেমে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। ভোর হতে তখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। অকারণ মনটা খুসীতে ভরে উঠল তাপসের। একটা খালি বেঞ্চের ওপর সটান চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। মনে পড়ল দীর্ঘ দেড় বছর ধরে বিরূপ ভাগ্য দেবতার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই-এর কথা। আজ জয়ের মালা গলায় পরেও প্রাণ খুলে বিজয়ীর হাসি হাসতে পারে না তাপস একটা কথা মনে করে। অযাচিত ভাবে বাড়ি বন্ধকের টাকা হ্যাণ্ডনোটের টাকা কে শোধ করে দিল? কি তার উদ্দেশ্য, লাভই বা কি? মীমাংসা হয় না, শুধু জিজ্ঞাসাটাই বড় হয়ে চোখের সামনে ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায়…

ভোরের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় চোখের পাতা বুঁজে আসে। চেষ্টা করেও জেগে থাকতে পারে না। খুব কাছে মোটরের হর্ন শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল তাপস। দেখল্লো প্রভাতের মিঠে সোনালি রোদে শিশির ভেজা গড়ের মাঠ খুসীতে ঝলমল করছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ট্রাম রাস্তা মুখো চলতে লাগল তাপস। সামনের চৌমাথাটা ছাড়িয়েই বাঁ দিকে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। একখানায় উঠে পড়ে বললে, রায় স্ট্রীট।

বসবার ঘরে পিছন ফিরে একখানা চেয়ারে বসে আছে সমীদ। কোলে তার এক ফোঁটা মেয়ে মিনু। হেসে লাফিয়ে চুল টেনে নাস্তা-নাবুদ করে তুলছে সমীদকে। কয়েক মুহূর্ত আগের সুন্দর প্রভাতটা একটা বিশ্রী তিক্ততায় ভরে ওঠে যেন। না দেখার ভান করে ভিতরে চলে আসছিল তাপস, সমীদের গলা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কোথায় ছিলি কাল সারারাত?

চোখ মুখ কঠিন হয়ে ওঠে তাপসের, রুক্ষ কণ্ঠে বলে, তার কৈফিয়ৎ কি এখন থেকে তোমার কাছে দিতে হবে ?

—দেওয়া না দেওয়া তোর ইচ্ছে, জিজ্ঞাসা করবার অধিকার আমার আছে।

কঠিন একটা জবাব গলার কাছে এসে আটকে গেল। অগ্নি-দৃষ্টিতে চাইল তাপস সমীদের দিকে। দেখল স্বভাবজাত চাঞ্চল্য ভুলে কচি হাত দুটো দিয়ে সমীদের গলা জড়িয়ে ধরে ভয়ে কুঁকড়ে চেয়ে আছে মিনু ওরই দিকে।

সশব্দে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পিছনের দিকটা দুহাতে বাগিয়ে ধরে নাটকীয় ভঙ্গিতে তাপস বললে, তাহলে শোন! কত শীগগির জাহান্নামের শেষ ধাপে নামতে পারা যায়, তারই মহলা দিচ্ছি!

মৃদু হেসে সমীদ বললে, মহলার বহর দেখে মনে হচ্ছে এ নাটক মহামারী সৃষ্টি করবে।

দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে একটা কাঠের ট্রেতে দুটো ছোট আধসিদ্ধ ডিম, দু'পিস টোস্ট ও এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো ক্ষণিকা। একটু থেমে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা অনুমানে কতকটা বুঝে নিয়ে হাসি মুখে এগিয়ে এসে বললে, তুমি এসে গেছ তাপস? চট করে মুখ হাত ধুয়ে পোশাকটা বদলে এস। আজ অনেক দিন বাদে এক সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করা যাবে।

—তোমরা দুজনে উপবাস ভঙ্গ কর, আমার জন্যে বসে থেক না। বলেই এক মিনিট না দাঁড়িয়ে শোবার ঘরে ঢুকে শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করে দিল তাপস।

সমীদ বললে, কত দিন ধরে এরকম চলছে?

—শুরু হয় অনেক আগেই, চরমে উঠেছে আজ মাস কয়েক।

—ভেবেছিলাম তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বুঝি ভালই করলাম, এখন দেখছি ভুলই করেছি।

সমীদের কোল থেকে টেবিলের দিকে ঝুঁকে কচি. হাতখানা বাড়িয়ে অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ করে মিন্থু। ওকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে ক্ষণিকা বলে, খাও! চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

আনমনে চায়েব পেয়ালাটায় চুমুক দিতে দিতে চিন্তাসাগরে তলিয়ে যায় সমীদ। ক্ষণিকার কথায় চমক ভাঙে। ক্ষণিকা বলছিল, নিজের কথা তো কিছুই বললে না, খালি আমাদের কথাগুলো নিয়েই বোঁচকা বাঁধছো। কোথায় ছিলে এতদিন? মানুব খবরই বা কার কাছে পেলে? নড়ে চড়ে উঠে চেযারে সোজা হযে বসে সমীদ বলে, মাকে পৌঁছে দিতে গিযে কাশীতে মাত্র তিন দিন ছিলাম। তারপরই বেরিয়ে পড়ি তীর্থ দর্শনে।

—আমাকে হাসাবাব চেষ্টা করছো? ক্ষণিকা বলে।

—না। সবটা শোন আগে। ভারতবর্ষের দর্শনীয় তীর্থস্থানগুলো প্রায় সব ঘুরে এলাম। ফেরবার পথে কাশীতে মায়ের কাছে শুনলাম মিন্থুর কথা। চিঠিতে মাকে জানিয়েছিলে তুমি, তাও বললেন।

ক্ষণিকা বললে, তীর্থস্থান কেমন লাগলো কতখানি শান্তি পেলে মনে, সে কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ যে বড়?

—ভয়ে না নির্ভয়ে বলবো।

—তার মানে? অবাক্ হয়ে ক্ষণিকা বলে।

নির্ভয়ে যদি বলি তাহলে ভারতের অগণিত ধর্মপ্রাণ নরনারী ককিয়ে কেঁদে আমাকে চিৎকার করে অভিশাপ দেবেন। ভয়ে বললে, এক কথায় বলবো—ভাল।

—পরিষ্কার হল না।

—আমার কি মনে হয় জান ক্ষণিকা? তীর্থ দর্শনে যারা যায়। আগে থেকে মনটাকে খানিকটা তৈরি করে নিয়েই তাদের মধ্যে বেশির ভাগ যায়। তীর্থের চেয়েও বড় একটা কিছু মনের মধ্যে চেপে নিয়ে শান্তির আশায় গেলে আমার মত নিরাশ হয়ে ফেরা ছাড়া আর

কোনও উপায় নেই। বেশ কিছু সময় চুপচাপ কাটে। ক্ষণিকার কোলে দুষ্টু মেয়ে মিনু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ক্ষণিকা বলে, আজ একটা কথার সত্যি জবাব দেবে সমীদ?

প্রশ্নের ধরনে মনে মনে বেশ শঙ্কিত হয়ে ওঠে সমীদ। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্ষণিকার দিকে চেয়ে থাকে।

--তাপসের দেনার খবরটা তুমি পেলে কি করে? আর অজ্ঞাত হিতৈষী সেজে সেগুলো শোধ করে দিতে গেলেই বা কেন? নির্দয় সত্যিটা যেদিন প্রকাশ হয়ে পড়বে, সেদিনের কথাটা একবার ভেবে দেখেছ কি?

তখনই জবাব দেয় না সমীদ। টেবিল থেকে চামচেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে, তোমার প্রশ্নগুলোর জবাব দেবার আগে, তোমাকে একটা কথা দিতে হবে। যে কথাগুলো শুনবে সেগুলো যেন তাপসের কানে না যায়। সব দিক ভেবে-চিন্তে ওর ভালর জন্যেই একথা বলছি।

—ওর ভালর জন্যে যদি হয়, দিলাম কথা তোমাকে।

—ওকে আমরা দু'জনেই ভাল রকম চিনি। যেমন জেদী তেমনি একগুঁয়ে। যা ধরবে তা ও করবেই কারও কথা শুনবে না। তাই যখন ভাই-এর সঙ্গে ব্যবসা করতে নামল তখনই বুঝলাম ব্যাঙ্কের টাকাগুলোই শুধু যাবে। তারপর শুনলাম রেস খেলতে শুরু করেছে। কিছুদিন বাদে শুনলাম টাকা ও গহনা শেষ হয়ে গেছে। কোন এক মাড়োয়ারির কাছে মাত্র পঁচিশ হাজার টাকায় বাড়িটা মরগেজ দেবার চেষ্টা করছে। সত্যিই ওর জন্য মহা ভাবনায় পড়লাম। এদিকে মা-ও আর একটা দিনও কলকাতায় থাকতে চান না। অনেক ভেবে চিন্তে আমার এক পরিচিত আত্মীয়ের স্মরণাপন্ন হলাম। ভদ্রলোক কোর্টে কাজ করেন। সব ব্যাপার তাঁকে খুলে বললাম। তিনি কথা দিলেন তাপসের সব ব্যাপারগুলো জেনে আমাকে খবর দেবেন।

তীর্থে বেরিয়ে পড়ে যোগাযোগ রাখলাম শুধু ঐ একটি লোকের সঙ্গে। পরের ঘটনাগুলো না বললেও বোধ হয় বুঝতে পারবে।

ক্ষণিকা বলে, শুধু আমাদের জন্যে সর্বস্ব খুইয়ে দেউলে হয়ে বসলে! তোমার চলবে কী করে সমীদ?

সোজা ক্ষণিকার দিকে চেয়ে ম্লান হেসে জবাব দেয় সমীদ—অত টাকা নিয়ে আমি কি করবো বলতে পার ক্ষণিকা?

সমীদের গলাতেও, রায় বাহাদুরের ব্যাথার সুর বাজে, অত টাকা দিয়ে আমি কি করবো বলতে পার কণা-মা? সব কিছুর জন্য নিজেকেই অপরাধী মনে করে ক্ষণিকা। ঘুমন্ত মিনুর কপালের চুল-গুলো সরিয়ে দেবার অছিলায় উদ্যত দীর্ঘ শ্বাসটাকে প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করে বলে, উঠেছ কোথায়?

—আমহার্স্ট স্ট্রীটে একটা বাঙালী হোটেলে। সব কিছু জেনেও পরিহাসের লোভ সামলাতে পারে না সমীদ, বলে, কেন, আসবার খবরটা আগে জানতে পারলে তোমার এখানেই ওঠবার আমন্ত্রণ জানাতে নাকি?

—না।

নীরবে কিছুক্ষণ ক্ষণিকার দিকে চেয়ে থেকে চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে সমীদ। পুব দিকে ঢাকা দেওয়া বড় টেবিল হারমোনিয়ামটার ওপরে রুপোলী ফ্রেমে বাঁধানো ফটোটার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল সমীদ। মাঝখানে ক্ষণিকা দু'পাশে সমীদ ও তাপস। বোটানিক্যাল গার্ডেনে বিয়ের কিছুদিন আগে তোলা ছবি। কিন্তু কতো তফাৎ সেদিন আর আজ। সেদিন পৃথিবী ছিল রঙিন, ছিল বসন্ত, ফুলের গন্ধ, কোকিলের ডাক। আজ তার স্থান অধিকার করছে ঘৃণা, সন্দেহ, অবিশ্বাস! আপনা হতেই বুক থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। সমীদের মনে হয় তপ্ত উষ্ণ শ্বাসে ছবিটা যেন ইষৎ কেঁপে ওঠে।

—চাকরী বাকরী কি করবে ঠিক করেছ?

বেসুরো কথায় সুর কেটে যায়। বাস্তবের কঠিন মাটিতে পা রেখে দাঁড়ায় সমীদ।

—ঠিক এখনও কিছুই করিনি, তবে একটা কিছু করতেই হবে। বলতে বলতে এগিয়ে এসে পরিত্যক্ত চেয়ার খানায় বসে পড়ে বলে, রায় বাহাদুর মানে—জ্যাঠামশায়ের ওখানে যাও?

—রোজ।

—ওঁকে তাপসের কথা কিছু বলেছ?

—না। অনুমানে, আর তাপসের হাল চাল দেখে কিছুটা উনি বুঝতে পেরেছেন হয়তো। নিজে থেকে আমি কিছু বলিনি, কেমন লজ্জা করে।

চুপ করে কি যেন ভাবে সমীদ। একটু পরে বলে, আমি চললাম ক্ষণিকা বরানগরে জ্যাঠামশায়ের ওখানে। ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে।

কিছু বলবার আগেই ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সমীদ।

ঘুম ভেঙে কোলের মধ্যে চুপ করে শুয়ে হরিণ শিশুর মত সুন্দর চোখ দুটো মায়ের মুখের ওপর ফেলে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে মিন্টু।

হাসবার চেষ্টা করে ক্ষণিকা, ফুটে উঠতে চায় কান্না।

রায় বাহাদুর বললেন, তুমি বল কি সমীদ। ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে অথচ আমি জানতেই পারলাম না? কণা-মাও তো এ সম্বন্ধে কোনও দিন কিছু বলেনি!

সমীদ বললে, ক্ষণিকার মত মেয়ের পক্ষে এই সব লজ্জাকর পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে বাইরের কারও সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয়, আর সে ধরনের মেয়েও সে নয়।

রায় বাহাদুর, তাও তো বটে! আমি ওদের নিজের মনে করি

বলেই ওকথা বললাম। নইলে সত্যি বাইরের লোকের পক্ষে এতখানি আশা করাটাও ধৃষ্টতা।

সমীদের মনে হল, খানিকটা অভিমান গলার কাছ বরাবর এসে বেরুবার পথ না পেয়ে ফিরে গেল যেন।

মুখের কথা আর হাতের ঢিল—একবার ছুড়লে আর ফেরান যায় না। কথাটা বলে ফেলে অনুশোচনায় ছটফট করছিল সমীদ। নিরুপায় হয়ে পা ছুটো জড়িয়ে ধরল রায় বাহাছুরের, বললে,—আপনাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলিনি জ্যাঠাবাবু! আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে তাপসকে রক্ষা করবার একটা উপায় বার করবার জন্যেই ক্ষণিকা আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

আগুনে জল পড়ল যেন। সমীদকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে এনে রায় বাহাছুর বললেন, অভিমান যে একটুও হয়নি সে কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে আর নেই। কণা-মাকে বোলো এর একটা ব্যবস্থা খুব শীগগিরই করবো আমি। হ্যাঁ—ভাল কথা, গোড়া থেকে সব ব্যাপারটা আমায় খুলে বলতো সমীদ।

একে একে সব বলে যায় সমীদ। শুনে চিন্তিত মুখে গুম হয়ে বসে থাকেন রায় বাহাছুর। সমীদ বলে, এখন শুনতে পেলাম এক নতুন উপসর্গ জুটেছে, তাস, তাসের জুয়োয় এমন মেতে উঠেছে যে রাত্রে অনেক দিন বাড়িই ফেরে না। ক্ষণিকা বললে পকেটে ছু এক জোড়া তাস সব সময়ই পাওয়া যায়।

—তাইতো—তুমি আমায় সত্যিই ভাবিয়ে তুললে সমীদ। তাসের জুয়ো—ওটা যে পুরোদস্তুর জোচ্চুরির খেলা। তেমন লোকের পাল্লায় পড়লে একদিনে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে।

—ক্ষণিকা আর মিনুর মুখের দিকে চেয়ে একটা ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে জ্যাঠাবাবু!

ছুপুর বেলা হোটেলে ফিরে যাওয়া হল না সমীদের। রায়

বাহাত্বরের কথা ঠেলতে না পেরে থেকে যেতে হল। মিনুকে নিয়ে ক্ষণিকা এল বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। রায় বাহাত্বর তখন গঙ্গার ঘাটে সিঁড়ির চওড়া চত্তরটায় পায়চারি করছিলেন। পরম আগ্রহে মিনুর দিকে ত্বহাত বাড়াতেই মেয়েটা ঝাঁপিয়ে কোলে এসে পড়ল। কচিহাত ত্বটো দিয়ে রায় বাহাত্বরের মাথার লম্বা পাকা চুলগুলো টেনে ধরে পরম কৌতুকে হাসতে লাগল মিনু। মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে রায় বাহাত্বর বললেন,— বোসো কণা-মা, কথা আছে।

সিঁড়ির ত্বপাশে সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো আসনে বসে পড়ল ক্ষণিকা।

রায় বাহাত্বর। সমীদের কাছে সব শুনলাম মা। তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে এরকম একটা মারাত্মক ভুল কি করে করল, সেইটে শুধু বুঝতে পারছি না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ক্ষণিকা রায় বাহাত্বরের দিকে।

চুল ছেড়ে দিয়ে রায় বাহাত্বরের মোটা গোঁপ ত্বটোর ওপর দৃষ্টিপাত করল মিনু। বার ত্বই গুম্ফরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাঁক ছাড়লেন রায় বাহাত্বর,— জয়ন্ত, জয়ন্ত!

উপরের বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে সাড়া দিল জয়ন্ত।

রায় বাহাত্বর বললেন, কাল মার্কেট থেকে আমার মার জন্যে যে খেলনাগুলো এনেছি, একটা ঝুড়িতে করে সেগুলো এখানে নিয়ে এস।

খেলনা দেখে রায় বাহাত্বরকে সাময়িক নিষ্কৃতি দিয়ে জয়ন্তর সঙ্গে পুতুল খেলায় মেতে উঠল মিনু। ক্ষণিকার পাশে বসে পড়ে রায় বাহাত্বর বললেন, স্বামী যদি বিপথে পা বাড়ায় বা কোনও রকম অন্যায় অবৈধ কাজে মেতে ওঠে—তখন সত্যিকার সহধর্মিনীর কর্তব্য হচ্ছে—শুরু থেকেই বাধা দেওয়া, ফলাফলের কথা চিন্তা না করেই। নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে চুপ করে বসে থাকার মধ্যে ধৈর্য ও

সহনশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেলেও পরোক্ষে সর্বনাশের পথটা প্রশস্ত করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।

দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে ক্ষণিকা বলে, কিন্তু কারও স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিয়ে একটা চরম কেলেঙ্কারীর সূচনা করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না জ্যাঠামশায় !

—ভুল মা ভুল। মস্ত একটা ভুলকে আচলে গেরো বেঁধে নিজেও কষ্ট পাচ্ছ অপরকেও দিচ্ছ। তাপসকে যদি কিছুটাও চিনে থাকি তাহলে বলবো -মনে মনে ও তোমাকে শ্রদ্ধা ও ভয় করে—ভালও বাসে। শুধু পদ্মপাতার জলের মত একটু বেশি অস্থির ও ভাবপ্রবণ। মানুষ মানুষ। দেবতা সে নয়। কিছু না কিছু দোষ ত্রুটি তার মধ্যে থাকবেই। সেটুকু মানিয়ে নিয়ে চলতে না পারলে পদে পদে বাধা পাবে। আমার এই কথাটা সব সময় মনে রেখ মা তোমাকে ভাল বাসে বলেই ছঃখু দিয়ে আনন্দ পাবার চেষ্টা করে তাপস।

কষে একটা ঘুম দিয়ে, আগের দিনের ট্রেনে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিটা সুদসুদ্ধ উসুল করে নিয়ে চোখ মুখ ফুলিয়ে সমীদ এসে আলোচনায় যোগ দিল।

রায় বাহাতুর বললেন, এস সমীদ ! আমাদের দরকারি কথাগুলো এইবার সেরে ফেলি।

মোটামুটি ব্যাপারটা ক্ষণিকাকে বুঝিয়ে দিয়ে সমীদ বললে, সামনের পয়লা বোশেখ অরুণের জন্মতিথি, সেই উপলক্ষে বিশেষ অন্তরঙ্গ কয়েকটি লোককে সপরিবারে এখানে নেমন্তন্ন করতে চান জ্যাঠাবাবু। তবে এর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, পয়লা থেকে সাত দিন থাকতে হবে এ বাড়িতে, বাইরে কোথাও পা বাড়ানো চলবে না। দ্বিতীয়, বেছে বেছে এমন লোককে বলতে হবে যাদের এই সাত দিনের মধ্যে আফিস বা দরকারি কোনও কাজ থাকবে না। তাপস ও আমি তুজনেই বর্তমানে বেকার সুতরাং আমাদের নেমন্তন্ন

পাকা, এ ছাড়াও জ্যাঠাবাবুর দু'তিনটি বিশেষ জানাশুনা রিটায়ার্ড অফিসার বন্ধু আছেন যাঁরা আসবেন।

সব শুনে দ্বিধা ভরে মাথা নেড়ে ক্ষণিকা বললে, ও আসবে না।

—কে তাপস? ওর ঘাড় আসবে। দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠেন রায় বাহাদুর।

ক্ষণিকার মন কিন্তু অতখানি দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানায় না, সংশয়ে দুলতে থাকে।

রায় বাহাদুর বললেন, তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না কণা-মা, শুধু আমার ওপর একটু বিশ্বাস রেখো, দেখবে সাতদিনের মধ্যে ভাঙা মন জোড়া লেগে গেছে। তোমাকে কিন্তু একটু সাহায্য করতে হবে।

—কি ভাবে?

—এখানে আসবার প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি করে।

হেঁয়ালিতে কথা কইছেন রায় বাহাদুর। প্রশ্ন না করে ফ্যাল-ফ্যাল করে শুধু চেয়ে থাকে ক্ষণিকা।

মৃদু হেসে আসল ব্যাপারটা খুলে বললেন রায় বাহাদুর। তুমি দেখে নিও কণা-মা, তুমি আসতে আপত্তি করলেই ওর জেদ দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। একবার এই বাড়ির মধ্যে এনে ফেলতে পারলে সব ভার আমার।

ওপারের একটা পেটা ঘড়ির আওয়াজ গঙ্গার বুকে প্রতিধ্বনি তুলে এ পারে মনে করিয়ে দেয় রাত দশটা বাজে।

উঠে দাঁড়িয়ে রায় বাহাদুর বললেন, রাত হয়ে গেছে, এবার তুমি বাড়ি যাও কণা-মা। পয়লা বোশেখের এখনও চার দিন দেরি আছে! আমি ভেবে দেখি নতুন ফন্দি যদি মাথায় আসে। মনে রেখো আগের দিন সকালে তাপস যখন বাড়ি থাকবে সেই সময় আমি টেলিফোন করে পয়লা বোশেখের নেমন্তন্ন করবো। ওর সামনেই দু'চার কথায়

সেটা প্রত্যাখান করে ফোন রেখে দেবে। তারপর শুরু করবে তোমার অভিনয়, যা শিখিয়ে দিলাম মনে থাকবে তো মা ?

—থাকবে জ্যাঠাবাবু।

দু'হাতে দুটো দামী খেলনা নিয়ে জয়ন্তর কোলে মিনু এসে হাজির। রায় বাহাদুর বললেন, দুটো খেলনা কেন ? ঝুড়িসুদ্ধ সবগুলো কণা-মার গাড়িতে তুলে দাও। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি দিন দিন লোপ পাচ্ছে জয়ন্ত।

সমীদ হাত বাড়িয়ে মিনুকে কোলে নিলে জয়ন্ত খেলনার ঝুড়ি গাড়িতে তুলতে ছুটলো।

॥ একুশ ॥

ড্রেসিং টেবিলটার সামনে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল তাপস। ক্ষণিকা ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গেছে মুখ হাত ধুতে, খাটের ওপর অকাতরে ঘুমুচ্ছে মীনু, ঠিক এই সময় ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোনটা।। সারা মুখটা সাবানের ফেনায় ভরতি, এ অবস্থায় তাড়াতাড়ি উঠে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাপস ডাকল—টেলিফোন এসেছে, তাড়াতাড়ি ঘরে এস একবার। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সাড়িটায় ভিজে মুখ হাত মুছে নিয়ে রিসিভারটা কানে দিয়ে ক্ষণিকা বললে, হ্যালো, কে ?

গুরুগম্ভীর গলা, রিসিভার ছাপিয়ে অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসে তাপসের কানে।

—আমি বরানগর থেকে বলছি, কে ? কণা-মা ?

হ্যাঁ আমি জ্যাঠাবাবু ! এত সকালে, কী ব্যাপার ?

—আজ চার পাঁচ দিন তুমি আসনি, ভাবলাম হয়তো বা আমার ওপর অভিমান করেছ ?

—না জ্যাঠাবাবু ! মিনুর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না—তাছাড়া আমারও আজ কদিন থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছে।

—যাক—আসল কথাটা বলি মা। কাল অরুণের জন্মতিথি। প্রতি বছর এই দিনটায় একটা হৈ চৈ করে এসে কেমন একটা বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আজ যাকে নিয়ে হৈ হল্লা করবো সে নেই —যে করবে সে রয়েছে বেঁচে। তাই নিতান্ত পরিচিত কয়েকজনকে নিয়ে হপ্তাখানেক অন্ততঃ সব কিছু ভুলে থাকতে চাই। আসছো তো মা ?

—বরানগরে গিয়ে সাত আটদিন থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না

জ্যাঠাবাবু। শারীরিক অসুস্থতা ছাড়াও আরও কতকগুলো বাধা রয়েছে। এবারটা আমায় মাপ করুন জ্যাঠাবাবু!

রায় বাহাদুরের উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই সশব্দে রিসিভারটা রেখে দিল ক্ষণিকা।

দাড়ি কামানো বন্ধ করে এই দিকে ফিরে অবাক্ হয়ে শুনছিল তাপস। সাবানের ফেনাগুলো মুখে শুকিয়ে গিয়েছিল। ব্রাশটা জলে ভিজিয়ে মুখে ঘষতে ঘষতে বললে, সকাল বেলায় নির্জলা মিথ্যেগুলো জ্যাঠাবাবুকে না বললেই পারতে।

—কোন্‌টা মিথ্যে?

—এই যেমন তোমার আর মিনুর অসুখের কথা। তাছাড়া অরুণের জন্মতিথিতে কয়েকদিন বরানগরে গিয়ে থাকাতে তোমার আপত্তিটাই বা কিসের?

—তা যদি তুমি বুঝতে—তাহলে অন্ততঃ জ্যাঠামশায়ের মত মানুষকে দুঃখ দেবার দায় থেকে আমি নিষ্কৃতি পেতাম।

—আমাকে বাদ দিয়েই এতদিন যখন চলে এসেছে আজই বা অচল হচ্ছে কেন? সমীদ থাকবে নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ, সেটাও আমার না যাওয়ার অন্যতম কারণ।

অবাক্ হয়ে চায় তাপস ক্ষণিকার দিকে।

ক্ষণিকা বলে, জ্যাঠামশায় একলা থাকলে কথা ছিল না, কিন্তু সেখানে রিটায়ার্ড জজ মিঃ নাগ আসছেন সস্ত্রীক। তাছাড়া মিঃ তরফদার, মিঃ গাঙ্গুলী এঁরাও আসবেন সপরিবারে। তোমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমাকে আর সমীদকে উপলক্ষ করে যে আলোচনাগুলো তাঁরা করবেন, তাতে তোমার কিছু এসে না গেলেও আমার যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা।

হাল্কা হাসির আড়ালে বিদ্রূপের একটা বাণ বেরিয়ে আসে তাপসের মুখ থেকে—আলোচনাটা আজ নতুন করে হবে না ক্ষণিকা!

—জানি। রান্নাঘরে বসে পলিটিক্স্ আলোচনা করে রাতারাতি শাসন ব্যবস্থা পালটে দিই আমরা, কী আসে যায় তাতে! কিন্তু কতকগুলো বাইরের লোকের সামনে বক্তৃতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বললে, ফল তার অনেক দূর গড়ায়।

দাড়ি কামাতে কামাতে তাপস বলে, বুঝলাম। না যাওয়ার আর কারণগুলো ?

অভিমানে ধরেআসা গলায় ক্ষণিকা বলে, আজ একটা বছর কি বেশে ঘুরে বেড়াই আমি, চোখ মেলে চেয়ে দেখেছ কোনদিন ? তাতেও দুঃখ ছিল না আমার, বাড়িতে থাকি আর গাড়ি করে জ্যাঠামশায়ের কাছে যাই। পিতৃতুল্য তিনি—তাঁর কাছে দীন হীন বেশে দাঁড়াতে কোনও লজ্জা বা সঙ্কোচ নেই আমার ; কিন্তু কতকগুলো বাইরের লোকের সামনে এ ভাবে যাওয়া—।

উঠে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে তাপস বলে, ঠিক কথা।

চাবি লাগানো পোশাকের আলমারিটার একটা ডালা খুলে কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে লুকানো একটা চৌকো কাঠের বাক্স বার করে খুলে ক্ষণিকার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে তাপস বলে, আমার মায়ের আর তোমার সব গহনাগুলো ওর মধ্যেই আছে।

ক্ষণিকাকে বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে ওঠার অবসর না দিয়েই আলমারির আর একটা ড্রয়ার থেকে একশ টাকার খান পাঁচেক নোট বার করে গহনাগুলোর ওপর রেখে দিয়ে তাপস বলে, বিকেলে সমীদকে সঙ্গে করে মার্কেট থেকে পছন্দ মত কাপড় সায়া ব্লাউজ কিনে এনো।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত ক্ষণিকা বলে, আর তুমি ?

হেসে ফেলে তাপস—বলে, এ সবের পরেও আমার প্রয়োজন আছে ? ভাল—বল, কি করতে হবে আমাকে ?

এবার তাপসকে অবাক্ করে দিয়ে ক্ষণিকা বলে, আমরা কেউ

যাব না অথচ জ্যাঠামশাই ক্ষুণ্ণ না হন—এই ব্যবস্থাটা দয়া করে করে দাও তুমি।

—মানে ?

—ঘরে বাইরে অশান্তি আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

—ঘরের অশান্তি যে আমাকে নিয়ে এটা না বললেও বেশ বুঝতে পারি কিন্তু বাইরে, মানে জ্যাঠামশায়ের ওখানে অশান্তি সহ্য করতে হবে কেন শুনি ?

টাকাসুদ্ধ গহনার বাক্সটা খাটের ওপর রেখে দিয়ে এক ধারে বসে ক্ষণিকা বলে, আজ-কাল কতকগুলো উদ্ভট খেয়ালে পেয়ে বসেছে জ্যাঠামশাইকে। একটু একলা থাকলেই যা তা ভাবেন। সেগুলো শুনলে ওঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

ড্রেসিং আয়নায় সাবানের ফেনায় ভরতি বাঁ গালটার দিকে চেয়ে তাপস বলে—যথা ?

—কালকের এই জন্মতিথি উৎসবের কথাটাই ধর না। নিমন্ত্রিত সবাইকে যেতে হবে যোড় বেঁধে ছেলেপিলে নিয়ে—তাও দু'এক দিনের জন্য নয় পুরো সাতদিন থাকতে হবে সেই বাগান-বাড়িতে বন্দী হয়ে, এক পা বাইরে বাড়াবার উপায় নেই।

—সমীদের বেলায় এর ব্যতিক্রম হল কেন ?

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটুকু ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গিয়ে ক্ষণিকা বললে, সমীদ একরকম ঘরের ছেলে তাছাড়া বিয়েই করেনি। যোড়ে আসবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

—ভাল আর কি শর্ত ?

—জুয়ো, তাসের জুয়ো। হারলে, রায় বাহাদুরের। জিতলে, যে জিতবে তার। এ রকম অদ্ভুত খেয়াল এক পাগল ছাড়া কারও মাথায় আসতে পারে ?

দাড়ি কামানো বন্ধ করে অবাক্ হয়ে শোনে তাপস।

ক্ষণিকা যেন নিজের মনেই বলে যায়—এক জুয়োর ধাক্কায় তোমাকে প্রায় হারাতে বসেছি—আবার সাতদিন ধরে সেই মায়াবিনীর খপ্পরে পড়লে মিনুর হাত ধরে পথে দাঁড়াতে হবে। তার চেয়ে চল মিনুকে নিয়ে আমরা পুরী কিংবা বেনারস যেখানে হোক দিন পনেরো ঘুরে আসি। জ্যাঠামশাইকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দেব—মিনুর শরীর খারাপ বলে ডাক্তারের কথা মত বাইরে যাচ্ছি। টাকাও যখন যোগাড় হয়ে গেছে।

কামাতে গিয়ে উত্তেজনায় গলাটা কেঁপে যায় তাপসের। বলে, সমীদ, তোমাদের জজ সাহেব মিঃ নাগ এঁরা সবাই খেলবেন জুয়ো?

—খেলতেই হবে। ওটাও একটা কনডিশান।

খানিকটা সামলে নিয়ে তাপস বলে, আর মেয়েরা? তারা কি কি দিন রাত ঘুমোবে?

—না, মেয়েদের জন্যে একটা স্টীম লঞ্চ ভাড়া করা হয়েছে। সব সময় সেটা ঘাটে বাঁধা থাকবে। মেয়েরা ইচ্ছামত গঙ্গায় ঘুরে বেড়াবে। গল্প করবে ইচ্ছে হলে গান বাজনাও করতে পারে।

একটা পৈশাচিক ফন্দিতে চোখ দুটো সাপের মত ক্রূর ও ছোট হয়ে যায় তাপসের। কামানো শেষ করে উঠে সেটা গোপন করতে অন্য দিকে চেয়ে পায়চারি করতে করতে বলে, যাব আমরা, তুমি ফোন করে দাও জ্যাঠাবাবুকে!

আতঙ্কিত হয়ে ক্ষণিকা বলে, তুমি বুঝতে পারছ না তাপস। জুয়োর নাম শুনেই নেচে উঠেছ। এ ব্যাপারে এগোলেও বিপদ আবার পিছোলেও সর্বনাশ।

চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়ে তাপস বলে, মানে?

—ধর, খেলায় তুমি বহু টাকা জিতলে, লোকে বলবে তাপসের মত শিক্ষিত ছেলে পুত্র শোকাতুর রায় বাহাদুরকে ঠকিয়ে টাকাগুলো আত্মসাৎ করলে।

—আর হারলে ?

—হেরে গেলে, তোমাদের মুখেই শুনতে পাই জুয়োর ঋণ রাখতে নেই। উনি নিতে না চাইলেও বাড়ি ঘর বিক্রি করেও টাকাটা তোমাকে দিতেই হবে। আর একটা মস্ত ভুল ধারণা তোমার ভেঙে দেওয়া দরকার। তোমার ধারণা জুয়ো খেলায় রায় বাহাদুর একেবারে আনাড়ী। কিন্তু ওঁর নিজের আর দুচার জনের কাছে শুনিছি, যৌবনে জুয়ো খেলে বহু টাকা নষ্ট করেছেন উনি। উনি বলেন শেষকালে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে নাম করা সব পাকা খেলোয়াড় ওঁর সঙ্গে খেলতে ভয় পেতো।

— ছাড়লেন কেন ?

—অরুণের মায়ের কান্নাকাটিতে শেষে একদিন তিতি বিরক্ত হয়ে অরুণের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে ছেড়ে দিলেন। জ্যাঠাবাবু বলেন, সীতা হরণ হয়ে গেছে··এখন আর লক্ষ্মণের গণ্ডীর কোনও দামই নেই। তাছাড়া পয়সা ওড়াবার এমন সহজ উপায় আর কোথায় খুঁজে পাব কণা-মা ?

ক্ষণিকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দীপ্ত কণ্ঠে তাপস বলে, তুমি এখনই ফোনে জানিয়ে দাও জ্যাঠাবাবুকে কাল সকাল আটটার মধ্যেই আমরা যাব। ভেবে দেখলাম এ অবস্থায় না গেলে জ্যাঠাবাবু ভারি দুঃখ পাবেন।

অভিমানে উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকা বলে, একটু আগে 'না' বলে এখনই আবার হ্যাঁ বলবো কোন্ মুখে ? আমি পারবো না--যা বলতে হয় তুমি নিজেই বল।

ক্ষণিকার কাছে বরানগরের ফোন নম্বরটা জেনে নিয়ে হাসি মুখে অটোমেটিক টেলিফোনটার ডায়াল ঘোরাতে শুরু করে তাপস।

ক্ষণিকারা যখন বরানগরের বাড়িতে গিয়ে পৌছল তখন বেলা ন'টা।

বেজে গেছে। জয়ন্ত দাঁড়িয়ে থেকে একটা চাকর দিয়ে গাড়ি থেকে জিনিস-পত্তর নামিয়ে নিল। ভিতরে ঢুকে কাউকে না দেখতে পেয়ে তাপস বললে, এখনও কেউ আসেনি নাকি?

জয়ন্ত। সমীদবাবু এসেছেন, আর একটু আগে মিঃ নাগ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন।

ক্ষণিকা বললে, জ্যাঠাবাবুকে দেখছিনে তিনি কোথায়?

কাছে এসে চুপিচুপি জয়ন্ত বললে, দোতলায় খোকাবাবুর ঘরে। এখনই নামবেন। তোমরা উপরে চল মা, ঘরটা দেখিয়ে দি।

বাইরের বড় দরজাটা দিয়ে ঢুকে এসেই বাঁ হাতে পড়ে পাশাপাশি দুখানা বড় ঘর। সামনে চওড়া টকটকে লাল সিমেণ্টের বারান্দা, মাঝে মাঝে মোটা গোল থাম। দুটো ঘরই সাজানো গোছান। তাস পাশা দাবা গান বাজনা গল্প গুজব, সব এই ঘর দুটোতেই সীমাবদ্ধ।

ডান দিকেও ঐ রকম বারান্দার পাশে সারি সারি ঘর। সটান চলে গেছে দক্ষিণ থেকে পুবে, পুব থেকে উত্তরে। মাঝখানে দোতলায় ওঠবার চওড়া সিঁড়ি। উত্তর দিকের পাশাপাশি তিনখানা ঘরে রান্না, ভাঁড়ার ও খাওয়ার ব্যবস্থা। অন্য ঘর গুলোতে চাকর-বাকর কর্মচারী এরা থাকে।

দোতলায়ও ঠিক একই ব্যবস্থা। দক্ষিণের শেষ ঘরটায় থাকেন রায় বাহাদুর। পাশের ঘরটা সব সময় তালাবন্ধ থাকে। 'জয়ন্ত বললে, ও ঘরে কর্তাবাবু ছাড়া কারও ঢোকবার হুকুম নেই। খোকা-বাবুর সব বয়েসের অনেক ছবি, জামা কাপড় বই খেলনা সব সাজানো রয়েছে ও ঘরে। অন্য ঘরগুলোতে নিমন্ত্রিত অতিথিদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্ষণিকাদের স্যুটকেস ও আর সব জিনিস-পত্তর নিয়ে চাকরটা তিন তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠছে দেখে তাপস বললে, আমাদের ঘরটা তাহলে—

—তিনতলায়। ঐ একখানা ঘরই আছে তিনতলায়, বাকিটা ছাদ। কর্তাবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

প্রকাণ্ড ঘর। চারদিকে অনেকগুলো দরজা জানলা। ঘরটার আর একটা বিশেষত্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমের যে কোনও দরজা বা জানলা থেকে বহুদূর পর্যন্ত গঙ্গা দেখা যায়। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড দামী পালঙ্ক। তার উপর পুরু গদিটা তোশক ও বালিশসুদ্ধ মূল্যবান সুদৃশ্য বেডকভার দিয়ে ঢাকা। পুব দিকের দেওয়াল ঘেঁষে বড় ড্রেসিং টেবিল, তার উপর দরকারি-অদরকারি নানা রকম প্রসাধন দ্রব্য সাজানো। মোট কথা, এ ঘরের অধিবাসীদের কোনও কিছুর জন্যই কারও দ্বারস্থ হতে হবে না।

ক্ষণিকার কোলে অস্ফুট চিৎকার করে তুহাত বাড়িয়ে পিছনে ঝুঁকে পড়ল মিনু। তিন জনে ফিরে দেখল পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে সমীদ।

সমীদের কোলে গিয়ে আহ্লাদে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চুল টেনে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল মিনু। আদর করে চুমু খেয়ে কিছুটা ঠাণ্ডা করে সমীদ বললে, আগেই সাড়া পেয়েছিলাম। কাপড়-চোপড় বার করে সাজিয়ে রাখছিলাম বলে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।

তাপস বললে, তোমার ভাগ্যে কোন্ ঘরটি পড়ল ?

—ঠিক তোমাদের ঘরের নিচে, সিঁড়ির ডান দিকের ঘরটা।

নিচে থেকে রায় বাহাতুরের গলা শোনা গেল, জয়ন্ত, জয়ন্ত !

একরকম ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জয়ন্ত।

ক্ষণিকা বললে, চল আগে জ্যাঠাবাবুর সঙ্গে দেখাটা করে আসি।

তাপসকে দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন রায় বাহাতুর। তু'হাতে তাপসকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি জানতাম আসতেই হবে তোমাকে, আমার কণা-মাকে ছেড়ে সাত দিন যে স্বামী থাকতে পারে অনায়াসে মানুষ খুন করতে পারে সে।

সবার দিকে চেয়ে হো হো করে হেসে উঠে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে খুন হন রায় বাহাদুর। নির্লিপ্তভাবে অন্য দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তাপস। অস্বস্তিভরে পরস্পরের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে মুখ নিচু করে থাকে ক্ষণিকা ও সমীদ।

অনুমানে ব্যাপারটা কতক বুঝে নিয়ে হাসি থামিয়ে রায় বাহাদুর বললেন, চল তোমাদের সঙ্গে আমার আর সব অতিথিদের আলাপ করিয়ে দি। কণা-মা, মেয়েদের ভার কিন্তু তোমার উপর। কাপড় চোপড় ছাড়া হলে ওঁদের জলটল খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিও। জয়ন্ত রইল, যা দরকার ওকে বললেই হবে। আমরা চললাম বাইরের ঘরে।

বাইরের ঘরে ফরাসের ওপর তাকিয়া ঠেশ দিয়ে সামনে সেদিনকার দৈনিক কাগজগুলো খুলে গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন বিভিন্ন বয়সের তিনটি প্রাণী।

মিঃ স্মৃতিরঞ্জন নাগ, রিটায়ার্ড জজ, বয়েস ষাটের কাছাকাছি। চোখে মুখে সন্দেহ ও অবিশ্বাস মাখানো। দেখলেই মনে হবে ভদ্রলোক সকলকেই সন্দেহের চোখে দেখেন। দূর সম্পর্কের একটা সরু সুতো ধরে রায় বাহাদুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, বড়বাজারের প্রসিদ্ধ পাইকারী বস্ত্র বিক্রেতা। বয়েস পঞ্চাশের মধ্যে। নাদুস নুদুস গোলগাল চেহারা। সব সময় মুখে পান ও দোক্তা থাকলেই ভদ্রলোক খুসী। রায় বাহাদুরের কাছ থেকে টাকা ধার করে ব্যবসায়ে যে লক্ষ্মীর প্রচেষ্টা করেছিলেন, আজও সে আসনে তিনি অচলা হয়ে বসে আছেন।

মিঃ কল্যাণাক্ষ তরফদার, নাম করা অ্যাডভোকেট। পসার প্রতিপত্তি পয়সা সেই সঙ্গে মা ষষ্টীর কৃপা, কোনটারই অভাব নেই। রোগা হাড় বার-করা চেহারা বয়েস অনুমান করা খুব কঠিন। চুপসে আসা নীরস চেহারাটার মধ্যে শুধু কোটরে ঢোকা চোখ দুটো তীক্ষ্ণ

কূট বুদ্ধিতে সব সময় জ্বল জ্বল করছে। রায় বাহাত্বরের বৈষয়িক সমস্ত কাজ-কর্ম দীর্ঘ দিন ধবে ইনিই কবে আসছেন।

যথারীতি পরিচয় আদান প্রদানের পালা শেষ হলে রায় বাহাত্বব বললেন, হ্যাঁ ভাল কথা, আমার দরকারি কাগজ পত্তবগুলো রেডি করে এনেছেন তো মিঃ তরফদার?

পবেট থেকে একটা লম্বা খাম বার করে রায বাহাত্বরের দিকে এগিয়ে দিয়ে তরফদার বললেন, এসব কাজ আমায় কখনও তুবার বল্‌তে হয়েছে বায় বাহাত্বর?

হিন্দুস্থানী ঠাকুর পরশুরাম এসে জানাল, জলখাবার দেওয়া হয়েছে।

সবাইকে ডেকে নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে চললেন রায় বাহাত্বব উত্তর দিকের বাবান্দা মুখো।

সমীদের ঘরের পাশের বন্ধ দবজাটার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকা জয়ন্তর দিকে চাইতেই ফিস ফিস করে জয়ন্ত বলল, নাগ গিন্নী।

বার তুই দরজাব মৃত্থ টোকা দিতেই ভিতর থেকে মিষ্টি মেয়েলি গলা শোনা গেল, দরজা খোলাই আছে ভিতরে আম্বন।

ভিতরে ঢুকেই বিস্ময়ে থ' হয়ে গেল ক্ষণিকা। সত্ত স্নান করে একখানা প্লেন ছাপা সাড়ি পরে ভিজে এলো চুলে ওরই বয়সী একটি স্বন্দরী তরুণী হাসি মুখে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন। 'ক্ষণিকার মনে হল ঘর ভুল হয়েছে—মিঃ নাগ একজন বয়স্ক রিটায়ার্ড জজ, তাঁর স্ত্রী—

মনের দ্বিধা বুঝতে পেরেই বোধ হয় মেয়েটি বললে, হ্যাঁ আমিই মিসেস নাগ। খুব অবাক্ হয়ে গেছেন না? তাহলে খুলেই বলি। বলতে গিয়ে জয়ন্তর দিকে চেয়ে থেমে গেল মেয়েটি।

বুঝতে পেরে ব্যস্ততার ভাণ করে জয়ন্ত বললে, তোমরা আলাপ কর মা, আমি দেখি জলখাবারের কদ্দুর কি হল।

ক্ষণিকাকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে নিজে অন্যখানায় বসে মেয়েটি,

বললে, আমার নাম লাবণ্য। পড়াশুনো বেশি করতে পারিনি ভাই, মোটে ম্যাট্রিক পাস। গরীব মা-বাপ মেয়েকে জজ-গিন্নী করবার লোভে বিয়ে দিয়েছে। আমি জজসাহেবের তৃতীয় পক্ষ। আগের দুটি পক্ষের আট-নটি ছেলে মেয়ে। ছেলেরা কেউ চাকরী করে কেউ পড়ে। মেয়ে তিনটির বেশ ভাল ঘরে বিয়ে হয়ে গেছে। মা ষষ্ঠীর কৃপা দৃষ্টি এখনও আমার ওপর পড়েনি তাই ঝাড়া হাত-পা। এটি বুঝি তোমার মেয়ে?

মিনুকে লাবণ্যর কোলে দিয়ে সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়ল ক্ষণিকা।

লাবণ্য বললে, তুমি নিশ্চয়ই ক্ষণিকা, তাপসবাবুর স্ত্রী! তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি তাই দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকা বললে, আপনি বিশ্রাম করুন। আমাকে এখনও দুটি মহিলার খোঁজ খবর নিতে হবে।

মিনুকে কোলে করেই উঠে দাঁড়াল লাবণ্য, বললে, বুঝেছি, মিসেস গাঙ্গুলী ও তরফদার। চল ভাই, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। একা একা এই ঘরে প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠছে যেন।

চলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে লাবণ্য বললে, কিন্তু একটা কথা ভাই, ও সব আপনি-টাপনি বলা চলবে না। আমি তো দিব্যি প্রথম আলাপেই তুমি বলে ফেললাম, তুমি পারছ না কেন? জজ-গিন্নী বলে বুঝি? খিল খিল করে হেসে উঠল লাবণ্য।

সামান্য আলাপের মধ্যেই লাবণ্যকে ভাল লাগল ক্ষণিকার।

সিঁড়ির বাঁ দিকের ঘরটা গাঙ্গুলী গিন্নীর। লাবণ্যই দেখিয়ে দিল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দরজায় টোকা দেওয়ার পর দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালেন একটি মোটা-সোটা প্রৌঢ়া মহিলা। কাল চওড়া পাড় একখানা তাঁতের সাড়িতে সর্বাঙ্গ ঢেকে মাথায় আধ হাত ঘোমটা দিয়ে পথ জুড়ে চুপ করে রইলেন মহিলাটি। লাবণ্য ও ক্ষণিকা পাতলা কাপড়ের আবরণ ভেদ করে স্পষ্ট দেখতে পেল গলায় হাতে নাকে

কানে নিরেট সোনার গহনাগুলো। ঘরের মাঝখানে একটি বছর তিনেকের ন্যাংটা ছেলে তেলে জবজবে হয়ে হাঁ করে বসে আছে এই দিকে চেয়ে। খাটের ওপর ছু'এক বছরের ছোট বড় ছুটি ছেলে ও একটি মেয়ে মাথার বালিশটাকে ফুটবল করে খেলছিল। ওদের দেখে খেলা থামিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত চুপচাপ চেয়ে আছে দরজার দিকে।

ক্ষণিকা বললে, আপনাদের জল খাবারটা—

ঘোমটার ভিতর থেকেই উত্তর এল, তোমাদের কি রকম আক্কেল গা? দেখছ এখনও ছেলেগুলোকে তেল মাখানো হয়নি। ওদের চান করিয়ে নিজে চান করবো---তারপর খাওয়া-দাওয়ার কথা। শুধু কি খাওয়া-দাওয়া করতেই এসেছি নাকি!

ক্ষণিকার ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞাসা করে, নইলে কি জন্য এসেছেন?

কষ্টে নিজেকে সামলে লাবণ্যকে নিয়ে বাইরে দাঁড়াতেই সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন গাঙ্গুলী গিন্নী।

ক্ষণিকা বললে, বাবাঃ! আমার ভয় হচ্ছিল বুঝি বা মেরেই বসে।

লাবণ্য বললে, এই হল খাঁটি গোঁড়া হিন্দু ফ্যামিলির স্যাম্পেল। এদের জীবনের একমাত্র কাম্য হল চোখ বুজে দেহে-মনে-প্রাণে পতিসেবা করা, বছর-বছর একটি করে সন্তান প্রসব করে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা আর —

আরও অনেক কিছুই হয়তো বলে যেত লাবণ্য; কিন্তু পাশের বন্ধ দরজাটা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন একটি ফুটফুটে ফর্সা রং-এর বর্ষীয়সী মহিলা। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও পাকা আপেলটির মত সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য। যৌবনে যে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন তার ছাপ সারা দেহে এখনও ছড়িয়ে আছে। ক্ষণিকারা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই মহিলাটি বললেন, মিসেস গাঙ্গুলীর ঘরমুখো যেতে দেখেই বুঝেছিলাম এবার আমার পালা।

বাঁ হাত দিয়ে সাড়ির খানিকটা মুখে চাপা দিয়ে কথা কইছেন দেখে লাবণ্য বললে, দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝি ?

ঐ ভাবেই খিল খিল করে হেসে উঠে মহিলাটি বললেন, না ভাই! অসহ্য দাঁতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একেবারে সব নির্মূল করে তুলে ফেলেছি। মাড়ি শুকোয়নি বলে এখনও দাঁতগুলো বাঁধিয়ে নিতে পারিনি। এ অবস্থায় আমি আসতে চাইনি, কর্তা নাছোড়বান্দা। বললেন, এ হোলো একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার, তাছাড়া নাতি-নাতনি হয়ে গেছে এখনও লজ্জা ? তা তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন ভাই, এস বসবে এস। একা থাকলে প্রাণটা আইঢাই করে, তাই তো ঘর বার করে বেড়াচ্ছি।

ভিতরে বসে ছেলেপিলে নাতি নাতনির সব খবর শোনবার পর ক্ষণিকা বললে, আমার ওপর জ্যাঠাবাবু ভার দিয়েছেন আপনাদের দেখাশুনা খাওয়া-দাওয়া তদারক করবার। আপনার খাবার কি এই ঘরে পাঠিয়ে দেব, না ---

পাগল হয়েছ ভাই! একা একা খাওয়া আমার কুষ্ঠিতে নেই। তার চেয়ে চল সদলবলে আমরা রান্নাঘর আক্রমণ করিগে। আর সত্যি কথা বলতে কি ভাই, রান্নাঘরটি না দেখলে আমার খেয়ে দেয়ে শান্তি হয় না।

॥ বাইশ ॥

ক্ষণিকা ও লাবণ্য অগ্রণী হয়ে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে অন্যান্য মেয়েদের ও ছোট ছেলেদের নিয়ে স্টীমলঞ্চে করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে গেল। মিসেস গাঙ্গুলী প্রথমটা আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু সদা হাস্যময়ী মিসেস তরফদারের নাছোড়বান্দায় শেষ পর্যন্ত সেজে-গুজে ছেলেদের নিয়ে রওনা হতে বাধ্য হলেন। বাড়ি একেবারে ফাঁকা।

বাইরের ঘরে একটা তাকিয়ে ঠেশ দিয়ে চোখ বুজে গড়গড়া টানছিলেন একা রায় বাহাদুর। সমীদ ঘরে ঢুকে জড়সড় ভাবে ফরাশের একপাশে বসল। জয়ন্ত চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই উঠে সোজা হয়ে বসলেন রায় বাহাদুর। সমীদকে দেখে বললেন, কতক্ষণ এসেছ?

—এই মাত্র।

—ওপরে আর সবাইকে চা খাবার দেওয়া হয়েছে জয়ন্ত?

—আজ্ঞে সব শেষ করে আপনার চা নিয়ে আসছি।

জয়ন্ত চা দিয়ে বেবিয়ে গেলে রায় বাহাদুর বললেন, কী রকম বুঝছ সমীদ?

ম্লান হেসে সমীদ বললে, ব্যাপার মোটেই ভাল ঠেকছে না জ্যাঠা-বাবু! আসা অবধি ভাল করে কথাই কইছে না তাপস আমার সঙ্গে। সব সময় কি যেন একটা মতলব আঁটছে।

—সব ঠিক হয়ে যাবে, কোনও চিন্তা কোরো না তুমি!

একে একে মিঃ গাঙ্গুলী, তরফদার, নাগ সবাই এসে জড়ো হলেন বাইরের ঘরে, দেখা নেই শুধু তাপসের।

জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলেন রায় বাহাদুর, তাপস, তাপস কোথায়?

—আজ্ঞে ছাতে পায়চারি করছেন।

—আমার নাম করে ডেকে নিয়ে এস।

তাপস এলে সবাইকে উদ্দেশ করে রায় বাহাদুর বললেন, আপনাদের কাছে আমার কয়েকটি কথা বলবার আছে। আমার একমাত্র পুত্র অরুণাংশুর জন্মতিথি উপলক্ষে আপনাদের ডেকে এনেছি সত্যি, কিন্তু এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থও অনেকখানি রয়েছে। কয়েক দিনের জন্য হলেও ওদের আমি শোক-তাপ ভুলে থাকতে চাই। আপনাদের সবাইকে আমি ঘরের লোক বলে মনে করি—বাইরের কাউকে ইচ্ছে করেই ডাকিনি।

একটু থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করলেন রায় বাহাদুর। সাতদিন বড় কম সময় নয়, নিছক খেয়ে ঘুমিয়ে গল্প করে কাটানো কষ্টকর তাই এ জুয়ো খেলার অবতারণা।

জুয়ো খেলা ভাল কি মন্দ, সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা আমি করতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই জুয়ো মানুষকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে নাওয়া-খাওয়া এমন কি দুঃখ শোক পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়ে ধরে রেখে দেয়, একথা বোধ হয় অভিজ্ঞ সবাই স্বীকার করবেন। তাই আমি ঠিক করেছি, আর এটা আমার একটা আজগুবি খেয়াল বলেও ধরে নিতে পারেন। এই কদিন যা কিছু খেলাধুলা হবে সব স্টেকে, মানে বাজী রেখে। এর মধ্যেও একটা শর্ত আছে, খেলায় হার-জিত আছেই। কদিনে যা কিছু আপনারা জিতবেন, সব আপনাদের, হারলে কাউকে পকেট থেকে দিতে হবে না—সব দেনা আমার!

সবাই সমস্বরে তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল। হাত ইশারায় সকলকে থামিয়ে রায় বাহাদুর বললেন, আপনারা অবাক্ বা উত্তেজিত হবেন না। আমার বক্তব্য এখনো শেষ হয়নি। প্রথমতঃ আমার নিজের প্রয়োজনে আপনাদের এখানে ডেকেছি; দ্বিতীয়তঃ নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে জুয়োর ফাঁদে সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দেবার কোনও মতলবও আমার নেই। লখিন্দরের বাসর ঘরের মত খরচের সব রাস্তা একে একে বন্ধ

করে দিয়ে খামখেয়ালি বিধাতা পুরুষ আমায় টাকার গদিতে বসিয়ে চরম শাস্তি দিতে চলেছেন; তারই বিরুদ্ধে আমার এ অভিযান। এটা মেনে নিলে আপনাদের ক্ষোভের আর কোন কারণই থাকবে না।

রায় বাহাদুরের দিক দিয়ে অকাট্য যুক্তি। তর্ক বা প্রতিবাদ করে পুত্রশোকাতুর এই ধনকুবের বৃদ্ধের মনে আঘাত দিতে মন চায় না। সবাই নতমুখে চুপ করে থাকে।

খুসী হয়ে রায় বাহাদুর বললেন, আজ প্রথম দিন, তাস পাশা দাবা—যা খুসী খেলতে পারেন আপনারা। শুধু দুটোদিন আমার ইচ্ছামত খেলতে হবে আপনাদের। নিছক জুয়ো। সেদিন নিজেদের মতামতগুলো মুলতুবি রাখতে হবে, এইটুকু আমার অনুরোধ।

তাপস সমীদ ও মিঃ নাগ বললেন, আজ ব্রীজ খেলা হোক, অকশান ব্রীজ। তরফদার ও গাঙ্গুলী দাবার পক্ষে ভোট দিলেন।

তাই হল। কার্ড ফর পার্টনার করে রায় বাহাদুর ও সমীদ, অপর পক্ষে তাপস ও মিঃ নাগ পার্টনার হয়ে খেলা শুরু করলেন। ঠিক হ'ল, প্রতি পয়েন্ট দশ টাকা।

সবাইকে একখানি করে লেখার প্যাড ও একটি করে পেনসিল দেওয়া হলে রায় বাহাদুর বললেন, হারজিত দেনা-পাওনা সব লিখে রেখে দেবেন, পরে হিসেব মত সব মিটিয়ে দেওয়া হবে।

খেলা চলল রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত। হিসেব করে দেখা গেল, সমীদ ও রায় বাহাদুর সতের পয়েন্টে জিতেছেন। ওদিকে দাবায় আট বাজীর মধ্যে মিঃ গাঙ্গুলীর পাঁচ বাজী জিত।

সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ পেয়ে লাবণ্য বললে, চলি ভাই ক্ষণিকা, নিশ্চয়ই তাপসবাবু আসছেন। আমার কর্তাটিও ঘরে ঢুকে আমায় দেখতে না পেলে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখবেন।

পরিহাস তরল কণ্ঠে ক্ষণিকা বলে, এটা তোমার বাড়াবাড়ি ভাই লাবণ্য!

—মোটেই না। একটার পর একটা পাখনা গজানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের সন্দেহ বাতিক যে কতখানি বেড়ে যায়, সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই বলেই ও কথা বললে ভাই। সব সময় মনে রেখ আমি মিঃ নাগের তিন নম্বর পাখনা!

হাসি মুখে ঘরে ঢুকেই জড়সড় হয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল তাপস।

পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লাবণ্য।

ক্ষণিকা বললে, মিঃ নাগের তৃতীয় পক্ষ।

পিছন ফিরে একবার দেখে শিস দিতে দিতে খাটের দিকে এগিয়ে গেল তাপস।

তাপসের এ হঠাৎ-উল্লাসের কারণ বুঝতে না পেরে ক্ষণিকা বলে,—খেলার কি হল?

—হেরে গেছি। সিল্কের হাফ সার্টটা খুলে আলনার দিকে ছুড়ে ফেলে শুয়ে পড়ে তাপস। কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মত শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে ক্ষণিকা!

পরের দিন। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না, শুধু শরীর খারাপের অজুহাতে উপর থেকে নামলেন না মিঃ নাগ। অগত্যা তিন জনেই কাটথ্রোট ব্রীজ খোলা হল। অনেকগুলো পয়েন্টে হেরে গেল তাপস রায় বাহাদুর ও সমীদের কাছে। গাঙ্গুলী তরফদার কোম্পানী দাবা নিয়ে মেতে রইলেন সারাদিন।

অনেক চেষ্টা করেও সমস্ত দিনের মধ্যে লাবণ্যর টিকি দেখতে পেল না ক্ষণিকা, মিনুকে নিয়ে তরফদার গিন্নীর সঙ্গে গল্প করেই কাটাল। স্টীম লঞ্চে সান্ধ্য ভ্রমণের উৎসাহ কারও বিশেষ নেই দেখে—ক্ষণিকাও সে সম্বন্ধে কোনও উচ্চ-বাচ্য করল না।

ধীর মন্থর গমনে দিনের পর রাত রুটিন বাঁধা নিয়মে গড়িয়ে চলল। এল তার পরের দিন।

চা জল খাবারের পালা শেষ করে বাইরের ঘরে সবাই জমায়েত হলে, রায় বাহাদুর কোনও রকম ভূমিকা না করে বললেন, আজ সারাদিন খেলা হবে ফ্লাশ বা তিন তাসের খেলা।

যৌবনে এই সর্বনাশা খেলায় এমন মেতে উঠেছিলাম যে দিন রাতের হিসেব ছিল না। অনেক টাকা হেরেছি, আবার জিতেছিও প্রচুর। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে নাম করা জুয়াড়িও আমার সঙ্গে খেলতে ভয় পেত। এই সময় প্রথম বাধা পেলাম অরুণের মায়ের কাছ থেকে। কান্নাকাটি অনুনয় বিনয় সবই যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল, উনি তখন অন্নজল ত্যাগ করে প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, হয় আমি অরুণের মাথায় হাত দিয়ে শপথ করে খেলা ছেড়ে দেব, নয়তো অনাহারে প্রাণ বিসর্জন করবেন উনি। নিরুপায় হয়ে ছেড়ে দিলাম জুয়ো খেলা—বিশেষ করে তিন তাসের খেলা।

কিশোর অরুণের মুখের পাশে বুঝি বা সতীসাধ্বী স্ত্রীর মিনতি-করুণ মুখখানাও ভেসে ওঠে; চোখ বুজে ধ্যানস্থ হবার ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ নিশ্চল পাথরের মতন বসে থাকেন রায় বাহাদুর। তারপর নড়ে চড়ে বসে ডাক দেন, জয়ন্ত।

সাড়া দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই বলেন, নতুন তাস দু' প্যাকেট! আর লোহার সিন্দুক থেকে ত্রিশ হাজার টাকা।

তাস বাঁটতে বাঁটতে কতকটা অর্ধস্বগতের মত বলেন, জীবনের জুয়ো খেলায় একটার পর একটা হেরে গেলেও, তাসের খেলায় শেষ পর্যন্ত জিতই হয়েছে আমার! আজ জীবনের অপরাহ্নে সেইটে আর একবার যাচাই করে নিতে চাই।

খেলা না জানার অজুহাতে পাশ কাটাবার চেষ্টা করছিলেন মিঃ নাগ। রায় বাহাদুর বললেন, কুচ পরোয়া নেহি, পনেরো মিনিটে শিখিয়ে দেব।

ফরাশের মাঝখানে গোল হয়ে বসল সবাই। তাপসের পাশে

সমীদ, তারপর রায় বাহাদুর, মিঃ নাগ, তরফদার ও গাঙ্গুলী। পাঁচ হাজার টাকার একটা করে বাণ্ডিল সবাইকে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া হলে, যথা নিয়মে খেলা শুরু হল। বোর্ডে হাজার টাকা বেটিং হয়ে গেলে আর ডাকা চলবে না। হাত দেখে যার বড় তাস, সেই দান পাবে।

বেলা বারোটা পর্যন্ত খেলে তিনটে লিমিট বোর্ড পেলেন রায় বাহাদুর। মিঃ নাগ ও সমীদ কয়েকটা ছোট দান পেলেও সব চেয়ে হার হল—তাপস, গাঙ্গুলী ও তরফদারের।

ঠিক হল, খাওয়া দাওয়ার পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার খেলা শুরু হবে, চলবে রাত বারোটা পর্যন্ত।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে প্রথম প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন জুয়ালক্ষ্মী সমীদের দিকে। সে দৃষ্টি আর কোনও দিকে ফিরে চাইল না। বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল টাকা জমে উঠতে লাগল সমীদের তাকিয়ার পাশে। সবাই অবাক্। সমীদ পর্যন্ত হতবাক হয়ে ভাবছিল—একি সত্যি না স্বপ্ন? প্রতি দানেই সবার চাইতে বড় তাস তারই হাতে, এ কি করে সম্ভব হতে পারে?

রায় বাহাদুর ঠাট্টা করে বললেন, শেষ পর্যন্ত তুমিই আমার দিগ্বিজয়ে শতদ্রু তীরের প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ালে সমীদ?

কোনও জবাব না দিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে চলে সমীদ। এই অকল্পিত খেলার পরিণতি কোথায় এবং কিসে?

বড় বড় দানগুলো শেষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় সমীদ, তাপস ও রায় বাহাদুরের মধ্যে। জেদ বেড়ে যায়, টাকাও বাড়ে, লিমিট বোর্ড হয়ে গেলে দেখা যায় সমীদের হাতেই সব চাইতে বড় তাস। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলার নেশাও বেড়ে ওঠে।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর তৃতীয় অধিবেশন শেষ হয়ে ঢং ঢং করে এগারটা বাজার ঘণ্টা শোনা যায়। হঠাৎ হাতের তাস ছুড়ে ফেলে

দিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে মিঃ নাগ বলেন, জোচ্চুরি! নিশ্চয় আমাদের মধ্যে কেউ খেলার রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে অন্যায়ের আশ্রয় নিয়েছেন, নইলে এ হতে পারে না।

নিস্তব্ধ ঘর। কথা কওয়া দূরে থাক জোরে নিশ্বাস নিতেও ভয় হয়।

সমীদ দেখল—তাকিয়ার নিচে দুখানা তাস। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ পুঁছে কৌশলে তাসের ওপর রুমাল চাপা দিয়ে পরক্ষণেই সবার অলক্ষ্যে তাসসুদ্ধ রুমালখানা পকেটে রেখে দেয়।

ব্যাপারটা চোখের নিমিষে ঘটে গেলেও রায় বাহাদুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াল না।

সবার বিভ্রান্ত কৌতূহলী মুখগুলোর ওপর নীরবে চোখ বুলিয়ে রায় বাহাদুর বললেন, আপনার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের কথাই যেখানে ওঠে না—ঠকানোর প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। তাছাড়া সকলেই শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। ওরকম মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কোনও লোক আমাদের মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয় না।

প্রবল প্রতিবাদের সুরে মিঃ নাগ বললেন, ক্ষমা করবেন রায় বাহাদুর। আপনার এ যুক্তি আমি অন্ততঃ মেনে নিতে রাজি নই। আপনার কথাতেই বলি—হেরে গেলে সব দেনা আপনার, কিন্তু জিতলে? যে জিতবে তার। তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থ ষোলো আনাই রয়েছে। আমি প্রস্তাব করছি একে একে সকলকে সার্চ করা হোক। সত্য আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়বে।

কেমন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে সবাই মনে মনে ছটফট্ করে, মুখ তুলে কারও দিকে চাইতেও সঙ্কোচ এসে বাধা দেয়।

কয়েক মিনিট নত মুখে কি যেন চিন্তা করে রায় বাহাদুর বললেন, বেশ কথা, তাই হক। আমার মনে হয় এতে কারও আপত্তি

করা উচিত নয়। যে সন্দেহ বিষ আমাদের মনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এখনই তার মীমাংসা হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। সবার আগে আমাকে পরীক্ষা করা হোক।

ফরাশের ওপর উঠে দাঁড়ালেন রায় বাহাত্বর। চারদিকে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা গেল। মিঃ নাগ উঠে দাঁড়িয়ে রায় বাহাত্বরের সাদা গলাবন্ধ কোটটার সব পকেটগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন। কিছুই পাওয়া গেল না।

এবার মিঃ নাগের পালা। মিঃ তরফদার উঠে ভাল করে পরীক্ষা করে মাথা নাড়লেন। তারপর একে একে সবাইকে পরীক্ষা করা হল--ফল কিছুই হল না।

সব শেষে সমীদ। ফরাশের এক পাশে মুখ নিচু করে বসে ছিল সমীদ। তাপস কাছে এসে দাঁড়াতেই উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ করে দৃঢ় কণ্ঠে বললে, মাফ করবেন। এ ভাবে পরীক্ষা দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করা আমার রুচি ও নীতি বিরুদ্ধ।

সব কটি চোখের মিলিত বিস্মিত দৃষ্টি এক সঙ্গে মিলে একটি পাওয়ারফুল টর্চের মত সমীদের ভাবলেশ হীন মুখের ওপর পড়ে স্থির হয়ে থাকে।

কেউ কিছু বলবার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে 'গেল সমীদ। হাসিখুশি দিয়ে যে খেলার শুরু হয়েছিল অকস্মাৎ তার এ রকম বিয়োগান্ত পরিণতিতে সবাই হতভম্ব হয়ে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একে একে নিঃশব্দে যে যার ঘরে চলে গেল। শুধু ধু ধু প্রান্তরে ত্রিকালজ্ঞ বটগাছের মত প্রকাণ্ড ফরাশটার এক পাশে নিশ্চল পাথরের মত বসে রইলেন রায় বাহাত্বর হিরণ্যকশিপু বোস।

রান্নাঘর থেকে শুরু করে সমস্ত বাড়িটায় শাখা পল্লবিত হয়ে কথাটা রটে যেতেও দেরি হল না। সবার মুখে ঐ এক কথা, তাসের

খেলায় চুরি করতে গিয়ে শিক্ষিত জোচ্চোর সমীদ ধরা পড়ে গেছে ধরেছেন অভিজ্ঞ জজ সাহেব মিঃ নাগ। রাত্রে খেতে কেউ আর নিচে নামল না, ঘরে ঘরে রাতের খাবার পৌঁছে দেওয়া হল।

লাবণ্য বললে, যাই বল তুমি এর মধ্যে এতটা বিরাট রহস্য আত্মগোপন করে আছে। মিঃ নাগ খেতে খেতে বললেন, বাইরের চেহারা দেখে যে মানুষ চেনা যায় না—সমীদ ছেলেটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গাঙ্গুলী গিন্নী বললেন, কালই ছেলেপিলে নিয়ে বাড়ি চলে যাব আমি। কি সর্বনেশে লোক গো। দেখায় গো বেচারি ভাল মানুষটি, তার পেটে পেটে এত? তোমাকে আমি পই-পই করে বলেছিলাম, অত গয়না-গাঁটী নিয়ে যাব না, শুনলে না, এখন ঠেলা বোঝ। আজ সারারাত জেগে কাটাতে হবে আমাকে, নইলে কোন ফাঁকে ঘরে ঢুকে গলা টিপে গয়নাগুলো নিয়ে চম্পট দেবে। ওরা সব পারে।

স্ত্রীর কথায় প্রতিবাদ করার কোনও যুক্তি খুঁজে না পেয়ে চুপ করে থাকেন গাঙ্গুলী মশাই।

চিন্তিত মুখে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে তরফদার বললেন, দেখ, নানা দিক দিয়ে ভেবেও কোনও সদুত্তর পাচ্ছি না। সমীদ কি উদ্দেশ্যে একাজ করতে গেল! আমার শুধু ভাবনা হচ্ছে রায় বাহাদুরের জন্যে। আঘাতের পর আঘাতে লোকটা জর্জরিত হয়ে গেল।

বিষণ্ণ মুখে তরফদার গিন্নী বললেন, আমি কি ভাবছি জান? ক্ষণিকার মত মেয়ের অতখানি শ্রদ্ধা যে অর্জন করতে পারে তার পক্ষে, এ রকম একটা জঘন্য কাজ করা কী করে সম্ভব হতে পারে?

মীমাংসা হয় না, প্রশ্নটাই শুধু জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এইসব আলাপ আলোচনা অশান্তি তার কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। সেই যে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে সমীদ, অনেক ডাকাডাকি সাধ্য সাধনাতেও তার কোনও সাড়াও পাওয়া গেল না—বন্ধ দরজাও খুলল না।

অন্ধকার রাতের হাতছানিতে সারা বাড়িটা নিশুতি হয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

তেতলার শোবার ঘরের দক্ষিণের অন্ধকার ছাতে অস্থির ভাবে পায়চারি করছিল তাপস। ঘুমন্ত মিনুকে বুকে জড়িয়ে খাটের ওপর পাথরের মূর্তির মত বসে এক দৃষ্টি সেই দিকে চেয়ে ছিল ক্ষণিকা। অন্ধকারেও সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না তাপস। দ্রুতপদে কাছে এসে রুক্ষ স্বরে বলে, তখন থেকে এক দৃষ্টে চেয়ে কী দেখছ তুমি? যা হোক কিছু বল! বল যে সমীদের পায়ের নখেরও যোগ্য তুমি নও তাপস। তোমায় বিয়ে করে যে ভুল আমি করিছি সারা জীবন তিলে তিলে দগ্ধ হয়েও তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তিরস্কার অভিসম্পাত যা হোক একটা কিছু দাও, চুপ করে ও ভাবে আমার দিকে চেয়ে থেক না। আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

কান্নায় ধরে আসা গলায় ক্ষণিকা বললে, কেন এ সর্বনাশ তুমি করতে গেলে তাপস? সারা জীবন যে তোমার মঙ্গল ছাড়া চিন্তা পর্যন্ত করেনি, এই কি তার প্রতিদান?

—আমার মঙ্গল? তাপসের গলায় তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের নগ্ন রূপ স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

—ধরে নিলাম আমার কিন্তু চিন্তায় আচরণে তোমার এতটুকু ক্ষতিও সে করেনি। তবে কিসের জন্য এত বড় দুর্নামের বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে সাধু সেজে চুপ করে বসে আছ তুমি?

জবাব না দিয়ে খাটের ওপর থেকে একটা বালিশ টেনে নিয়ে খালি মেঝের ওপর সটান শুয়ে পড়ল তাপস।

কণ্টক শয্যা। ঘুম আসে না—ছটফট করে। ধীরে ধীরে রাতের পরমায়ু ক্ষয় হয়ে আসে।

তখনও পাখীদের ঘুম ভাঙেনি। পুবের আকাশে সবে একটু আলোর আভাষ। নিঃশব্দে উঠে বসল তাপস। পা টিপে টিপে উঠে খাটের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে দেখল মিনুকে দুহাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ঘুমুচ্ছে ক্ষণিকা।

আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে ছোট টুলটার ওপর বসে সামনে বড় আরশিটায় নিজের অস্পষ্ট মূর্তিটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল তাপস। দূরাগত স্টীমারের হুইস্‌ল্ ভেসে এল। চমকে উঠে চারদিক দেখে নিয়ে আলনায় ঝোলানো কোটের পকেট থেকে চাবির গোছাটা বার করে নিচু হয়ে বসে টেবিলের নিচে থেকে স্যুটকেশটা সন্তর্পণে বার করে খুলে, জামা কাপড়ের ভাঁজে লুকিয়ে রাখা রিভলবারটা বার করে টেবিলের ওপর রাখল। স্যুটকেসটা বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে দিয়ে ড্রয়ার থেকে লেখার প্যাড ও কলমটা নিয়ে লিখতে বসল তাপস। কলমটা হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পুবের লাল আকাশটার দিকে চেয়ে থেকে লিখল, ক্ষণিকা,—

পুবের আকাশে নূতন দিনের ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে, আমার জীবনে কিন্তু দুর্যোগের রাত অবসান হল না। মানুষ ভুল করে, আবার তা শুধরে নেবার রাস্তাও খুঁজে পায়, আমি পেলাম না। সারা জীবন ধরে একটার পর একটা যে ভুলের পাহাড় রচনা করেছি নিজের হাতে। ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া তা সরিয়ে ফেলবার কোনও রাস্তাও আমার জানা নেই। সেই জানা পথেই চললাম। আজ বলে যাই—সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়ে তোমাকেই শুধু ভালবেসেছি। ভুল ভ্রান্তি অন্যায় যা কিছু করেছি—

অতর্কিতে একখানি হাত পিছন থেকে চিলের মত ছোঁ মেরে চিঠির প্যাড ও রিভলভারটা তুলে নিল টেবিল থেকে। চমকে ফিরে দেখল তাপস—ক্ষণিকা! চকিতে চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে ক্ষণিকা —ল, এ সব কি ছেলেমানুষী হচ্ছে তাপস?

—ছেলেমানুষী নয়, এই হল একমাত্র পথ।

—মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষের পথ!

—তার চেয়েও কত নিকৃষ্ট জীব আমি এত দিনেও বুঝতে পারনি?

নিচে রাস্তা থেকে মোটরের হর্ন শোনা গেল। ছুটে ছাতে গিয়ে আলসের ওপর ঝুঁকে এক নজরে দেখেই ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বললে ক্ষণিকা—সমীদ চলে যাচ্ছে, ওকে ফেরাও তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ তুমি! কলঙ্ক ও অপমানের বোঝা মাথায় করে আজ এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে যে সমীদ। ঐ বোঝা একদিন তিনগুণ ভারি হয়ে চেপে বসবে তোমার মাথায়। বুঝতে পারছ না, এ ওর পরাজয় নয়—তোমার? জীবনের সবচেয়ে কালি মাখা অধ্যায়ের ওপর যবনিকা পড়বার আগে বাধা দাও ওকে—ছিনিয়ে নাও জয়ের মালা ওর গলা থেকে।

তাপসের মনে হয়, এ এক নতুন ক্ষণিকা, এর পরিচয় এতদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল ওর কাছে। স্থান কাল ভুলে গিয়ে অবাক্ হয়ে শুধু চেয়ে থাকে তাপস।

নিচে থেকে গাড়ি স্টার্টের আওয়াজ ভেসে এল।

.. দুহাতে তাপসের কাঁধ দুটো ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ক্ষণিকা বললে, আর দেরি করে সব দিক নষ্ট কোরো না। এখনও বুঝতে পারছ না—আদর্শ বন্ধুত্বের যে বিরাট দম্ভ নিয়ে সেদিন দুজনে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলে আজ তা থেকে কত দূরে ছিটকে পড়েছ তুমি?

তাই বলছি এমন সুযোগ আর পাবে না। সব ভুল, ত্রুটি অপরাধ নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়ে বিজয়ীর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার এমন সুযোগ আর তুমি পাবে না তাপস।

শেষের কথাগুলো কান্নায় ডুবে যায়।

হঠাৎ উৎসাহ ও উত্তেজনায় চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাপসের। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি ঠিক বলেছ খনা! অন্ধকারে এতক্ষণ হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম, এইবার পথ খুঁজে পেয়েছি।

চোখের নিমিষে ছুটে গিয়ে আলসের ওপর ঝুঁকে চীৎকার করে ওঠে তাপস, দাঁড়াও! নিস্তব্ধ পাড়ায় বোমা ফাটার মত প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে—দাঁড়াও!

সিঁড়িগুলো একরকম লাফিয়ে পার হয়ে ছুটে গিয়ে রাস্তায় ট্যাক্সির সামনে দাঁড়াল তাপস। কোনও কথা না বলে দরজা খুলে সমীদের বুকের কাছে জামাটা মুঠো করে ধরে এক রকম টেনে গাড়ি থেকে নামিয়ে টানতে টানতে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

হতভম্ব জয়ন্ত একবার পাঞ্জাবী ড্রাইভারটার দিকে আর একবার সদর দরজাটার দিকে চেয়ে গাড়ির পিছনের ক্যারিয়ার থেকে সমীদের সুটকেসটা বার করল। তারপর ফতুয়ার পকেট থেকে এক টাকার একখানা নোট বার করে ড্রাইভাইটার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, চলা যাও পাঁইজী, আজ আর গাড়ির দরকার নেই হোগা।

প্রকাণ্ড আরসোলাকে ক্ষুদ্রকায় কাঁচপোকা যেমন অবলীলাক্রমে টেনে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে সমীদকে টেনে নিয়ে উপরে উঠতে লাগল তাপস।

আধভেজানো দরজার ফাঁকে প্রতি ঘর থেকে কৌতূহলী নরনারী ভিড় করে উঁকি মেরে ছাখে। আতঙ্কিত চোখে মনের ভাব স্পষ্ট ফুটে ওঠে, না জানি কি খুন খারাপি ঘটে আবার এই সর্বনেশে বাড়িতে।

রে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে সমীদকে ছেড়ে দিয়ে মুখোমুখি তাপস। বিস্ময়ে হতবাক সমীদ কিছু বলবার আগেই তাপস , আমার যথা সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে বিজয়ীর মুখোস পরে এভাবে লিয়ে চলে যেতে দেব না তোমায় আমি। তার আগে একটা াঝাপড়া করে নিতে চাই।

বোঝাপড়া? ভাল, কি জানতে চাও বল, আমি প্রস্তুত।

—তুমি আর ক্ষণিকা পরস্পরকে ভালবাস কিনা?

মীদের গম্ভীর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে, বলে এটা ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন হল তাপস! আমি শুধু আমার কথাই পারি। ক্ষণিকার মনের গহনে লুকোনো কথাটা আমার র কথা নয়।

—বেশ তোমার কথাই বল।

-বাসি। ক্ষণিকাকে মানে তোমার স্ত্রীকে আজও সমস্ত মন-দিয়ে ভালবাসি আমি। এ কথা বলার মধ্যে এতটুকু লজ্জা বা রব নেই। ক্ষণিকাকে ভালবাসি বলেই সুমিতার মত মেয়েকে সহজে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলাম।

গোলমালে ঘুম ভেঙে উঠে বসে কাঁদতে শুরু করে মিন্টু। ক্ষণিকা গয়ে কোলে নিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করে।

মীদ বলে যায়—আর দূর্জ্ঞেয় নারী চরিত্রে যদি কণা মাত্র জ্ঞতাও লাভ করে থাকি, তাহলে বলবো, ক্ষণিকা তোমাকে, শুধু কেই ভালবাসে—আর কাউকে নয়।

—মিথ্যা কথা!

গিয়ে এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ক্ষণিকা বলে, নয়। নিছক সত্যি কথা! মেয়েদের সাইকোলজি সম্বন্ধে সামান্য ড়য়াও যদি তোমার থাকত তাপস, তাহলে গোড়া থেকেই ভুল এতখানি কষ্ট তুমি পেতে না। মনে পড়ে? বিয়ের পর একটা

প্রশ্ন অনেকবার তুমি আমায় করেছ। সমীদের মত ছেলেকে
করে কেন তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করলাম! প্রশ্নটা ইচ্ছে
এড়িয়ে গেছি সেদিন, আজ জবাব দেবার সময় এসেছে। একটা
উদাহরণ দিয়ে কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। দুটি ছেলে, একটি ধীর
শান্ত গম্ভীর। অপরটি ভাবপ্রবণ, চঞ্চল একগুঁয়ে ও অসহায়।
তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি সব সময় ঘিরে থাকে ঐ চঞ্চল দুষ্টু ছেলে
অপরটি সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কোনও প্রয়োজনই মনে করেন না।
তাই যেদিন প্রথম সামনে এসে দাঁড়ালে তুমি আর সমীদ। আমার
মাতৃত্ব জেগে উঠে প্রথমেই দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তোমারই দি

সরে গিয়ে পুবের জানলায় আবীর ঢালা আকাশের দিকে
চুপ করে দাঁড়াল তাপস। কথা কইবার নেশায় আজ পেয়ে
ক্ষণিকাকে। বলেই চলল সে, ধীর স্থির বুদ্ধিমান আত্মরক্ষায় সক্ষম
চেয়ে—অসহায়, আপন ভোলা পদে পদে ভুলকরা স্বামীকেই
করে অধিকাংশ মেয়ে। দুজনে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে আমার দুয়ে
কাউকে বিমুখ করতে মন চাইল না, তাই ভালবাসলাম দুজন
তোমাকে দিলাম আমার সর্বস্ব। আর সমীদকে দিলাম আমার
প্রীতি ভালবাসা। বোনের কাছ থেকে ভাইয়ের যা প্রাপ্য ব
ন্যায্য দাবী। তার বেশি নয়।

ঐ ভাবে দাঁড়িয়েই তাপস বলে, আর আমার কথা? অ
কথাটা একবার ভাল করে ভেবে দেখেছ কোনও দিন? যা কিছু
ভ্রান্তি অন্যায় করিছি আমি, সব তোমাকেই কেন্দ্র করে। তো
পাওয়া আমার জীবনে একটা আশাতীত ঘটনা। বর্তমান পৃথি
অনায়াস স্বাধীন জীবন যাপন করতে হলে—চাই টাকা, প্রচুর
ব্যাঙ্কের সামান্য ঐ কটি টাকা তোমাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেবার
যথেষ্ট নয়। তাই মেতে উঠলাম টাকা রোজগারের নে
সারাদিন বাইরে কাটাতাম কিন্তু মন আমার ঘুরে বেড়াত তো

শেপাশে—লোভাতুর কাঙালের মত। ওরই মধ্যে যেদিন সকাল লে বাড়ি আসতাম, শুনতাম তোমরা ছুটিতে গেছ মার্কেটিং-এ নয়তো য়োয়, রেস্তোঁরায়। দেরি করে এলে দেখতাম, সমীদ চলে ওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছ তুমি। ছাই চাপা মনের আগুন ইন্ধন য়ে ধিকি ধিকি জ্বলে উঠত আবার। মানুষ যৌবনে কামনা করে সান্নিধ্য, প্রেম। কোনটাই যে হতভাগ্য পেল না—কী অবলম্বন রে বেঁচে থাকবে সে বলতে পার? অধঃপাতের ঝকঝকে তকতকে ড়িগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল আমায়। সে প্রলোভন ড়িয়ে যাবার মত সাহস ও মনোবল আমার ছিল না। তাই ধাপে পে নামতে লাগলাম নিচে -

কাছে গিয়ে কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে শান্ত কোমল কণ্ঠে মীদ বললে, ভুল তাপস ভুল। মস্ত একটা ভুলের বনিয়াদের ওপর মি রাজ অট্টালিকা গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলে, তাই এ অনর্থপাত। তুমি য়তো ভুলে গেছ, কিন্তু আমি ভুলিনি, চিরকাল সুখের কোলে লিত-পালিত যে ধনীর দুলালী এক কথায় বাপের বিলাস ঐশ্বর্য লে ফেলে দিয়ে হাসি মুখে তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে— কে সুখী করবার জন্য ফেলে আসা ঐ তুচ্ছ জিনিসটাই বড় করে খলে! হীরে ফেলে কাঁচের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছ এতদিন।

কথা যেন আজ আর শেষ হতেই চায় না!

ঘুরে দাঁড়িয়ে তাপস বলে, তাই যদি হবে—কেন তখনি বাধা ওনি আমায়? কেন নির্বাক দর্শকের মত ভুলটাকেই আমার সমর্থন রে নিলে?

- আর কোনও উপায় ছিল না ভাই! চিরকাল একগুঁয়ে জেদী মি, যা ধরবে তা না করে ছাড়বে না। তাছাড়া বাঁধ দিয়ে প্লাবনের দাম গতি কে কবে রোধ করতে পেরেছে ভাই? শুধু পরিশ্রম রু গতিবেগ বাড়িয়ে দেওয়াই সার হত, ফল কিছুই হত না।

ক্ষণিকার কোলে ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থা
মিন্টু। সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তাপস বলে, এল মি
ভাবলাম আমাদের ছোট্ট সংসারে এবার বোধহয় শান্তি ফিরে এ
হল ভুল বোঝা বুঝির অবসান। বাড়ি এসে পরম আগ্রহে মিন্টু
কোলে নিতে হাত বাড়াই—ঐ অতটুকু ফুলের মত মিন্টু, ত
কুঁকড়ে মিশে যেতে চায় ক্ষণিকার বুকে। শেষ অবলম্বনটুকুও র
না আমার।

শেষের দিকে গলাটা ভারি হয়ে আসে তাপসের।

—সব অবলম্বনই তোমার অটুট আছে। কিছুই হাতছাড়া হয়নি

বিমূঢ়ের মত তাকায় তাপস সমীদের প্রশান্ত গম্ভীর মুখের দিকে

সমীদ বলে, বিয়ের পর সমস্ত দেহ মন দিয়ে যখন ক্ষণি
তোমার সান্নিধ্য কামনা করত, পেত না। এ যে কত বড় ব্যথা
বুঝলে অনেক আগেই নিজেকে শুধরে নিতে পারতে। দেখত
বুঝতাম সবই কিন্তু প্রতিকারের কোনও পথ খুঁজে পেতাম না। ম
পড়ল আমাদের বন্ধুত্বের কথা, প্রতিজ্ঞার কথা। তাই সময় পেলে
ছুটে আসতাম। দিতাম আমার সঙ্গ, গল্প করে সিনেমা দেখি
ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম ক্ষণিকার নিঃসঙ্গ জীবনের বিরাট শূন্যত
খানিকটা অংশ। দেখলাম তোমার সংসারে ক্ষণিকার অবস্থা হু
নির্জন কারাকক্ষের বন্দিনীর মত। তা থেকে ওকে মুক্তি দে
ক্ষমতা ভগবান আমাকে দেননি, তাই লোহার গরাদের এ পাশ থে
বন্দুক ঘাড়ে প্রহরীর মত পায়চারি করে আমার অস্তিত্ব জানিয়ে দিত
ওকে। বোঝাতে চাইতাম, একা নও তুমি। তোমার নিঃসঙ্গ জীব
আমি আছি, সদা জাগ্রত সতর্ক প্রহরী।

থেমে দম নিয়ে আবার বলে যায় সমীদ, শুনলাম তোমা
সংসারে নতুন অতিথির আগমন সংবাদ। ভাবলাম তোমাদের দাম্প
জীবনে আমার প্রয়োজন এবার হয়তো অনেকটা লঘু হয়ে যা

[illegible] চিন্ত হয়ে কলকাতা ছাড়লাম, কিন্তু যোগাযোগ ছাড়লাম না। ঐখানে বসেই খবর পেলাম তোমার বাড়ি মরগেজ দেওয়ার [illegible], জুয়োর দেনার কথা। একবার ভাবলাম টাকাটা ক্ষণিকার নামে [illegible] দি, কিন্তু ফল তাতে আরও খারাপ হবে মনে করে বেনামিতে [illegible] দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। কেন করলাম, তা তোমার প্রথম [illegible] বাবের মধ্যেই খুঁজে পাবে। মিনুর হাত ধরে ক্ষণিকা [illegible] এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। অধিকারের প্রশ্ন যদি তো[illegible] মনে করিয়ে দেব আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা। অগণিত নীরব সাক্ষী তারায় ভরা মুক্ত আকাশের নিচে জনহীন গড়ের মাঠে।

কচি হাত দুখানা বাড়িয়ে সমীদের কোলে আসবার জন্য ছটফট করে মিনু।

কোলে নিয়ে সমীদ আদর করে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয় ওর ছোট্ট মুখখানা।

দ্বিধা সঙ্কোচ জড়িত কণ্ঠে ক্ষণিকা বলে, আমাদের চলার পথ সুগম করতে যথাসর্বস্ব দিয়ে দেউলে হয়ে বসেছ যে সমীদ, তুমি চলবে কী নিয়ে ? বেঁচে থাকতে হলে তোমারও তো টাকার প্রয়োজন।

মিনুকে ক্ষণিকার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে সমীদ বলে, টাকা ? হ্যাঁ—একদিন হয়তো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আজ আর নেই।

তাপসের দিকে ফিরে বলে, আশা করি তোমার বোঝাপড়া শেষ হয়েছে তাপস। এইবার আমি চলি। যাবার জন্য কয়েক পা বাড়িয়ে দরজা খুলতে যেতেই পিছন থেকে তাপসের বজ্র গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল, দাঁড়াও !

বিস্মিত হয়ে ফিরে দাঁড়াল সমীদ।

কাছে গিয়ে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাপস বললে, সংসারে আদর্শ বন্ধুত্ব, নিঃস্বার্থ ত্যাগ আর অনাবিল প্রেমের একটা মহিমময় দৃষ্টান্ত খাড়া করে নায়কোচিত প্রস্থান, না ? এভাবে যেতে তোমায় দেব না।

ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার আগেই দড়াম করে দরজাটা খুলে ফেলে খপ করে সমীদের হাতখানা ধরে তাপস বললে, এস—বোঝা পড়ার কিছুটা এখনও বাকি আছে।

সমীদকে ধরে হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চীৎকার করে উঠল তাপস, রায় বাহাদুর, মিঃ নাগ গাঙ্গুলী মশাই আপনারা দয়া করে একবার নিচে আসুন। সত্যিকার চোর ধরা পড়েছে, শাস্তি দেবার ভার আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিতে চাই।

বন্ধ ঘরে একই চিন্তা নিয়ে উৎকণ্ঠা আর কৌতূহলে ছটফট করছিল সবাই।

টেবিলের ওপর দুহাতে মাথাটা ধরে চিন্তিত মুখে চুপ করে বসে ছিলেন মিঃ নাগ। তাপসের চীৎকারে চমকে উঠে দাঁড়াতেই লাবণ্য বললে, আমার ভয় হচ্ছে—বুঝি বা জজ সাহেবের রায় না উলটে যায়।

কথা না বলে কটমট করে একবার চেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েন মিঃ নাগ।

অন্য ঘরে খাটের ওপর ছেলে-মেয়েগুলোকে নিয়ে আগলে বসে নিঃশব্দে কাঁদছিলেন গাঙ্গুলী গিন্নী। কিছু দূরে চেয়ারে বসে একটার পর একটা বিড়ি খেয়ে চলেছেন গাঙ্গুলী মশাই। গাঙ্গুলী মশাই লোক লজ্জায় বাইরের লোকের সামনে সিগারেট খেতেন কিন্তু বিড়ি নইলে তাঁর মৌজ হত না। তাপসের সাড়া পেয়ে হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই ছুটে এসে হাঁউ মাঁউ করে জড়িয়ে ধরে গিন্নী বললেন আমার মাথা খাও, এখন তুমি নিচে নেব না। বুঝতে পাচ্ছ না ঐ খৃস্টান মেয়েটা আর তার পাগল স্বামী দুজনে মিলে খুন করেছে ঐ চোর ছেলেটাকে। এখন ওদের মাথায় খুন চেপে গেছে, যাকে দেখবে—

জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন গাঙ্গুলী মশাই।

সং... মিঃ তরফদার এই রকম একটা অঘটন কিছু ঘটবার ...অপেক্ষা... বসে ছিলেন যেন। কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে দু'জনে ... বেরিয়ে গেলেন।

...র ঘরে সারা রাত অনাহারে অনিদ্রায় কখনও বসে কখনও ... করে কাটিয়েছেন রায় বাহাদুর। সবার আগে তিনিই এসে ... বারান্দায়।

...ায় সারা দেহ থর থর করে কাঁপছিল তাপসের। সমীদের হাত ছেড়ে দিয়ে পিছন ফিরে দেখল, এরই মধ্যে সবাই এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেছে বারান্দার চারপাশে। সবাইকে উদ্দেশ করে তাপস বললে, আজ বিনা দোষে চোর অপরাধ মাথায় নিয়ে আপনাদের সকলের ঘৃণা বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার একমাত্র লক্ষ্য বস্তু হয়ে নিঃশব্দে যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, সে আমার অকৃত্রিম বন্ধু সমীদ। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে ঈর্ষাবশে প্রতিহিংসা নেবার জন্যে আমিই তাসের খেলায় কৌশলে নীতিবিরুদ্ধ চাতুরির সাহায্যে ওকে জিতিয়ে দিয়ে আপনাদের সন্দেহের উদ্রেক করবার চেষ্টা করেছিলাম। মিঃ নাগ হঠাৎ সকলকে সার্চ করবার প্রস্তাব করে বসায় আমার সমস্ত প্লান ওলট পালট হয়ে গেল। অন্য উপায় না দেখে আমিই বাড়তি দুখানা তাস সমীদের তাকিয়ার নিচে কৌশলে রেখে দিয়েছিলাম। সব জেনে শুনেও আমাকে হাতে নাতে ধরিয়ে না দিয়ে নীরবে সব সন্দেহ অপবাদ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল সমীদ। কেন জানেন?

উত্তর জানা নেই, থম থমে নিঃস্তব্ধ বারান্দায় উৎসুক ব্যাকুল চোখ মেলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে থাকে সবাই।

তাপস বলে যায়, আমাকে আর আমার নিরপরাধ স্ত্রী-কন্যাকে এই দুরপনেয় কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্যে। এ রকম একটি সত্যিকার বন্ধুর অনিষ্ট কামনায় যে চক্রান্ত করতে পারে—

মানুষের মধ্যে সে কোন্ স্তরের জীব, সে বিচারের ভা[illegible] আপনা[illegible] ওপর ছেড়ে দিয়ে দণ্ড নেবার জন্য আমি প্রস্তুত।

কেউ কোনও কথা বলবার আগেই ছুটে এসে তাপ[illegible] বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে উত্তেজনায় কেঁদে ফেললেন রায় বাহাদুর। [illegible] আটকে যায় তবুও বলে যান,—এই—এই তো, এই তো আ[illegible] কণা-মার স্বামীর উপযুক্ত কথা। এই রকম একটা কথা [illegible]র জন্যই যেন কাল সারারাত উৎকর্ণ হয়ে বসে কাটিয়েছি।

নিজেকে সামলে নিয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে রায় বাহাদুর বললেন, আমার কয়েকটি কথা আপনাদের বলবার আছে। আজ যাঁরা আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এখানে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় ছেলে-মেয়ের মা বাপ। বাঙালীর একান্নবর্তী সংসারে ভাই[illegible] ভাইয়ে ঝগড়া বিবাদ ভুল বোঝাবুঝি হামেশাই হয়ে থাকে [illegible]

কয়েকদিন অশান্তি, সাংসারিক নিয়মের খানিকটা ব্যতিক্রম। ব্যস, আবার সব ঠিক হয়ে যায়। তাপস আর সমীদের ব্যাপারটাও তাই, ধরে নিন ওরা আমাদেরই বয়স্ক অবুঝ শিশু সন্তান, সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির ফলে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে দুদিন বাদে তা আপনিই মিটে যাবে। এখানে বাইরের লোক কেউ নেই। আপনাদের সকলকেই আমি আত্মীয়—ঘরের লোক বলেই ডেকেছি। আমার একান্ত অনুরোধ এই অপ্রীতিকর ঘটনাটা আপনারা যত শীঘ্র পারেন ভুলে যাবার চেষ্টা করবেন। এ বাড়ির পাঁচিলের বাইরে এর জের টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। যিনি তা করবেন, আমার বাড়ির দরজা চিরদিনের জন্য তাঁর কাছে বন্ধ এ কথাটাও এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখলাম।

নীরব সম্মতি জানিয়ে চুপ করে থাকে সবাই।

কিছুদূরে থামের পাশে মিনুকে কোলে নিয়ে জল ভরা ঝাপসা চোখে একদৃষ্টি তাকিয়েছিল ক্ষণিকা। দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি কাছে